প রি শো ধ

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

অভিজাত প্রগতিধর্মী নাট্যমঞ্চ

বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন-পরিকল্পনার

প্রবর্তক ও যুগ্ম সম্পাদক

শ্রীদক্ষিণেশ্বর সরকার

শ্রীরাসবিহারী সরকার

ভ্রাতৃদ্বয়ের করকমলে

গ্রন্থায়ন

সাহিত্যরসিক সুধীজনের মতে—সাহিত্যে শুধু পুরাতন ঐতিহ্য ও আদর্শের পুনরাবৃত্তি করিলে, সে সাহিত্য বর্তমানকালে লোকের কাছে গ্রহণীয় হইবে না ; যেহেতু যুগের পরিবর্তনে অনিবার্য ভাবেই জীবনেরও পরিবর্তন হইতেছে। সুতরাং সাহিত্যিককে নূতন পথের কথা ভাবিতে হইবে। কিন্তু কি সেই নূতন পথ ? সাহিত্যিক কি শুধু সাম্প্রতিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কট সমস্যারই রূপায়ন করিবেন, অথবা তিনি শাশ্বত ভাবের ধারক ও বাহক হইবেন ? ইহার সমাধানও এক সমস্যা। তবে সাহিত্যে উপযোগিতার দিক দিয়া প্রশ্ন উঠিলে বলা যায়, জীবনধর্মী ব্যক্তির জন্যই সাহিত্য এবং বর্তমানে উঁচুতলার মুষ্টিমেয় মানুষ নয়, বৃত্তি, ব্যবসায় ও অবস্থা নির্বিশেষে সর্ব ব্যক্তি বা মানবের জন্য যাহা কল্যাণপ্রদ, তাহাই আদর্শ সাহিত্য বলিয়া গ্রহণীয়।... এই যুক্তিবাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়া "পরিশোধ" উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। আর একটি কথা, মানুষের মনে যে সৎ ও অসৎ এই দুইটি বিপরীত প্রকৃতির দ্বন্দ্ব চলিয়া থাকে এবং অধিকাংশ স্থলে উন্নততর আদর্শের প্রেরণায় আশ্চর্যভাবে তাহার অসৎ প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, ইহাও অনস্বীকার্য। এই উপন্যাসে বর্ণিত নায়কের চরিত্রের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ (ইং ১৯৫৯)
সি-আই-টি ভবন
'ই' ব্লক—১১, কলি-১৪

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবতার দুয়ারে ধর্না না দিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীদের প্রচলিত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পাতিরাম পাকড়ে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া উঠিয়াছে। শহরের প্রান্তভাগে, নিকিরিপাড়ায় পাতিরামের প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার অন্ত নাই।

পাতিরাম এখন পাড়ার মাথা, তাহার এই অভাবনীয় উন্নতিতে দরিদ্র নিরক্ষর প্রতিবাসীদের মুখগুলি উজ্জ্বল হইবার কথা; কিন্তু পাতিরামের অন্নপুষ্ট দুই-চারি জন স্তাবক ব্যতীত পাড়ার কাহারও সহিত তাহার সম্প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ।

প্রতিবাসীদের সহিত পাতিরামের অসদ্ভাবের কারণ আলোচনা করিলে, পাতিরাম পাকড়ের অসামান্য দম্ভ ও আত্মশক্তির প্রতি অসীম বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাতিরামের বয়স তখন তেরো, টালার বিদ্যাসাগর স্কুলে পড়ে। সারা নিকিরিপাড়ার মধ্যে সে-ই একমাত্র ছেলে—শিক্ষার ফলে বামুন-কায়েতের ছেলেদের সহিত এক বেঞ্চিতে বসিতে পাইয়াছে এবং তাহাদের সহিত অবাধ মেলামেশা ও খেলাধূলায় প্রকৃতিগত যাহা কিছু সংকোচ অনায়াসে নিশ্চিহ্ন করিতে পারিয়াছে।

নিকিরিপাড়ার ছেলেরা তাহাদেরই জাতিভাই পাতিরামের দুঃসাহস দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়!—স্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফিরিয়া সে পাড়ায় থাকে না, পাড়ার ছেলেদের সহিত মিশিতে চায় না,—ভদ্দরপাড়ার সহপাঠীরাই এখন তাহার খেলার সাথী; তাহাদের সহিত মিশিয়া, গলা ধরাধরি করিয়া বেড়ায়,—গান গায়, গল্প করে, খাবার কাড়াকাড়ি করিয়া খায়! পাড়ার ছেলেরা সে সময় কাছে আসিয়া পড়িলে, না চিনিবার ভান করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়!

শহরের সংস্পর্শে থাকিয়াও নিকিরিরা আচারব্যবহার ও ধর্মকর্মে ছিল একান্ত রক্ষণশীল। এ সব বিষয়ে পান হইতে চুনটুকু খসিলেই পাড়া হইত তোলপাড়!

তখনই সালিসি বসিত, বিচার হইত, অপরাধীর দোষ প্রতিপন্ন হইলে দণ্ড না লইয়া তাহার অব্যাহতির উপায় থাকিত না।

এক সন্ধ্যায় পাড়ার সবাই জানিল, পাতিরাম কি প্রকারে পান হইতে চুন খসাইয়াছে! যেহেতু, পাড়ার মোড়ল বা চাঁই কালাচাঁদ কোটালের এজলাসে তাহার তলব হইয়াছে। পাড়ার মধ্যে অধিষ্ঠাত্রীদেবী শীতলা মাতার 'স্থান'টুকুই সর্বজনীন কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পল্লীবাসিগণ সকলেই খোলার ঘরে বাস করে, কিন্তু চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া তাহারা মায়ের আস্তানাটি পাকা করিয়া দিয়াছে। পাকা ঘরখানির ভিতরে মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, ঘরের সম্মুখে পাকা দালান। দালানের নীচেই কাঠাতিনেক খোলা জমি, ইহাও দেবীস্থানের অন্তর্গত। মায়ের বার্ষিক উৎসবের সময় এই খোলা জমির উপর মেরাপ বাঁধিয়া আসর তৈয়ারী হয়, শীতলা মাতার গান, যাত্রা, তর্জা প্রভৃতির আয়োজন চলে। অন্যান্য সময় দিবাভাগে পল্লীবাসীরা এই খালি জায়গাটুকুতে তাহাদের ভিজা জালগুলি শুকাইতে দেয় এবং সন্ধ্যার পর পাড়ার মাতব্বররা এখানে সমবেত হইয়া মায়ের আরতি দেখে, হরিনাম কীর্তন করে, আবার প্রয়োজন হইলে সালিসি-পঞ্চায়েতের কাজ চালায়। মায়ের মন্দিরের পাশেই মায়ের পূজক সারদা চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসা। সপরিবারে তিনি মায়ের মন্দিরসংলগ্ন খানতিনেক খোলার ঘর অধিকার করিয়া বাস করেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত মায়ের সেবায় অবহিত থাকেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতি পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতার শ্রদ্ধাভক্তির অন্ত নাই।

মায়ের আরতির পর পাকা দালানের নীচে খোলা জায়গাটির উপর পঞ্চায়েতী বৈঠক বসিয়াছে। কালাচাঁদ কোটাল, হারাধন গাল্, লখীন্দর গুণিন্, সহদেব সরদার, ধর্মরাজ চালী প্রভৃতি দলপতিগণ সদলবলে উপস্থিত। ছেলেদের দল একটু তফাতে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাড়ার মেয়েরাও বাদ পড়ে নাই, তাহারা চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসার দিকে অপেক্ষাকৃত অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছে, দালানের উপর একখানা কম্বল বিছাইয়া বসিয়াছেন সারদা চক্রবর্তী স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয়-স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্মণ।

মায়ের মন্দিরের সম্মুখে সেই দালানটির উপর, বিশেষ কারণ ব্যতীত পাড়ার কেহ কখনও উঠিতে সাহস করিত না। পূজা দিবার প্রয়োজন হইলে, স্নানান্তে বিশুদ্ধ বস্ত্রে তাহারা কুণ্ঠিতভাবে আসিয়া নীচে দাঁড়াইত, চক্রবর্তী মহাশয় আদেশ দিলে তবে তাহারা দালানে উঠিত—ঠিক যেন অপরাধীটির মত! অথচ এই মন্দিরের নির্মাণকার্যে তাহারা অর্থ দিয়াছে, প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছে, অধিকার

তাহাদের যথেষ্টই আছে ; কিন্তু এই সমানাধিকারবাদের দাবি তাহাদের মনের মধ্যে কোন দিন কোনও সমস্যাই তুলে নাই, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারা চিরদিন ইহাই বুঝিয়া আসিয়াছে যে, মন্দির মায়ের ; চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁহার প্রতিনিধি এবং পাড়া সুদ্ধ তাহারা সবাই মায়ের সেবক ! পূজা দিবার জন্য যেদিন তাহারা স্নান সারিয়া, শুদ্ধ হইয়া ঠাকুরের আজ্ঞায় মন্দিরের দালানটির উপর পূজার উপচার লইয়া উঠিত, —ঠাকুর তাহাদের হাত হইতে সে সমস্ত লইয়া মায়ের উদ্দেশে চড়াইতেন, তাহার পর প্রসাদের সহিত আশীর্বাদী পুষ্প দিতেন, তাহারা যেন তখন কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইত !

যে পবিত্র স্থানটির উপর প্রবীণদেরও এত শ্রদ্ধা, সে দিনের ছেলে হইয়া পাতিরাম তাহার অমর্যাদা করিয়াছে, শুধু তাহাই নয়, গ্রামবাসী সর্বসাধারণ যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী মহাশয়কে দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, এই সূত্রে পাতিরাম তাঁহারও অবমাননা করিয়াছে। ইহারই প্রতিবিধানের জন্য পঞ্চায়েৎ বসিয়াছে এবং গ্রামের 'ষোল আনা'কে তলব করা হইয়াছে।

পাতিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ,—সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, ব্রাহ্মণ দেখিলে মাথা নোয়ায় না, কোনও বিধিনিষেধ সে মানিতে চায় না ; যখন-তখন যা-তা কাপড়ে সে পূজার দালানে গিয়া উঠিয়া থাকে, ঠাকুর নিষেধ করিলে অধিকার লইয়া তাঁহার সহিত তকরার করে এবং শেষে আস্পর্ধা তাহার এত বাড়িয়া যায় যে, স্কুলের ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া আগের দিন দালানে উঠিয়া বসে, সকলে মিলিয়া সেখানে খাবার খায়, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পাতা মায়ের মন্দিরের ভিতর বাতাসে উড়িয়া গিয়া পড়ে।

পাতিরামকে প্রশ্ন করা হইলে সে দম্ভের সহিত জবাব দিল, আমি অন্যায় কিছু করি নাই।

দলপতি তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, বরাবর যে নিয়মকানুন চলে আসছে, তাকে হেলা করলেই অন্যায় করা হয়।

পাতিরাম তর্কের ছলে ঝাঁঝাইয়া উত্তর দিল, তা বলে তোমরা যদি বরাবর ভুল করে থাক, আমি তা কেন করব ?

পাতিরামের কথা শুনিয়া সমবেত সকলেই অগ্নি-অবতার। সে দিনের ছেলের এত বড় বুকের পাটা, মুখের দৌড় এত দূর। ষোল আনার ভুল দেখাইতে আসে ! কিন্তু নিরক্ষর হইলেও, তাহারা নির্বোধ ছিল না, পাতিরামকে কথা কহিবার অবসর দিল। প্রশ্ন হইল, কি ভুল আমরা করেছি ?

পাতিরাম তখন মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি দক্ষিণের এক পদ্মরাজ বি. এ. পাশ করিয়া তাহাদের স্কুলে প্রথম মাস্টারি করিতে আসিয়াছেন; পঁচিশ বছরের তরুণ যুবা সাহিত্য শিক্ষা দিতে বসিয়া ক্লাসের মধ্যে যতটা সম্ভব বর্ণবিদ্বেষের বিষ উদ্‌গার করিতেন,—নিঃশেষ করিতেন প্রতি শনিবার দুইটার বন্ধের পর ছেলেদের ডিবেটিং উপলক্ষে। এই শিক্ষকটি বিখ্যাত চার্চমিশনারী স্কুল ও কলেজ হইতে আড়াগোড়া শিক্ষালাভ করিয়া—সনাতন ধর্ম ও সমাজের প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব লইয়াই বিদ্যাসাগর স্কুলের ছেলেদের মুক্তির ভার লইয়াছিলেন এবং সুবিধা পাইলেই প্রচার করিতেন,—মানুষমাত্রেই অমৃতের পুত্র, কোনও পার্থক্য কাহারও মধ্যে নাই, সবাই সমান; জাতিভেদ কুসংস্কার, দেবদেবীপূজা-মন্ত্র সমস্তই মিথ্যা —সুবিধাবাদী স্বার্থপর ব্রাহ্মণ জাতির অলীক কল্পনা মাত্র!—বিদ্যালয়ে অধীত বিদ্যাংশ ত্যাগ করিয়া পাতিরাম এই মুখরোচক তথ্যগুলি যথাসাধ্য কণ্ঠস্থ করিয়াছিল এবং উত্তরচ্ছলে তাহার বিচারকদের নিকট উদ্গার করিয়া সভাস্থ সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

কিন্তু পাতিরামের দুর্ভাগ্য, তাহার ব্রহ্মবিদ্যার পরিচয় পাইয়াও কেহই তাহাকে দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ বলিয়া বাহবা দিল না, বরং তাহার বিরুদ্ধে এই 'রায়' বাহির হইল যে, সর্বসমক্ষে তাহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া মুণ্ডিত মস্তকে এক ঘড়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া হইবে এবং সাত হাত মাপিয়া নাকখত দিবে!

পাতিরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার দণ্ডাদেশ শুনিল, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, ঠোঁট দুখানি পর্যন্ত নাড়িতে দেখা গেল না।

কিন্তু সহসা ভিড় ঠেলিয়া পঞ্চায়েতদের সম্মুখে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল তাহার মা দ্রৌপদী! সরোদনে কহিল, দুধের ছেলে আমার, ন্যাকাপড়া শিখেই না ওর কাল হল! ওকে তোমরা এ যাত্রা ক্ষেমা-ঘেন্না কর, ও হুকুম ফিরিয়ে নাও,—দু-চার গণ্ডা ট্যাকা বরং জরিমানা কর, আমি ভিক্ষে-সিক্ষে করেও তা হাজির করব।

দণ্ড শুনিয়া যে পাতিরাম ধৈর্য হারায় নাই, মায়ের এই হীনতা দেখিয়া সে গর্জিয়া উঠিল, খবরদার মা! আমার হয়ে একটি পয়সা তুমি জরিমানা বলে দিতে পারবে না; তা হলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব! কি করেছি আমি? চুরি করেছি, ডাকাতি করেছি, না কারুর বুকে ছুরি মেরেছি যে জরিমানা দেবে? ওরা সব এককাট্টা হয়েছে, আমি একলা, তাই যা ইচ্ছা তাই করতে চাইছে! কিন্তু আমি সইব না, এর শোধ নেবই।

তেরো বছরের 'দুধের' ছেলের এই দুঁদেপনা কাহারও বরদাস্ত হইল না; সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ গোয়াল হইতে এক থাবা গোময় আনিয়া জোর করিয়া পাতিরামের মুখবিবরে গুঁজিয়া দেওয়া হইল এবং দুই জন জোয়ান তাহার দুই কান ধরিয়া পঞ্চাশ বার ওঠ-ব'স করাইল।

পুরোহিত ঠাকুর হাত তুলিয়া কহিলেন, বাস্, বাস্, যথেষ্ট হয়েছে, ছেলে-মানুষ কুসংসর্গে পড়েই মাথাটাকে বিগড়ে ফেলেছিল, এবার চৈতন্য হবে; চৈতন্য-ময়ী ওকে সুপথ দেখাবেন। এবারের মত তোমরা ওকে ক্ষমা কর,—আর ও সব শাস্তির দরকার নেই। কাছে আয় বাবা, কাছে আয়, আশীর্বাদ নিয়ে যা—

মুখ বিকৃত করিয়া পাতিরাম উত্তর দিল, থাক্ থাক্, তোমাকে আর "গরু মেরে জুতো দান" করতে হবে না; কে তোমার আশীর্বাদ চায়, ঠাকুর? আশীর্বাদ ওদের কর, পাতিরাম পাকড়ে কেয়ার করে না তোমাকে—তোমাদের বামুন জাতকে—তোমাদের ঠাকুর-দেবতাকে,—এ কথা জেনে রেখো।

পাতিরামের এত বড় স্পর্ধার কথাটা ঠাকুর মহাশয় হাসিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিলেও, সভার 'ষোল আনা' তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না। পুনরায় তাহার কান দুটি ধরিয়া 'পঞ্চে'র সম্মুখে খাড়া করা হইল এবং 'পঞ্চে'র মাথা হইয়া কালাচাঁদ কোটাল পাতিরামকে জানাইয়া দিল; ষোল আনার সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হলে, আর দশ জনের মত সবার 'সো' হয়ে থাকতে হবে; বামুন দেবতা নেমকম্ম মানব না বললে চলবে না।

দুই চক্ষু পাকাইয়া গোঁয়ারের মত পাতিরাম কহিল, আমি যদি না মানি?

জোর গলায় কোটাল তাহারও ব্যবস্থা দিল, তা হলে ষোল আনা তোকে দল থেকে ছেঁটে ফেলে দেবে, কোন তোয়াক্কা তোর রাখবে না।

দৃঢ়স্বরে পাতিরাম জানাইল, বেশ, তাই সই। আজই আমি ষোল আনাকে ছেঁটে আলাদা হলুম।

পঞ্চের আদেশে 'ষোল আনা' সকলেই তৎক্ষণাৎ পাতিরাম পাকড়ের সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে কলিকাতার প্রান্তদেশে নিরক্ষর নিকিরি-সমাজের মধ্যেও সামাজিক শাসনের প্রভাব এতটা তীব্র ছিল।

দ্রৌপদী ছেলেকে তিরস্কার করিয়া কহিল, দোষ তো তোর! তুই দু পাতা ন্যাকা-পড়া শিখে বেহ্মদের পাল্লায় পড়ে এত বড় নায়েক হয়েছিস্ যে, দেবতা বামুন মান্‌তে চাস্ না, পঞ্চের সামনে তাই নিয়ে তকরার করিস্।

পাতিরামের রোখ তখনও কমে নাই, মায়ের কথায় ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া উত্তর দিল, আমার খুশি, তুমি চুপ করে থাক।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমি তো চুপ করবই, আমার ক্ষ্যামতা কি, তোর সাথে কথায় পারি? কিন্তু, দেখতে পাচ্ছি, তোর কানে পাক দিয়ে মুখের মধ্যে গোবর গুঁজেও তেনারা তোরে আক্কেল দিতে পাবে নি। তোর অদেষ্টে ঢের কষ্ট আছে।

পাতিরাম তথাপি দমিল না, তর্জন করিয়া কহিল, মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত,—যা বেরোয়, ঢোকে না। আমি যা বলেছি, তাই করব; পাড়ার কারুর সঙ্গে আমি কোনও তোয়াক্কা রাখব না, দেবতা-বামুনকে কেয়ার করব না—

দ্রৌপদী এবার রাগের-সুরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বামুন বামুন করছিস্, বামুনরা যেন তোরে সাধছে—তোর ভক্তিছেরেদ্ধা নেবার লালসে, তুই না হলে আর তাদের চলছে না। কিন্তু তুই এত বড় নেমকহারাম, এইটেই ভুলে যাচ্ছিস যে, এই বামুনের দৌলতেই তুই এত বড়টি হয়েছিস্—ন্যাকাপড়া শিখিছিস্।

আগুনের উপর যেন জলের অঞ্জলি পড়িল। পাতিরাম বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিল, কি বললে;—বামুনের দৌলতে মানুষ হয়েছি আমি, লেখাপড়া শিখেছি?

দ্রৌপদী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, হ্যাঁ, যখন বিধবা হই, তুই তখন সবে পাঁচ বছরের কোলে পা দিয়েছিস। একটি পয়সা তোর বাপ রেখে যায় নি। মুখুজ্যে বাবুদের পুকুরগুলো সে দেখাশোনা করত। তেনারা শুনেই গতির টাকা দেন পাঠিয়ে। পরে হামরাই হয়ে দাঁড়ান, যাতে তোকে নিয়ে না পথে দাঁড়াতে হয়। কত্তাবাবু ওঁরে ছেলের মত ভালবাসতেন। তাঁরই দয়ায় শ্রেদ্ধায় বড় বড় ঘরে মাছের যোগান দিয়ে তোকে মানুষ করি। তোকে চালাক-চতুর দেখে তিনিই জিদ করে বলেন—দ্রুপ! তোর ছেলেটার লক্ষণ আছে, কালে মানুষ হবে, একে আর মাছের ঝুড়ি বইতে শেখাস নি, স্কুলে পড়তে দে, যত দিন পড়বে, ওর মাইনে আর জামা-কাপড় বই-পত্তর যোগাবো আমি। কিন্তু খবরদার, এ কথা কাউকে বলতে পাবি নে; কথা ফাঁক হলেই আমিও হাত গুটোব।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে আমার ইস্কুলের দুশমন রাধুর বাবা—ওপাড়ার সাতকড়ি মুখুজ্যে আমার লেখা-পড়ার খরচ যোগায়, —সেই দেয় স্কুলের মাইনে? জামা, কাপড়, জুতো, বই, খাতা—সব?

দ্রৌপদী উত্তর দিল, হ্যাঁ, নইলে আমার কি ক্ষ্যামতা—তোরে এই হালে স্কুলে পাঠাই? পাড়ার দশ জনে এই নিয়ে কত কথাই আমাকে বলে, জিজ্ঞেসা করে

ল্যাকা-পড়া শিখে পতা তোকে কোন্ স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়ে দেবে? আমি চুপ করে শুনে যাই, কারুর কথায় রা কাড়ি না, তখন কি জানতুম, ল্যাকা-পড়া শিখে তুই এমনি নায়েক হয়েছিস্? দশ জনের সামনে আমার মুখে ভুসোকালি মাখিয়ে দিলি!—প্রৌঢ়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

পাতিরাম নরম হইয়া কহিল, তুমি কেঁদো না, আর আমি লেখা-পড়া করব না, আজ থেকে ওপাটে ইস্তফা দিলুম।

অঞ্চলে দুই চক্ষু মুছিয়া দ্রৌপদী ছেলের শান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল, আর ইস্কুলে যাবি না?

—না।

—কি করবি তা হলে? কাজ তো কিছু করা চাই।

—কাজই করব; যাতে রোজগার হয়, পরের কাছে আর হাত পাততে না হয়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করব।

—কাজ কববি, সে তো ভাল কথা; কি কাজ করবি, ঠিক করেছিস্?

—সে তোমাকে এখন বলব না, পরে জানতে পারবে। কিন্তু তোমাকে এই কাজের জন্য আমাকে কালই পঞ্চাশটি টাকা যোগাড করে দিতে হবে।

—বলিস কি! সে কত বললি? ক গণ্ডা টাকা?

—সাড়ে বারো গণ্ডা; এ তোমাকে দিতেই হবে; কিন্তু কারুর কাছ থেকে ধার করে যদি তুমি টাকা এনে দাও, তা হলে আমি নেব না।

—তোর যত সব অনাচ্ছিষ্টির কথা! টাকা কি আমার ঘরে পোঁতা আছে যে, তুই চাইবামাত্রই তুলে এনে দেব? তোর সে খবরে দরকার কি, ধার করে আনি, কি [illegible]য়ে আনি;—তোর তো টাকা নিয়ে কথা?

—ধার করা টাকা নিয়ে আমি কাজ করতে নারাজ, তুমি বরং ঘটিবাটি বিক্রি করেও এই টাকা আমাকে যোগাড় করে দাও, তুমি দেখে নিও, সম্বৎসরের ভিতর আমি এর তিনগুণ টাকা তোমাকে তুলে দেব।

দ্রৌপদী রাজী হইল। পরদিনই সেই টাকা হাতে লইয়া পাতিরাম কাজের সন্ধানে বাহির হইল। সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ি ফিরিয়া মাকে ডাকিয়া কহিল, কাজ যোগাড় করে ফেলেছি মা, টাকা সেখানে ছড়ানো আছে; তুলে আনতে পারলেই হল।

দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া মা পুত্রের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, বলছিস কি? কাজটা কি শুনি?

শক্ত হইয়া পাতিরাম কহিল, মাছের কাজ। জেলের ছেলে আমি, জাত-ব্যবসাই ধরব ঠিক করেছি।

বিস্তারিত পাতিরাম কহিল, হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলুম মা। আগেই খবর একটু পেয়েছিলুম, পশ্চিম থেকে রেলে মাছ আসছে আজকাল, সেই মাছ ওখানে সস্তায় ডেকে নেব ; তার পর কলকাতার সব বাজারে যোগান দেব। মাস কতক কাজ করে, হাতে টাকা জমিয়ে নিজে আড়ত খুলে বসব। একটু মাথা খেলিয়ে তরিবত করে ও মাছ যদি বাজারে চালাতে পারি, দেখবে তখন—পয়সা কে খায়!

দ্রৌপদী অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করিল, পশ্চিম থেকে মাছ আসছে রেলে? বলিস্ কি রে। তা, সে মাছ তো পচে ঢোল হবার কথা!

পাতিরাম কহিল, শীতকাল যে, পচবে কেন?

দ্রৌপদীর বিস্ময় যদি বা কাটিল, কিন্তু সমস্যা তুলিল, চালানী মাছ লোকে নেবে কেন?

পাতিরাম জানাইল, খদ্দেরের কানে কানে কি বলে বেড়াতে হবে যে মাছ এনেছি পশ্চিম থেকে! সবাই জানবে, ভিন্ গাঁয়ের পুকুরের মাছ।

দ্রৌপদী পুত্রের প্রস্তাব শুনিবামাত্রই শিহরিয়া উঠিল; কহিল, এতে যে দু দিনেই জানাজানি হয়ে পড়বে বাবা, চালানী মাছ পুকুরের বলে চালাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে, নিন্দে হবে—

পাতিরাম কঠিন হইয়া কহিল, কিছুই হবে না। বাজারে দেখ নি, বড় মাছ পড়লে চিলের মত সবাই ছুটে এসে কাড়াকাড়ি লাগায়; কোথাকার মাছ, কখন্ ধরা হয়েছে, কটা লোকে তার খবর নেয়! পশ্চিম থেকে মাছের চালান আসতে পারে, এ কথা কেউ এখনও বিশ্বাসই করবে না, তার পর যখন জানাজানি হবে, তত দিনে আমরা কাজ গুছিয়ে নেব, মা! তুমি দেখে নিও, এই কাজে নেমে আমি কি করে কাজ বাজাই, পয়সা পয়দা করি।

মা বুঝিল, পুত্রকে বুঝাইবার প্রয়াস বৃথা। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। পাতিরাম সেই দিনই তাহার লেখা-পড়ার সাজসরঞ্জাম সমস্তই উঠানে আগুন জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ফেলিল,—তাহার শখের জামা, জুতা, কাপড়, চাদর—সমস্তই তাহাতে আহুতি পড়িল। অগ্নিশিখা উঁচু হইয়া উঠিল। পাশের বাড়ির মেয়েরা সভয়ে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, ওমা, কি সর্বনেশে কাণ্ড! কি হচ্ছে পাতিরাম? পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, যজ্ঞ হচ্ছে—ঋণ-মুক্তির।

মাথা ন্যাড়া করিয়া তাহাতে নিত্য নিয়মিত ঘোল ঢালিবার যুক্তি দিয়া প্রতি-

বেশিনীরা চলিয়া গেল। মা বাজারে গিয়াছিল, ফিরিয়া কহিল, এ কি সর্বনাশ করেছিস্ রে?

পাতিরাম বিকৃতস্বরে কহিল, মুখুজ্যে বামুনের দেনার চিহ্নগুলো জ্বালিয়ে দিলুম, মা! খাতায় বামুনের দেনার হিসেবটা আগেই টুকে নিয়েছি, তবে ঠিকঠাক সব হিসেব ধরতে পারি নি, মোটামুটি ধ'রে নিয়েছি—পাঁচ শ! মানুষ হয়েই সুদসুদ্ধ এইটে আগেই শুধব।

অবাক্ হইয়া মা পুত্রের অগ্নির উত্তাপস্পৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধার মনে হইল,—সে মুখ যেন মানুষের নয়, যেন এক ভয়াবহ মূর্তির ছায়া সেই মুখখানির উপর পড়িয়া অতি ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

॥ দুই ॥

তেরো বৎসর বয়সে পাতিরাম যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, সামাজিক বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, নিন্দা-অপযশ, সদ্ভাব-সহযোগিতা সমস্তই কোতল করিয়া আরও বারোটি বৎসরের কঠোর সাধনায় তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কার্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে এবং অর্থকে কঠিনভাবে আয়ত্তে রাখিতে তাহাকেও কঠিন হইতে হইয়াছে। তাহার বিধিবিগর্হিত কার্যের জন্য প্রতিবাসীরা তাহার সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে, পাতিরাম কিন্তু পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করে নাই বা তাহাকে কেহ কোনও দিন কোনও প্রতিবাসীর মুখাপেক্ষী হইতে দেখে নাই। পাছে কোন দিন প্রতিবাসীদের দ্বারস্থ হইতে হয়, এই আশঙ্কায় মায়ের পুনঃ পুনঃ অনুরোধেও সে বিবাহ করে নাই।

প্রতিবাসীদের কথা উঠিলেই তাহার মার্জারের মত অদ্ভুত দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠে, বিড়্ বিড়্ করিয়া নিজের মনে কত কি বলে, কিন্তু তাহার সংকল্পের কথা তাহার মনেই গুপ্ত থাকে, কি করিতেছে সে বা কি করিবে, তাহা লইয়া সে যেমন আস্ফালন করে না, তেমনই কাহারও নিকট ব্যক্তও করে না। তবে তাহার মনের দৃঢ় ধারণা এই যে, এক দিন সে সমস্ত পাড়ার উপর তাণ্ডব-নৃত্য করিবে, সে দিন পাড়াপড়শীর একখানি মাথাও উঁচু হইয়া থাকিবে না—সকলেই মাথা পাতিয়া দিবে—তাহার নৃত্যচপল চরণযুগল সভয়ে তুলিয়া লইবার জন্য! আর পল্লীর ঐ দেবস্থান—পল্লীবাসীর সযত্ননির্মিত মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন করিয়া সে ঐ

স্থানে এমন এক স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করাইবে, প্রতিসন্ধ্যায় যেখানে পল্লীমাতব্বররা সমবেত হইয়া তাহার কৃষ্ণকর্কশ অঙ্গে তৈলমর্দন করিয়া নির্যাতনের দিনটি স্মরণ করিবার অবকাশ পাইবে।

মায়ের নিকট পাতিরাম যে টাকা লইয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়াছিল, সম্বৎসরের মধ্যেই তাহার ছয় গুণ টাকা মায়ের হাতে তুলিয়া দেয়। দ্রৌপদী এখন আর মাছের ঝুড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি যোগান দিতে বাহির হয় না। এখন তাহার পুত্রের দৌলতে তাহার বাড়িতে লোকের অভাব নাই। দেহাত হইতে পাতিরাম ছয় জন নিকিরিকে মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করিয়া বাড়িতে রাখিয়াছে। তাহারা বাড়িতে খায়, আড়তের কাজ করে, রাত্রিতে বাড়িতে আসিয়া পাহারা দেয়। পাতিরামের এখন বেশ বোল-বোলাও হইয়াছে। যাকে তাকে টাকা ধার দেয়, কিন্তু দলিল বেশ কায়দা করাইয়া লিখাইয়া লয়—যাহাতে কোনও সূত্রে আইন-আদালতে না ফাঁসিয়া যায়। ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব হয় না, টাকা ধার দেওয়ার কথা প্রচার হইয়া পড়িলে সকল বাধা ঠেলিয়া উমেদারের দল দেখা দেয়। পাড়ার কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করিয়া বিষম দায়ে পড়িয়া পাতিরামের খাতকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্য ব্যাপারে মনে হয়, পাতিরামের মনে কোন বিকার নাই, আগেকার অপ্রিয় দাগটুকু সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে; তাহার লক্ষ্য শুধু চড়া সুদ ও পাকা দলিল সম্পাদনের দিকে; টাকা ধার দিতে কোন দিন তাহাকে বিমুখ হইতে দেখা যায় না।

অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৈতৃক সামান্য ভিটেবাড়িটিও যথাসম্ভব সংস্কার করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ইমারত তোলে নাই। পাতিরামের প্রতিজ্ঞা, অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা উপার্জন না করিলে সে পাকা বাড়িতে মাথা গলাইবে না। বাহিরে খোলার চালা দেওয়া লম্বা-চওড়া একখানা ঘর, লাল রংয়ের সিমেণ্ট করা গৃহতল, তাহার উপর ময়লা বিছানা পাতা, গোটা দুই তাকিয়া; বিছানার চাদর ও তাকিয়ার ওয়াড় কাবুলিওয়ালার অঙ্গ-বস্ত্রের মত এ পর্যন্ত স্থানচ্যুত হইবার অবকাশ পায় নাই, তেল ও ধুলার সংযোগে তাহারা বর্ণ-বিভ্রাট উপস্থিত করিয়াছে,—কিন্তু পাতিরামের এ সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! এই গদিঘরে—বিচিত্র গদিতে বসিয়া সে নিত্য হাজার হাজার টাকার লেন-দেন করে। বাহিরের সিমেণ্ট-মণ্ডিত প্রশস্ত দাওয়াটির উপর তাহার মক্কেল ও খাতকরা অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে।

অদ্ভুত তাহার কার্যপদ্ধতি,—সাধারণের পর্যায়ে আনিয়া যাহার তুলনা-

মূলক সমালোচনা করা চলে না। রাত্রি ঠিক তিনটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া সে তাহার কার্যারম্ভ করে। সমস্ত কাজ নিজের চক্ষুতে দেখিয়া ব্যবস্থা করা তাহার চিরন্তন অভ্যাস। নূতন রোজগার না করিয়া সে জল স্পর্শ করে না, 'বাসি পয়সায় খাইব না'—এটিও তাহার অন্যতম প্রতিজ্ঞা। শহরের উপকণ্ঠে বিভিন্ন স্থানে তাহার শতাধিক পুষ্করিণী বিদ্যমান—দীর্ঘকালের মেয়াদে এ সকল পুকুর জমা করা আছে। আষাঢ়-শ্রাবণে গঙ্গার জলের বর্ণপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিমের মরসুম যেই উপস্থিত হয়, পাতিরাম একাই সে সব কুনকের দরে কিনিয়া লয়, তাহার পর নিজের জমা করা পুষ্করিণীগুলিতে নিজে উপস্থিত থাকিয়া হিসাব করিয়া ফেলে। বক্রী চড়া দরে বাজারে বিক্রয় করে। ডিমের এই কারবারটিও সে একচেটে করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিনের শেষ হইতে পুকুর হইতে পুকুরে চারা পোনা চালাই ও পাইকারী বিক্রয় আরম্ভ হয়। তাহার পর সারা বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায় চলে;—কুন্‌কে-ভরা ছোট পোনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে অতিকায় রুই কাতলা পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না। ভোর পাঁচটার মধ্যে পুকুরের ব্যাপার সারিয়া তাহাকে হাওড়ার আড়তে ছুটিতে হয়, নয়টার পূর্বেই সারাদিনের কাজ শেষ করিয়া সে বাড়িতে ফিরিয়া আসে।

পাতিরামের আড়তের লাভের করাত আসিতে যাইতে দু তরফা কাটে। রেলের কল্যাণে নানা স্থান হইতে আড়তদারের নামে বাক্স-বন্দী হইয়া মাছের চালান আসে। পাতিরাম বুদ্ধি খাটাইয়া মফস্বলের চালানদারদের নিকট বাক্স ও বরফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করে, ইহার ফলে অন্য সব আড়তদারকে কানা করিয়া দিয়া তাহারই আড়ত দেখিতে দেখিতে জমকাইয়া উঠিয়াছে। পাতিরামের ব্যবসায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছিল—পয়সা ছুঁড়িয়া মারা! জল-ঝড়-বজ্রপাত—প্রাকৃতিক যত কিছু দুর্যোগ আসুক, হরতাল হউক বা আড়তের কাজ বন্ধ থাকুক,—চালানদারের নামে রোজ-কার টাকা পাঠানো কিছুতেই বন্ধ থাকিবে না। পাতিরাম কোনও দিন স্থানীয় ব্যাপারীদের মুখ চাহিয়া থাকে না,—নিজেই সুবিধামত দর দিয়া নিজের লোকের দ্বারা বেনামীতে মাল কিনিয়া লয় এবং নিজের লোক দ্বারা শহরের বিভিন্ন বাজারে, মেসে, হোটেলে বিক্রয় করিতে পাঠায়। অন্যান্য আড়তদাররা পাতিরামের শাঁখের করাত চালাইবার অপূর্ব কৌশল দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়। কিন্তু পাতিরামের যেমন প্রতাপ, তেমনই দম্ভ, সমব্যবসায়ীদিগকে গ্রাহ্যও করে না কোন দিন।

পাতিরামের চেহারায় কোনও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। বেঁটে খাটো মানুষটি, সাদাসিধা মুখ, চোখদুটি ক্ষুদ্র ও ঘোলাটে, সময় সময় তাহা যেন জলিয়া

ওঠে! নাকটি মোটা ও থ্যাবড়া, ওষ্ঠ দুটি পুরু ও কতকটা ওল্‌টানো,—সহসা দেখিলে কালচুঁটি মার্জ্জারের মত বিভীষিকা আনে! মুখখানি স্বাভাবিক গম্ভীর হইলেও, দক্ষ অভিনেতার মত তাহাতে নানা ভাবভঙ্গির বিকাশ দেখা যায়। ছোট ছোট উজ্জ্বল দুটি চক্ষুর ভিতর দিয়া তাহার অসামান্য কূটবুদ্ধি আত্মপ্রকাশ করিলেও, সে লোকের নিকট নিজেকে হ্যাকা-বোকারূপে পরিচিত করিবার প্রয়াস পায়। রাগের সূচনায় তাহার মুখে কালো কালো ঠোঁটদুটির ভিতর দিয়া হাসির ঝিলিক বাহির হয়, কিন্তু হাসিটুকু মেঘের বুক চিরিয়া সঞ্চারিত বজ্রদূতী বিদ্যুতের মত ভয়ঙ্কর! এই জাতীয় বিদ্যুদ্বিকাশের পরেই যেমন বজ্রনির্ঘোষ হয়, পাতিরামের ওষ্ঠে এই অদ্ভুত হাসির সঙ্গে সঙ্গে বোমার মত তাহার মুখখানি যেন ভীষণ হইয়া ফাটিয়া পড়ে।

পুত্রের অর্থভাগ্যে দ্রৌপদীর যতটা আনন্দ ও উল্লাস, পাড়াপ্রতিবাসীর সহিত মনোমালিন্যে তাহার মনের গোপন ব্যথাও ততটা গভীরভাবে প্রকাশ পায়। সদা-সর্বদাই তাহার সাধ হয়, ছেলের বিবাহ দিয়া রাঙা টুকটুকে একটি বধূ বাড়িতে আনে এবং সেই সূত্রে ষোল আনাকে সন্তুষ্ট করিয়া আগেকার মত আবার দলভুক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু পাতিরামের কাছে যখনই সে কথাটা পাড়ে, তখনই সে গম্ভীর হইয়া উত্তর দেয়,—এখনও সে সময় আসে নি, মা।

মা সাগ্রহে সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটির প্রতীক্ষা করে, কিন্তু কবে যে সেই কাম্য দিনটি সহসা দেখা দিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না।

পুত্রের আর একটি ব্যবহারে মায়ের প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠে। সে লক্ষ্য করে, চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া পাতিরামের যেন একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে; টাকা ধার দিবার সময় যে খাতককে সে জামাই-আদরে থালাভরা খাবার খাওয়ায়, মাস কয়েক পরেই দেখা যায়, তাহারই সর্বনাশে সে বদ্ধপরিকর, বাঘের মত সে তখন দুর্ভাগ্য খাতকের টুঁটি দাঁতে কাটিয়া তাহার রক্তপানের জন্য উন্মত্ত! তখন তাহার লঘুগুরুজ্ঞান থাকে না, পয়সার জন্য পিশাচেরও অধম হইয়া উঠে!

অবশ্য, এমন ঋণপ্রার্থীরও অভাব দেখা যাইত না,—যাঁহারা অত্যাবশ্যক অর্থের মোহে আভিজাত্যের দর্পকে খর্ব করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন; কিন্তু পাতিরামের মিষ্টান্ন তাঁহারা উপেক্ষা করিলেও, পাতিরাম তাঁহাদের এই স্পর্ধা উপেক্ষা করিতে পারিত না, চিত্রপটে তাঁহাদের নাম সে হিংসার অক্ষরে লিখিত এবং এই সব ক্ষেত্রে ঋণদানে তাহাকে মুক্তহস্ত দেখা যাইত।

পুত্রকে বাগে পাইলে মা তাহাকে উপদেশ দেয়, বাবা! ভগবান তোমাকে যখন কারবারে পয়সা ঢেলে দিচ্ছেন, তখন তেজারতি করে লোকের শাপমন্যি কুড়িয়ে কি দরকার? পারো তো লোকের উপকার করো দান করে! নইলে, ধার দিয়ে এক দিন তার উপকার ক'রে তার পর শতেক দিন তার খোয়ার করার চেয়ে হাত গুটিয়ে নেওয়াই ভাল। টাকা ধার দেবার সময় সন্দেশ-রসগোল্লা খাইয়ে টস্ দেখানো, তার পর ধার শুধতে না পারলে তার বুকের কল্‌জে ছিঁড়ে নেওয়া—এর চেয়ে মহাপাপ আর নেই, বাবা!

বাবা কিন্তু কথার এই আঘাতটুকু নিরুত্তরে সহ্য করিয়া যায়। তাহার উদ্ভাবিত এই বিচিত্র অর্থনীতির মূলে কি রহস্য নিহিত, সে ভিন্ন অন্যে তাহার মর্ম কি বুঝিবে?

শীতলা-মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্তী মহাশয় যে দিন গোপনে পাতিরামের সহিত দেখা করেন এবং কন্যাদায় উপলক্ষে তাঁহার দমদমার ভদ্রাসনবাটি ও জমিজমা বন্ধক রাখিয়া তিন হাজার টাকা ধার চাহেন, সে দিন পাতিরাম তাঁহাকে টাকা দেয় এবং চক্রবর্তী মহাশয় তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি করাইয়া লন যে, এই লেনদেন ও বন্ধকী ব্যাপারটা গোপন থাকিবে। পাতিরাম বর্ণে বর্ণে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল, কাহারও নিকট এ তথ্য ব্যক্ত করে নাই।

কিন্তু বৎসরখানেক পরে আর এক কন্যার বিবাহব্যাপারে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির উপর আরও হাজার টাকা ধার দিবার প্রস্তাব লইয়া যে দিন চক্রবর্তী মহাশয় পুনরায় গোপনে পাতিরামের গদিতে পদার্পণ করিলেন, সে দিন সে গম্ভীরভাবে জানাইল,—হাত যে এখন একবারে খালি চক্রবর্তী মশাই, থাকলে এখনই দিতাম। তা, আপনি এক কাজ করুন না কেন, বাজে জমিজমা বিক্রি করে হাজারখানেক টাকা তুলে নিন না!

চক্রবর্তী মহাশয় সবিস্ময়ে জানাইলেন, বন্ধকী জমি বিক্রি করবার অধিকার তো আমার নেই, পাতিরাম।

পাতিরামের ওষ্ঠে আবার সেই হাসি দেখা দিল, কহিল, তাতে কি হয়েছে? বন্ধক রেখেছি তো আমি! আমার যখন আপত্তি নেই, কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

ব্রাহ্মণ একেবারে তন্ময়! কি মহাপ্রাণ এই ক্ষণজন্মা নিকিরিনন্দন! জাতিতে হেয় হইলে কি হয়? ব্যবহারে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ হয়! পরক্ষণে প্রশ্ন তুলিলেন, তা হলে তুমি কি বাবা ঐ পরিমাণ টাকার ভূসম্পত্তি বিক্রি করবার সম্মতিপত্র

রেখে লিখে একখানা ?

পাতিরামের ওষ্ঠের দুই প্রান্তে হাসি এবার ফুটিয়া উঠিল ; উপেক্ষার সুরে কহিল, আপনি কি পাগল হয়েছেন, চক্রবর্তী মশাই ! এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছুঁচোর বিষ্ঠে পর্বতে তুলতে চান ! কাক-চিল এ ব্যাপার জানে না যখন, লেখা-লেখির কি দরকার ? বন্ধকী ব্যাপারের নাম-গন্ধ না তুলে আপনি তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করে ফেলুন ! হ্যাঁ, তবে একটা কথা আমার বলবার আছে। বিক্রির টাকা যদি হাজারের ওপর হয়, হাজার আপনি নিয়ে বাকিটুকু আমাকে জমা দিয়ে দলিলে উসুল করিয়ে নেবেন।

কাজ যথাসময় হাসিল করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বিক্রীত জমির চৌহদ্দিসমেত ফিরিস্তি ও ক্রেতার নাম পাতিরামকে জানাইতে দ্বিধা করেন নাই। তবে দলিলে কিছু টাকাই উসুল দিতে পারেন নাই। এক বন্দ বাগান ও কয়েক বিঘা ধান-জমি বিক্রয় করিয়া পৌনে নয় শত টাকার বেশী তিনি পান নাই।

কিন্তু এই ঘটনার পর মাস পূর্ণ হইতে না হইতে এই গুপ্ত কথাটি চারিদিকে সহসা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইল যে, চক্রবর্তী মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্পত্তি পাতিরাম পাকড়ের নিকট বন্ধক রাখিয়া, তাহার অজ্ঞাতে উক্ত বন্ধকী সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রয় করিয়াছেন !

যে ব্যক্তি পৌনে নয় শত টাকায় চক্রবর্তী মহাশয়ের বাগান ও জমি কিনিয়াছিল, বেনামা-পত্রে বন্ধকী ব্যাপার জানিয়া সে চক্রবর্তী মহাশয়ের নামে উকিলের চিঠি দিল।

এইভাবে বিপদাপন্ন হইয়া এবার যখন চক্রবর্তী মহাশয় পাতিরামের গদিতে আসিলেন, তখন তাহার মূর্তি পরিবর্তিত হইয়াছে। মুখের সে ভঙ্গি নাই, ভাষায় সে মাদকতা নাই, বাহ্য মহানুভবতা খোলস ত্যাগ করিয়াছে !

চক্রবর্তী মহাশয়কে দেখিবামাত্র পাতিরাম কঠিন হইয়া রূঢ়স্বরে জানাইল, আপনার কাছে আমি লোক পাঠাচ্ছিলুম, এসেছেন ভালই হয়েছে ; টাকাগুলো আমাকে চুকিয়ে দিতে হবে—পনেরো দিনের মধ্যে।

চক্রবর্ত্তী অবাক্ ! তিনি আসিয়াছেন, গুপ্তকথা কেন ব্যক্ত হইয়াছে—তাহা জানিতে, উকিলের চিঠির কি জবাব দেওয়া যাইবে, তাহার যুক্তি লইতে ! কিন্তু আসিতে না আসিতে পাতিরামের মুখে এ কি কথা ! সে তো তাগাদা করিবার পাত্র নয়, টাকা লইবার সময় কথা ছিল, মাসে মাসে সুদ দিয়া গেলেই চলিবে,

আসলের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সুদ তো তিনি ফেলেন নাই; তবে?

উকিলের চিঠি দেখিতেই পাতিরামের মুখে ভাতিল নিষ্ঠুর হাসি, পরক্ষণেই যেন বোমা ফাটিয়া গেল! চীৎকারে খোলার ঘরে ঝনঝনা তুলিয়া হাঁকিল, জোচ্চোর, পাজী, বজ্জাত! জোচ্চুরির আর জায়গা পাও নি! আমার কাছে জমি-বন্ধক রেখে, সে কথা ভাঁড়িয়ে জমি বেচেছ অপরকে! এত বড় বুকের পাটা! তোমাকে যদি না আমি জেল খাটাই, আমার নাম পাতিরাম পাকড়ে নয়!

ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গ তখন ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে! এত বড় অপমান এ পর্যন্ত কেহ তাঁহাকে কখনও করিতে পারে নাই। অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া তিনি কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, তুমি কি আজ নতুন হয়ে এলে, পাতিরাম। তোমার মুখে এ কথা শুনব, আমি কখনো প্রত্যাশা করি নি! বিনা অপরাধে তুমি আমাকে চোর-ছ্যাচড়ের মতন অপমান করলে! বন্ধকী জমি আমি বিক্রয় করেছি সত্য, কিন্তু তুমিই কি আমাকে এ কার্যে প্ররোচিত কর নি?

বোমা এবার ফাটিয়া চৌচির! হাত-মুখ খিঁচাইয়া, কণ্ঠে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাতিরাম তারস্বরে গর্জন করিল, কি, মিথ্যাবাদী! আমি তোমাকে জুচ্চুরি করতে বলেছি? আমার কাছে যে জমি তুমি বন্ধক রেখেছ, জোচ্চোর, আমি তোমাকে তা বিক্রি করতে বলেছি? আমার নিজের পা দুখানা তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি জোড়-হাত করে সেধেছিলুম তোমাকে—দয়া করে কুড়ুল চালাও ধর্মাবতার!

ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু ছাপাইয়া তখন অশ্রুর বন্যা ছুটিয়াছে। আর্তস্বরে তিনি কহিলেন, তোমার মত আমি তো চীৎকার করতে পারব না বাবা, সে শক্তি আমার নেই। তর্কও তোমার সঙ্গে আমি করব না, মা ব্রহ্মময়ী তোমার আমার সে দিনের কথা শুনেছেন, আজও শুনছেন। এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল! আমি যখন তোমার কাছে ঋণী, যে কারণেই হোক, বন্ধকী সম্পত্তি যখন বিক্রয় করেছি, তখন অবশ্যই আমি অপরাধী। এখন কি তুমি আমাকে করতে বল?

পাতিরাম স্বর এবার অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া কহিল, আমার যা বলবার, প্রথমেই তা বলেছি। পনের দিনের মধ্যে যদি আমি সমস্ত টাকা বুঝে না পাই, তা হলে ষোল দিনের দিন দেওয়ানী ফৌজদারী দু দফা মামলাই আমাকে এক-সঙ্গে জুড়তে হবে।

একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, মা ব্রহ্মময়ীর যা ইচ্ছা, তাই হবে।

পাতিরামের ব্যবহার ও মিথ্যাচার নিষ্ঠাবান্ সরল ব্রাহ্মণের বুকে শেলের আঘাতের মত বাজিয়াছিল। এই বর্বরের কঠোর ঋণপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি সর্বস্ব পণ করিলেন এবং পনের দিনের মধ্যেই তাঁহার ভদ্রাসন ও অবশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধকের পরিমিত টাকাতেই বিক্রয় করিয়া অঋণী হইলেন। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে কিয়দংশ সম্পত্তি পৌনে-নয় শত টাকায় কিনিয়াছিল, সে-ই ব্রাহ্মণকে বিপদাপন্ন দেখিয়া ছয় হাজার টাকার সম্পত্তি তিন হাজারে ক্রয় করিল।

রেজিস্টারী আফিসে টাকা উসুল করিতে গিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত পাতিরামের যখন চোখোচোখি হইল পাতিরাম ওষ্ঠপ্রান্তে সেই হাসি টানিয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল, মিছেই মা ব্রহ্মময়ীকে ডেকেছিলে ঠাকুর,—শেষরক্ষাটা তার সাধ্যে কুলোলো না!

চক্রবর্তী মহাশয় মুখ ফিরাইয়া লইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সায়াহ্নে বাসায় ফিরিয়া মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাশ্রুনয়নে আর্তস্বরে কহিলেন, মা ব্রহ্মময়ী! সর্বহারা হয়ে তোর দ্বারকেই সার করতে হল,—শেষরক্ষা তোরই হাতে।

॥ তিন ॥

মাছের ব্যবসায়ে সমব্যবসায়ীদিগকে পিছনে ফেলিয়া পাতিরাম এত উঁচুতে উঠিয়া গেল যে, তাহার নাগাল পাওয়া অন্যের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

পাতিরামের পূর্বে যাহারা এই চালানী ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা শীতের সুযোগ লইয়া মাত্র চারিটি মাস এই ব্যবসায় চালাইত এবং তাহাতেই যে প্রচুর উপার্জন করিত, শীতের সীজ্‌নে কয়টি মাস ব্যবসায় চালাইবার পর গরমের সময় এই ব্যবসায় চালাইবার আর প্রয়োজন হইত না। পাতিরাম কিন্তু মাথা খেলাইয়া বারো মাস সমানভাবে এই ব্যবসায়টি চালু রাখিয়া ব্যাপারী-মহলকে অবাক করিয়া দিল। সে নিজে পশ্চিম প্রদেশের বড় বড় মোকামগুলিতে গিয়া অগ্রিম টাকা দাদন দিয়া স্থানীয় জেলেদিগকে শর্তবদ্ধ করে—তাহারা নিয়মিতরূপে গভীর রাত্রে নদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে, সেই নৌকা ভরিয়া মাছ তীরে আনে;

সেখানে পাতিরামের লোক বাক্স ও বরফ লইয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তাহারা মাছের ওজন করিয়া বড় বড় প্যাকিং বাক্সে সেই মাছ ভরিয়া চূর্ণ বরফ দ্বারা ভিতরের ফাঁক ও উপরিভাগ পূর্ণ করিয়া পেরেক ও লৌহপাত দ্বারা যন্ত্র সাহায্যে ডালা আঁটিয়া দেয়।

নদী-সংলগ্ন রেল-স্টেশনের সন্নিহিত প্রত্যেক স্থানে এক-একটা অস্থায়ী চালাঘর ভাড়া লইয়া পাতিরামের সুব্যবস্থায় বাক্স ও বরফ প্রচুর পরিমাণে মজুত রাখা হয়। কেমন করিয়া বাক্স মধ্যে তাজা মাছ সাজাইতে হয়, কি ভাবে চূর্ণ বরফ লবণ সংযোগে বাক্সের মাছের উপর দিলে রেল-পথে বিশ-বাইশ ঘণ্টা থাকিলেও বরফ গলিয়া নিঃশেষ হয় না এবং মাছগুলি টাটকা থাকে—প্রথম প্রথম পাতিরাম নিজে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে বাক্সে ভরিয়া বরফ সংযোগে মাছ চালানের প্রণালী স্থানীয় কর্মীদিগকে শিখাইয়া দেয়। ক্রমে তাহারা কর্মঠ হইয়া ওঠে। ফলে, সকল স্থানেই এই চালানী ব্যাপার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহলে একটা নূতন রকমের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়া উঠে। স্থানীয় জালিকগণের মধ্যেও বারো মাস জীবিকা-অর্জনের জন্য রীতিমত উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়। এমন কি নদীতে মৎস্যাভাব ঘটিলে সন্নিহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝিল ও অন্যান্য বিস্তীর্ণ জলাশয়ে মালিকদিগকেও পাতিরাম এই ব্যবসায়ের সংস্পর্শে সংশ্লিষ্ট করিয়া পশ্চিমা অভিজাতসমাজেও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যাঁহারা মাছের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতেন, যাঁহাদের বিরাট বিরাট মৎস্যপূর্ণ দিঘিগুলি মৎস্যভোজীদের রসনায় লালার সঞ্চার করিত, পাতিরামের বাকপটুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহারাও পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত জলাশয়গুলি মৎস্যব্যবসায়ী পাতিরামকে দীর্ঘদিনের ইজারা দিতে বাধ্য হন। অপ্রত্যাশিতভাবে জলাশয়গুলি উপলক্ষ্য হইয়া হাতে মোটা টাকা অগ্রিম দাদন স্বরূপ উপহার দিলে তাঁহারা তখন ব্যাপারটি তাজ্জব ভাবিয়া চমকিত হন। কিন্তু পরে বুদ্ধিমান পাতিরাম লোকচক্ষুর অন্তরালে গভীররাত্রে সেই জলাশয়জাত দীর্ঘকালের সঞ্চিত মৎস্যকুল তুলিয়া স্টেশন-সন্নিহিত আস্তানায় লইয়া গিয়া তাহাদের সদ্গতির ব্যবস্থা করে, মহানগরীর বুকে সেই সব মাছ 'দুর্লভ' বস্তু রূপে গণ্য হইয়া পাতিরামের ধনভাণ্ডার স্ফীত করিয়া তোলে। ইহা গল্পকথা নহে, এখনও মহানগরের অধিকাংশ অধিবাসী যাহার সন্ধান রাখেন না এবং যে ব্যাপারে অজ্ঞ বলিলেও চলে, সেই বিস্ময়কর ব্যাপারটির পরিকল্পনা বহু বহু পূর্বে পাতিরামের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ঘাটিত হয়, এবং বাংলা দেশের সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, এমন কি রাজপুতানা পর্যন্ত তাহা কার্যকরী হইয়া তাহাকে

স্মরণীয় করিয়া রাখে। কিন্তু নদী ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশের অভিজাত ব্যক্তিদের বিখ্যাত 'তালাও' হইতে মৎস্য-সংগ্রহের খবরটি অতি সন্তর্পণে চাপিয়া রাখে। এবং তাহার সংবাদগুপ্তির প্রণালী ব্যবসায়ীমহলে এতই পরিপাটি ছিল যে—এমন কি রাজপুতানার বিখ্যাত উদয়সাগরের বর্ধিষ্ণু মৎস্যকুল যে একটা মহাযুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আর একটা মহাযুদ্ধের স্থিতিকাল পর্যন্ত বিশেষ ব্যবস্থায় বাংলার মহানগরীর বক্ষোজাত হইয়া মৎস্যভোজী বাঙালীর রসনাতৃপ্ত করিয়াছিল—বাহিরের বড় বড় ভূস্বামী—রাজা মহারাজা ঠাকুর, নবাব আমীর খাঁ বাহাদুর, এ সংবাদ অনেকেই জ্ঞাত নহেন।

একথা সম্ভবতঃ যথার্থ বলিয়াই মানিতে হইবে যে, পাতিরামের পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে মৎস্য আমদানীর এরূপ ব্যবসায় ব্যাপকভাবে কেহই আরম্ভ করে নাই এবং বাক্স ও বরফ যে এই ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন, ইহাও পাতিরামের উদ্ভাবিত উপায়। এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বেই পাতিরাম মৎস্যপ্রধান অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করে, সেই সঙ্গে সন্নিহিত অঞ্চলের বরফ কলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বরফ-সরবরাহের ব্যবস্থাটি করিয়া রাখে। তাহার পর জেলেদের সহিত চুক্তি করিয়া মাছের দর যে হারে বাঁধিয়া দেয়, জেলেরা তাহাতে উৎফুল্ল হইয়া এই মহাপুরুষটির নামে জয়ধ্বনি তুলিলেও, তাহারা কল্পনাও করে নাই যে, কলিকাতার বাজারে তাহার দর কত অধিক!

সে যাহাই হউক, বরফ-সংযোগে মাছ পাঠাইবার ব্যবসায়টির প্রবর্তকরূপে পাতিরাম পাকড়ে যুগান্তর ঘটাইয়া যথার্থই আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া বসে। শুধু তাহাই নয়—আটঘাট বাঁধিয়া এই ব্যাপারটিকে অন্যের পক্ষে এমনই দুর্গম করিয়া রাখে যে, লোভের বশবর্তী হইয়া কোন নবাগত এই পথে পদক্ষেপ করিলেও লাভবান হইতে পারে না।

পাতিরামের উন্নতি দেখিয়া যদি কোনও নূতন কর্মী হাওড়ার মেছোহাটায় তাহার অদৃষ্টতরণী ভিড়াইতে চাহিত, সঙ্গে সঙ্গেই অমনি পাতিরামের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় আবর্তের পর আবর্তের সংঘাতে তরী তীরে লাগিবামাত্র বানচাল হইয়া যাইত। বাজারের প্রত্যেক পাইকারটি পাতিরামের খাতক, তাহার কাছে প্রায় প্রত্যেকেরই টিকি বাঁধা। কে না জানে, পাতিরামের নির্দেশমত বাজারের দর ওঠা-নামা করে? সুতরাং পাতিরামের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না যে টিকিয়া যাইবে।

সেদিন আড়তের কাজ শেষ হইলে পাতিরাম উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময়

আড়তের সামনে বড় রাস্তার উপর একখানি জুড়ি আসিয়া থামিল। গাড়ির পিছনে উর্দিপরা সহিস দাঁড়াইয়া ছিল, গাড়ি থামিতেই সে তাড়াতাড়ি নামিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

গাড়ির ভিতর হইতে পাতিরামেরই সমবয়সী ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবা ধীরে ধীরে নামিয়া, একশ্রেণীর বড়লোকের অভ্যাসমত হেলিয়া দুলিয়া—আড়তের যে-অংশে পায়া-উঁচু তক্তপোশের উপর পাতিরাম পাকড়ে একটা কাঠের বাক্স কোলে করিয়া বসিয়াছিল—সেইদিকেই অগ্রসর হইল।

চেহারাখানি তাহার ছিপ্‌ছিপে পাতলা, গায়ের রঙ খুব ফর্সা না হইলেও ময়লা বলা যায় না, গোঁফের প্রান্তদুটি ছাঁটা, যতখানি আছে তাহাও কটা; একটি চক্ষু ঈষৎ টেরা, গায়ে চুনট করা আদ্দির পাঞ্জাবি, তাহার উপর জরির আঁচলাদার বেনারসী একলাই চাদরখানি বেশ কায়দা করিয়া ফেলা; পায়ে তখনকার দিনের শৌখিন সমাজের বাঞ্ছিত ডিসিনের দোকানের বার্নিশ করা পাম্পসু, হাতে একগাছি সরু ছড়ি—তার মাথাটি সোনার পাত দিয়া মোড়া এবং মনোগ্রাম করা।

তক্তপোশটির প্রায় কাছে আসিয়াই আগন্তুক পাতিরামের দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, চিনতে পারিস পাকড়ে ?

আড়তের কাজ তখন শেষ হইয়াছে, কর্মচারীরা হিসাবের খাতাপত্র গুছাই-তেছে, কুলীরা ওজনের পাল্লাবাটকারা ধুইয়া মুছিয়া তুলিয়া রাখিতেছে পরদিনের কাজের সুসারের জন্য। এমনি সময় মস্ত এক বিলাসী বাবু আড়তে আসিয়া তাহাদের রাশভারী মনিবকে উদ্দেশ করিয়া এভাবে আলাপ করায় তাহারা প্রত্যেকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু পাতিরামের মুখের ভাব একটুও পরিবর্তিত হইল না, সে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্নটার এইভাবে জবাব দিল, চিনতে পারি নি প্রথমটা, ভেবেছিলাম কাশিমপুর কি হাসিমগড়ের কোন রাজপুত্তুর মেছোহাটাকে ধন্য করতে এসেছেন—

আগন্তুক হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল; হাসির সেই গমক থামিলে বলিল, বটে! তার পর—

তেমনিই গম্ভীর মুখে পাতিরাম বলিল, তার পর—টালার সাতকড়ি মুখুজ্যের সবচিন জুড়িগাড়িটার ওপর নজর পড়তেই ছেলেবেলাকার টালার ইস্কুলের ছবিটা চোখের ওপর ভেসে উঠল।

ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে আগন্তুক বলিল, টালার ইস্কুলের ছবি ?

পাতিরাম বলিল, হ্যাঁ হে, মনে নেই—ঐ সাতকড়ি মুখুজ্যের ছেলে রাধু-বাবুর মন রাখতে—ছুটির পর তার জুড়িতে চাপবার লোভে এই পাতিরাম পাকড়ের কুলুজি শোনাতে ক্লাসের সব ছেলেকে—পাকড়ের অপরাধ, মায়ের মাছ বিক্রি-করা পয়সায় সে পড়াশোনা করে; তোমাদের মত বাবুদের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসে; তার সঙ্গে কথা বলতেও লজ্জা পেতে···সেই ছবি যেমন মনে পড়া, অমনি মন জানিয়ে দিলে—সেদিনের সেই কৃত্তিবাস কোলেই আজ রাধুবাবুর গাড়ি চড়ে এসেছে, আসলে সে বড়লোকের মোসাহেব! এখন বল—ঠিক চিনেছি কিনা তোমাকে?

কৃত্তিবাসের মুখখানা পলকে কালো হয়ে উঠল; সেই মুখখানাকে ঘুরিয়ে সে বিকৃত স্বরে বলল, দেখছি তোর স্বভাব ঠিক আছে, একটুও বদলায় নি। রাধুবাবুর ওপর তোর রাগ আর হিংসে ছেলেবেলা থেকেই—যখন আমরা ইস্কুলে এক সঙ্গে পড়ি। রাধু আমার বন্ধু, আমরা এক দলের; তাই—আমাকেও ভুল বুঝেছিস্ তুই। ভদ্রসমাজে তো মিশিস নি, তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতেও শিখিস নি।

পাতিরামও শ্লেষের সুরে কথাটার উপযুক্ত উত্তর দিল, ইটটি গোড়ায় ছুঁড়লেই পাটকেলটি খেতে হয়—এ তো জানা কথা। তেরো-চোদ্দ বছর পরে তোমার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। তুমি এখানে এসেই যে ভাষায় কথা বললে সে কি ভদ্রলোকের ভাষা? কাজেই, আমাকেও পাল্টা জবাব দিতে হল। এখন বুঝলে পাতিরাম পাকড়ে তোমাকে চিনতে পেরেছে?

কৃত্তিবাস বলিল, শুনতে পাই চালানী ব্যাপারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিস, চেনা লোককে চিনতে পারিস না—

গলায় জোর দিয়া পাতিরাম প্রতিবাদ করিল, মিছে কথা, পয়সা কামালেও আমি যে ভোল বদলাই নি, আমার পোশাক তার সাক্ষী দিচ্ছে। আমি যে গরিবের ছেলে, আমার মা মাথায় মাছের টুকরি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরি করে বেচে আমাকে মানুষ করেছে, নিত্যই সকাল সন্ধ্যা দুটি বেলা তা মনে করি। কিন্তু তোমার বাপ-মা না হোক, পিতামহ যে ক্ষুর কাঁচি নিয়ে লোকের বাড়িতে গিয়ে চুল নোক কেটে ক্ষৌরীর পেশা চালাত, তুমি সেটা ভাবতে পার?

কৃত্তিবাস একথা শুনিয়াই হুঙ্কার দিয়া উঠিল, শাটআপ! জানিস, কালই তোর চাল কেটে ভিটে-ছাড়া করতে পারি?

পাতিরামের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; সেই সঙ্গে শ্লেষের একটু

ঝিলিক তুলিয়া বলিল, যে হেতু তোমার মামা সৃষ্টিধর দাস নিকিড়িপাড়ার ইজারাদার? কিন্তু শহর কলকাতার বুকে এটা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তা হলে এর পাল্টা জবাব শোন—ঐ যে বড় বড় প্যাকিং বাক্স দেখছ, ওদের যে কোন একটার ভিতরে তোমাকে জীবন্ত ভরে বরফ দিয়ে এঁটে তোমার মামার সেরেস্তায় পাঠিয়ে দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব নয়—বুঝলে?

কথাটা শুনিয়া কৃত্তিবাস হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে তাহার বক্র চক্ষু দুটির দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করিয়া পাতিরামের মুখে নিবদ্ধ করিল। কিন্তু সে মুখে তখন হাসির কোন চিহ্ন ছিল না। হঠাৎ কণ্ঠের স্বরটা কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া কৃত্তিবাস কহিল, ছেলেবেলাকার তোর সেই বুনো স্বভাব ঠিকই আছে দেখছি, ঠাট্টাও বুঝিস্ না! এই গিদ্‌ঘুটে মন নিয়ে কি করে যে ব্যবসা চালিয়ে তালেবর হয়েছিস ভেবে পাই নে! যাক্, আমি একটা কাজের কথা নিয়েই এসেছিলাম।

পাতিরামের মুখে পরিবর্তনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না, পূর্বের মতই ধীর ও অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, মাছ চাই, না কি মাছের ব্যাপার করতে চাও?

বিস্ময়ের ভঙ্গিতে কৃত্তিবাস বলিল, জ্যোতিষ শিখিছিস নাকি—যে মনের কথা টেনে বলে দিলি? তা হলে বলি, মাছ যদি স্টকে থাকে, খেতে দিস তো নিয়ে যাব বৈকি; কিন্তু আসল চাহিদা হচ্ছে ওরই-ব্যাপার করা। আমিও তোর মতন মাছের কারবার করব ঠিক করে ফেলেছি। এখন তোর কাছে জানতে এসেছি, এতে সুবিধে হবে তো?

পাতিরামের মুখে ঈষৎ একটু হাসি ফুটিল, সে হাসি উপেক্ষার। তারই মাঝে মৃদুস্বরে বলিল, ঠিকঠাক করে আমাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছ সুবিধে হবে কিনা! ব্যবসার কাজ বা মাছের ব্যাপার কি এত সোজা?

মুখখানা ভার করিয়া কৃত্তিবাস কহিল, জিজ্ঞেস করতে এসেছি বলেই অমনি ল্যাজ মোটা করে বসলি? এখানে শক্ত সোজার কথা আসে কেন? তুই যদি এ ব্যাপারে সুবিধে করতে পারিস, আমরাই বা পারব না কেন? কলকাতা শহর জুড়ে যখন আমাদের নাম, টাকার পরোয়া করি নে, তখন কেন সুবিধা হবে না শুনি?

তেমনই ভাবভঙ্গি মুখে প্রকাশ করিয়া পাতিরাম কহিল, তোমাদের সুবিধা হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে, তাই স্পষ্ট আর সত্য কথা বলছি—বুঝলে? প্রথম কথা হচ্ছে—কারও কারবারের উন্নতি দেখে যারা আগা-পিছু না ভেবে সেই

কারবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের লোভ দেখে মুখ টিপে হাসেন, আর সে কারবার ফাঁক হয়ে যায়। তবুও এ কারবারে কিছু রস আছে, একবারে নষ্ট হয় না, সেটা রাখতে পার—তোমার বা রাধুবাবুর বাড়ির মেয়েরা দরকার হলে যদি মাছের টুকরি চাপিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে।

দুই চক্ষু পাকাইয়া তর্জনের সুরে এবার কৃত্তিবাস ধমক দিল, মুখ সামলে কথা বলবি পাকড়ে—ঠাট্টারও একটা মাপ আছে জানবি।

পাতিরামের মুখে পুনরায় হাসির একটু আলো ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার আভায় দিব্য স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, কাজ-কারবারের সম্পর্কে আমি কখনও ঠাট্টা করি না, যা বলেছি খাঁটি, তবে শুনতে তেতো লাগে তাতে ভুল নেই।

কৃত্তিবাস বিরক্তভাব মুখে প্রকাশ করিয়া কহিল, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না বাড়ির মেয়েদের কথা এখানে আনা হল কেন? লোক রাখবার ক্ষমতা কি আমাদের নেই?

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, থাকলেও তাদের দিয়ে এ কাজ হয় না।

উষ্ণ হইয়া কৃত্তিবাস কহিল, যে লোক লাখ টাকা নিয়ে কারবারে নামবে তার আবার লোকের অভাব! আমরা যদি এখানকার কারবার মনোপলি করি—এক চেটে অধিকার নিয়ে আমরা চালাই—তা হলে?

একটু শক্ত হইয়া পাতিরাম কহিল, এই মতলব নিয়েই এখানে যদি ব্যাপার করতে আস—যারা এ ব্যাপারে এখানে করে খাচ্ছে, তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে কাজ চালাবার ফন্দি করে থাক, তা হলে আগে থেকেই বলে রাখছি—তোমাদের ব্যাপারে এখানকার কেউই ভ্রূক্ষেপ করবে না, কারবার এক চেটে করবার আগেই তোমরা হবে এক ঘরে, কুলীরাও তোমাদের বাক্স ছোঁবে না। তাই বলছি, এ ব্যাপারে এখন নামা, না-নামা, তোমাদের খুশি।

তীক্ষ্ণস্বরে কৃত্তিবাস কহিল, এ হচ্ছে তোর জেলাসি।

হাসি-মুখে পাতিরাম মন্তব্য করিল, না হে না—এ হচ্ছে আমাদের জেতের পলিসি।

পুনরায় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কৃত্তিবাস তর্জন করিয়া পাতিরামের মন্তব্যের উত্তর দিল, আচ্ছা, আমি দেখে নেব তোদের জেলে জাতের এ পলিসি আমি ভাঙতে পারি কি না। তুই যেমন পাতিরাম পাকড়ে, আমিও তেমনি কৃত্তিবাস কোলে। কালই সকালের এক্সপ্রেসে মুঙ্গের থেকে পঞ্চাশ মন মাছ আমার আসছে, দেখি তুই কি করে ঠেকাস্—আর তোর জেতের লোককে রুখে সে মাছ পচাস্—

পাতিরামের মুখে তখনও হাসির আভা ঝিলিক দিতেছিল। কিছু মাত্র রুষ্ট না হইয়া সে শুধু বলিল, শুধু তুমি কেন—তোমার মুরুব্বী রাধুবাবুকে এনে হাজির করলেও হালে পানি পাবে না, তা বলে রাখছি।

কৃত্তিবাস আবার তর্জন করিয়া বলিল, এর মধ্যে খালি খালি রাধুবাবুকে এনে জড়াচ্ছিস্ কেন শুনি? কারবারে নেমেছি আমি—

পাতিরাম বলিল, হ্যাঁ হে হ্যাঁ, তোমাকে নামিয়ে পিছনে শিকলি বেঁধে নাচাচ্ছেন ঐ রাধুবাবু। তাঁরই জুড়ি চেপে এসেছ, তারই জমিদারি মুঙ্গের থেকে মাছ আনাচ্ছ—রাধুবাবুদের সেখানে অভ্রের কারবার রয়েছে, সেখান থেকে মাছ পাঠাবার পন্থাও তাঁর আছে—এ সব কি ঠিক নয়? যাই হোক, আবার বলছি, এ মেজাজ নিয়ে কুবেরের ঐশ্বর্য ঢাললেও এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবে না।

মুখখানা রুক্ষ করিয়া কৃত্তিবাস বলিল, আচ্ছা—দেখা যাবে, এ ব্যাপারে না হয় একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েই গেলাম। এ বাজারে ব্যাপারী তো একলা পাতিরাম নয়, আরও অনেক রাম আছে, বেশ, কাল সকালেই দেখা যাবে।

কথাগুলি বলিতে বলিতে কৃত্তিবাস পাতিরামের আড়ত হইতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার মুখে সন্নিহিত আরও দুইটি আড়তে সন্ধান লইতে গিয়াও কাজের কিছু হইল না। পাতিরামের আড়ত হইতে এই বিলাসী বাবুটিকে বাহির হইতে তাহারা দেখিয়াছিল। উভয়স্থল হইতেই কৃত্তিবাস একই উত্তর পাইল—আগে যাঁর আড়তে গিয়েছিলেন, তিনি এখানকার মাথা। তাঁর সঙ্গে যখন আগে কথা বলেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস না করে আমরা আপনার সঙ্গে ব্যাপার করতে পারব না বাবু! বেশ, কাল সকালে আড়তে তো আসুন, আপনার চালানও আসুক, তখন দেখা যাবে।

ইহাদের কথা কৃত্তিবাসকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত করিল বৈ কি! ইহারা তো আর জেলাসির বশবর্তী হইয়া কথা বলে নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কৃত্তিবাস গাড়ির উদ্দেশে চলিল।

গাড়ির ভিতরে কৃত্তিবাস বসিয়াছে, এমন সময় পাতিরামের আড়তের দুই জন মজুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটি রোহিত মাছ বহন করিয়া আনিয়া সবিনয়ে বলিল, বাবু পেঠিয়ে দিলেন আপনকার তরে।

মাছ দুটির লোহিত পরিপুষ্ট আকৃতি দেখিয়া কৃত্তিবাসের রসনা সরস হইয়া উঠিল, সুতরাং কণ্ঠস্বর একটু কোমল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাম কি বলেছে?

উভয় মজুরই একসঙ্গে দাঁতে জিভ কাটিয়া কথাটার মৌন প্রতিবাদ করিল,

একটু পরে এক জন বলিল, বেচবার লেগে বাবু আপনারে মাছ তো পাঠান নি হুজুর, দোস্তী আছেন তাই ভেট পাঠিয়েছেন। বাবু কোয়েছেন গো, আপনকার কোন্ রাধুবাবু আছেন, একটা মাছ তেনারে দিবেন, আর একটা আপনার তরে নিবেন!

আনন্দে-বিস্ময়ে কৃত্তিবাসের সর্বাঙ্গ চুলবুল করিয়া উঠিল। এত বৃহদায়তনের মাছ সচরাচর দেখা যায় না, দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য জিনিস, পাতিরাম ইহা নিঃস্বার্থভাবে খয়রাত করিতেছে। জেলের ছেলে হলেও দেখছি ওর নজর আছে!

সহিসের সাহায্যে মাছ গাড়িতে তোলা হইলে কৃত্তিবাস পুনরায় শুধাইল, আচ্ছা, মাছ দুটো ওজনে কত হবে, আর এ মাছ কোথা থেকে এসেছে বলতে পার বাপু?

লোকেদের মুখ থেকে যে উত্তর শুনিল কৃত্তিবাস, তাহাতে তাহার লোভ ও আনন্দ আরও প্রখর হইল। তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে আজই খানিক আগে ব্যাপার তখন বন্ধ হইয়াছে, এমন সময় ভদ্রেশ্বর হইতে এই মাছের চালান আসে—পুকুরের মাছ। কালকের বাজারে চড়া দরে বিক্রয়ের জন্য বরফ চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল, একই ওজনের দুইটি মাছ—প্রত্যেকটি দশ সের।

কৃত্তিবাস আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতে থাকে এই মাছ লইয়া মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার কি লাভ? এত বড় মাছ, তার উপর চালানী নয়—টাটকা, খুব কমই দেখা যায়। সুতরাং রাধুরও মাথা ঘুরিয়া যাইবে মাছ দেখিয়া। কিন্তু এই উপলক্ষে কিছু বাণিজ্য করিয়া লইলে ক্ষতি কি? অগত্যা সে স্থির করিল, বখরায় মাছের কারবার করিবার জন্য যে পাঁচ হাজার টাকা রাধুর নিকট পাইয়াছে, তাহা হইতেই মাছ দুটির টাকা কাটিয়া লইবে, তাহাকে বলিবে যে, মাছের হাট হইতে সুবিধায় ডাকিয়া লইয়াছে।

বেলা তখন দুই ঘটিকা পার হইয়া গিয়াছে। মাছ লইয়া উডমণ্ট স্ট্রীটে রাধু-বাবুর হার্ডওয়ারী আফিসে উপস্থিত হইলে মাছ দেখিয়া আফিস সুদ্ধ সবাই উল্লাসে বুঝি নৃত্য সুরু করিয়া দেয়।

রাধুবাবুর মেজাজ এসব ব্যাপারে রাজার মত, যাহাকে দিলদরিয়া লোক বলা হয়। সুবিধায় এক জোড়া মাছ কিনিয়াছে কৃত্তিবাস, ইহাতে তাহার কি আনন্দ। তৎক্ষণাৎ কৃত্তিবাস সহ আফিসের অন্যান্য অন্তরঙ্গদের বাড়িতে সেদিন

রাতের ভোজে নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। পত্নী নিভাকে একখানি পত্রে মাছ সম্পর্কে রাত্রির ভোজের ব্যবস্থা লিখিয়া মাছ দুইটি সহিসকে দিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিল।

রাধুবাবুর খাস কামরায় নিভৃতে কৃত্তিবাস মাছের ব্যাপার সম্বন্ধে যে সব কথা রীতিমত বাড়াইয়া শুনাইয়া দিল, তাহাতে তাহার মত আত্মম্ভরী দাম্ভিক ব্যক্তির পক্ষে ক্রোধ বা বিরক্তি স্বাভাবিক। বাল্যকালে পাতিরাম যখন টালার বিদ্যাসাগর হাই স্কুলে পড়িত, সে সময় যে কয়টি বড়লোকের ছেলের সহিত মোটেই তাহার বনিবনা হইত না, এবং পাতিরাম যাহাদিগকে এড়াইয়া চলিতে চাহিলেও তাহারা সে সুযোগ তাহাকে দিত না, টালার বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী স্বনামধন্য সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র এই রাধানাথ। কৃত্তিবাসপ্রমুখ অবস্থাপন্ন ঘরের আরও কতকগুলি ছেলে ইহাদের দলে ছিল, এবং পিতা সাতকড়ি বাবুর কর্মক্ষেত্র হইতে অবসরগ্রহণের পর রাধানাথ উডমণ্ড স্ট্রীটের পৈতৃক বিরাট হার্ডওয়ার কারবারের গদিতে অধিষ্ঠিত হইলে ছাত্রজীবনের সেই দলটির অনেকেই তাহাকে ঘিরিয়া মজলিস জমকাইয়া তোলে ও নানাভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কৃত্তিবাসের মুখে পাতিরামের বৃত্তান্ত শুনিয়া রাধানাথের চিত্ত বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। হুঙ্কার তুলিয়া সে কৃত্তিবাসকে ভরসা দিয়া বলিল, তুমি ঘাবড়িও না বন্ধু পাকড়ের কথায়, এ তো আর মগের মুল্লুক নয় যে যা ইচ্ছা তাই করবে। আমরা যখন এ কাজে নেমেছি, কিছুতেই পেছুব না, হার্ডওয়ার বাজারে যেমন কর্তৃত্ব করছি, ওখানেও সেটা করে ওর দেমাক ভেঙে দেব।

কৃত্তিবাস বলিল, তা হলে তোমারও যাওয়া উচিত, কালকের ব্যাপারটা যাতে ভাল ভাবে হয়, তার ব্যবস্থা করতে। তোমাকে দেখলে, আর তোমার বাবার নাম শুনলে সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

রাধানাথ তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটা বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, আমি গেলে তার ফল যাই হোক, আমার যাওয়া হতে পারে না। আমি মাছের কারবারে নেমেছি, একথা শুনলে বাবা তখনই আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করবেন। সাধে কি তোমাকে টাকা যুগিয়ে কারবার ফেঁদেছি? তুমি কাজ চালাবে, আমি টাকা দিয়েই খালাস। তুমিও জান, বাবা আমার ওপর খুশি নন, তিনি আমার চেয়ে আমার স্ত্রীর ওপর বেশী ভরসা রাখেন। এমনও শুনছি, হয়তো ছেলেকে বঞ্চিত করে ছেলের বৌকে সর্বস্ব দিয়ে যাবেন। এমন ডামাডোলের সময় বাবাকে

তাতানো ঠিক নয়। তুমি ভেবো না, ভয় পেও না, এখান থেকেই আমি সব তদ্বির করব—লোকজন টাকা-পয়সা সব সময় মজুত রাখব তোমার জন্য, শুধু ওখানে যেতে পারব না বন্ধু। তা ছাড়া, আমাদের ইয়ার বন্ধুরা সব আছে, বলে দেব—দল বেঁধে ওরা যাবে।

॥ চার ॥

সাতকড়িবাবুর পৈতৃক বিশাল বাড়ির প্রকাণ্ড দেউড়ির পরেই বিশাল প্রাঙ্গণ, চারদিকে চকমিলানো অট্টালিকা, সামনেই পূজার দালান; ডান দিকের লম্বা ঘরে টানা সেরেস্তা, সামনের দালানে প্রজা খাতক ও প্রার্থীদের অপেক্ষা করিবার স্থান। বাম দিকে কর্তার খাস কামরা বা বৈঠকখানা। একদিকে প্রকাণ্ড ফরাস, দুধের মত সাদা চাদরে আবৃত ঢালা বিছানা, তার উপর চারিদিকে দশ-বারোটি তাকিয়া, ফরাসের মতই তাদের আবরণগুলি ধবধবে সাদা। অন্যদিকে একখানা প্রকাণ্ড গোল টেবিল, তার চারদিকে ভারী ভারী গদি-আঁটা কেদারা, দেওয়াল-সংলগ্ন অতিকায় একটা আলমারিও চোখে পড়ে। এদিকেও ঘরে বাহিরে প্রার্থীদের প্রতীক্ষার স্থান। চেয়ার আছে, বেঞ্চি আছে, এক পাশে আড়াল দেওয়া মেয়েদেরও বসিবার স্থান চিহ্নিত করা আছে, সেখানে একখানা তক্তপোশের উপর সতরঞ্চি বিছানো। নানা বয়সের নানা শ্রেণীর লোক—পুরুষ ও নারী কর্তার কাছে প্রত্যহ দরবার করিতে আসে, সেইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা এবং পালা করিয়া দুই জন বিশ্বাসী লোক এখানে মোতায়েন থাকে।

সিংহের মত প্রতাপে এই বাড়ির কর্তা সাতকড়িবাবু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার বসিরহাট ও বারাসত অঞ্চলের জমিদারি, রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার পাশাপাশি তিনটি কলিয়ারী, মুঙ্গের অঞ্চলের অভ্রের ব্যাপার এবং কলকাতার হার্ডওয়ারী কারবার চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কিছু পূর্বে তাঁহার বয়ঃক্রম আশির সীমা অতিক্রম করিতেই সহসা রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে বাধ্য করে। ইহাতে বর্ষীয়ান পুরুষ সাতকড়িবাবুর কি আক্ষেপ!

তাঁহার এই বিশাল কারবার কে দেখিবে? তিনি কলকাতায় বসিয়া অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনুভব শক্তির দ্বারা যে কারবারগুলি সুশৃঙ্খলে চালাইয়া থাকেন, অকুস্থলে গিয়া হাতে-কলমে দেখিয়া সেভাবে কারবার চালনার যোগ্যতা তো তিনি কাহারও

মধ্যে দেখিতে পান না। কি হইবে ইহার পরিণাম?

চিকিৎসকরা আশ্বাস দিয়া বলেন, কেন আপনি ভাবছেন, এমন উপযুক্ত পুত্র যখন রয়েছে, তার উপর দক্ষ লোকজন—

সাতকড়িবাবু তখন কপালে করাঘাত করিয়া বলেন, ওসব বাজে, বাজে, কেউ কাজের নয়। ছেলে যদি উপযুক্ত হত তা হলে কিসের ভাবনা, ও শুধু ইয়ার বক্সীদের নিয়ে আড্ডা দিতেই শিখেছে। আর লোকজন? সে দোষ আমারই। আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি নি, বিশ বছর বয়স থেকে কারবার হাতে নিয়ে নিজের কেরামতিই দেখিয়েছি সবাইকে; যা করা প্রয়োজন, নিজেই করেছি—বিশ্বাস করতে পারি নি কাউকে, সব সময় আসল চাবিকাটি নিজের হাতে রেখেছিলাম। আজ তার জন্য মনে অনুতাপ হচ্ছে, সাতকড়ি মুখুজ্যের জায়গায় বসবার মত কাউকে তৈরী করতে পারি নি—নিজের ছেলেকেও নয়।

আশ্চর্য কথা, এই সময় পুত্রবধূ নিভা লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে শ্বশুরের শয্যাপ্রান্তে আসিয়া অনুশাসনের স্বরে বলিল, আপনি থামুন বাবা, কারবার যায় যাবে, আমরা চাই, আপনি সেরে উঠুন। আর একটি কথাও আপনি বলতে পাবেন না।

আড়চোখে একবার পুত্রবধূর অনিন্দ্যসুন্দর সুশ্রী মুখখানা দেখিয়া নিয়াই দুর্ধর্ষ সাতকড়িবাবু নীরব হইলেন। সকলেই অবাক—প্রবলপ্রতাপ শ্বশুরের উপর অবলা বধূর এতখানি প্রভাব দেখিয়া।

নিজে পছন্দ করিয়া, পর পর প্রায় পঞ্চাশটি কন্যা দেখিয়া যাচাই করিবার পর এই মেয়েটিকে তিনি পছন্দ করিয়া বধূর মর্যাদা দান করেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই সেদিন তাঁর বধূনির্বাচনের দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে থাকেন। গৃহিণীহীন সংসারে নূতন বধূ আসিয়াই সেকালের গিন্নীর আসন অধিকার করিয়া সুবৃহৎ সংসারের সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দেয়। দাসদাসীদের মুখেও বধূর প্রশংসা ধরে না।

সাতকড়িবাবুও বুঝিতে পারেন, যথার্থই তিনি আদর্শ এক কুললক্ষ্মী আনিয়া গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু বধূর বিবিধগুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি মস্ত একটা ভুল করিয়া বসিলেন। সবার সামনে বধূকে বাড়াইতে গিয়া একমাত্র পুত্র রাধানাথের চিত্তটি বিষাইয়া তুলিলেন। সংসারে এক শ্রেণীর ছেলে আছে, বধূর প্রশংসাকে আত্মপ্রশংসারও অধিক মনে করিয়া আনন্দে অভিভূত হয়। কিন্তু রাধানাথ সে প্রকৃতির পুত্র নয়, তার আভ্যন্তরী প্রকৃতি ইহাতে বিগড়াইয়া গেল।

এবং রূপসী ও বিদুষী বধূ নিভাকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পর্যায়ে ফেলিয়া পদে পদে তাহাকে অপদস্থ করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকিল।

স্বামীর প্রকৃতির এই পরিচিতি নিভাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তোলে। সে-ই সর্বদাই ব্যগ্র হইয়া ওঠে, যাহাতে শ্বশুরের প্রশস্তি বন্ধ হইয়া যায়, অন্ততঃ স্বামীর কানে না ওঠে। এমন সময় সাতকড়িবাবু সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিলেও চিকিৎসকগণের অনুরোধে বৈষয়িক কর্ম হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন। এ অবস্থায় পুত্র রাধানাথ পিতৃ-পরিত্যক্ত কার্যভার গ্রহণ করায় বধূ অনেকটা শান্তি পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু শ্বশুর তাহাকে নিষ্কৃতি দিলেন না, প্রত্যহ মধ্যাহ্নভোজনেব পর একটু বিশ্রাম অন্তে নীচের বৈঠকখানায় বধূকে লইয়া বিচিত্র ধরনের এক শিক্ষাশালা খুলিয়া বসেন। এখানে শিক্ষক তিনি স্বয়ং এবং ছাত্র একমাত্র বধূ নিভা। তাঁর কথা— নিজের কারবার চালাবার শিক্ষা কাউকে দিই নি মা, রাধুকেও নয়, এখন তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছি। আমি লক্ষ্য করেছি, তোমার যা মেধা আছে, তুমি কিছু হদিস পেলেই—আমার মতন ওয়াকিবহাল হবে সব বিষয়ে। সেই ব্যবস্থাই আমি করব। প্রত্যহ দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর একটু জিবিয়ে নিয়ে ঠিক দুটো থেকে আমাদের এই পাঠশালা বসবে।

নিভা প্রথম প্রথম সংকোচ কাটাইয়া বলিয়াছে, তার চেয়ে আপনার ছেলেকে শেখান না কেন বাবা, তার ফল সব দিক দিয়েই ভাল হবে।

কথাটা শুনিয়াই স্থবির সিংহ গর্জন করে ওঠেন, সে হবে না মা, আমার কথা সে এক কান দিয়ে শুনবে, আর অন্য কান দিয়ে বেবিয়ে যাবে। ওকে দিয়ে কিছু হবে না। নিরুপায় হয়েই ওকে কারবারের গদিতে বসিয়েছি। চলতি কারবার, পুরানো বিশ্বাসী লোকজন আছে, দেনাপত্তর নেই—জলের মত গড়িয়ে যাচ্ছে এই যা ভরসা। কিন্তু আমি বলছি মা, কাববার ও রাখতে পারবে না, তার কারণ কারবার চালাবার মত মাথা ওর নেই। ওর চেয়ে তোমার মাথা—অনেক অনেক বেশী সাফ বৌমা। তাই ঠিক করেছি—

নিভা তথাপি মৃদু আপত্তির ভঙ্গিতে বলে, কিন্তু বাবা, ওর যদি কারবার চালাবার শক্তি না থাকে, আর আপনি ওঁর প্রতি ভরসা না রাখেন, আমার দ্বারা কি হবে, কি করতে পারব আমি?

দৃঢ়স্বরে কর্তা বলেন, শেষরক্ষা করবে তুমি। রাধু নিজের দোষে কারবারকে

বিপথে নিয়ে যাচ্ছে দেখলেই তখন তোমাকে সতর্ক হতে হবে। ওর হাত থেকে হাল কেড়ে নিয়ে তুমি তাকে সামলাবে।

মৃদু হাসিয়া বধূ বলে, এ সব কথা শুনতেই ভাল বাবা, কিন্তু কাজে কিছুই হয় না।

কর্তাও দৃঢ়স্বরে আশ্বাস দেন, যাতে হয় সেই চেষ্টাই আমি করব মা। রাধুকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই, আমি তোমাকে কাছে বসিয়ে আতিপাতি করে সব শেখাব মা, তুমি যে আমার কাছে কারবারের কাজ শিখছ, এ কথা নাই বা আমরা রাধুকে জানালুম। আসল কথা হচ্ছে মা, আমার কারবারের চাবিকাটিটি আমি তোমার হাতেই তুলে দিতে চাই।

অতঃপর শিক্ষা চলিতে থাকে নিয়মিতরূপে। সাতকড়িবাবু ক্রমশঃ বধূর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া মনে মনে এমন সংকল্পও পোষণ করিতে থাকেন যে, তাঁহার সমগ্র বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিয়া যাইবেন বুদ্ধিমতী বধূ নিভাকে।

কিন্তু শ্বশুরের নিকট বধূ নিভার শিক্ষার কথা এ বাড়িতে চাপা থাকিলেও তাহা যে কেমন করিয়া রাধানাথের কর্ণগোচর হয়, সেইটিই রীতিমত তাজ্জবের কথা।

এক দিন সে নিজেই সহসা নিভাকে প্রশ্ন করে, শুনছি নাকি বাবার কাছে বিষয়-কর্ম শেখা হচ্ছে—বাবার ইচ্ছা তোমাকেই তাঁর গদিতে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হন?

উপস্থিতবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া নিভা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, শ্বশুরের কাছে বসে তাঁর উপদেশ নেওয়া কি দোষের? কিন্তু তাঁর গদিতে বসে আফিস চালাবার যে গালগল্প বললে, বাবার কানে উঠলে তিনি কি বলতেন বল তো?

রাধানাথ উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলে, তোমার তো এখন সাতখুন মাপ বাবার কাছে। শুনতে পাই, বাবার ঘরে যে এজলাস বসে, নালিশ আসে, বিচার হয়, বাবা তো তোমাকেও সেখানে বসিয়ে তোমারও মত নেন। তাতে শুধু মেয়েরাই আসে না—পুরুষও থাকে।

নিভা উত্তর করে, তা থাকে। বাবার পক্ষে সব বিষয়ের ফয়সলা করা এখন আর সম্ভব নয়, তাই আমাকে সাহায্য করতে হয়। কিন্তু যারা আসে, তাদের প্রত্যেককে আমি ছেলে বা মেয়ে মনে করি। বাবার সুবিধার জন্যই আমাকে সে সময় কাছে থাকতে হয়।

রাধানাথ এবার কথাটা ঘুরাইয়া অন্য প্রসঙ্গ তুলিয়া বলে, আমি শুনেছি তোমাকে কাছে বসিয়ে বিষয়কর্ম শেখাবার জন্য বাবার এই যে চেষ্টা, এর একটা গূঢ় অভিসন্ধি আছে।

স্বামীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিভা বলে, সে অভিসন্ধিটা কি ?

রাধানাথ অসংকোচে বলিয়া ফেলে, ওঁর সমস্ত সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করে তোমার নামেই সব লিখে দেওয়া। বাবার ধারণা হয়েছে, ওঁর সম্পত্তি আমার হাতে পড়ে নষ্ট হবে, আমি ও সব রাখতে পারব না ; ওঁর মতে বিষয়-কর্মের ব্যাপারে আমার চেয়েও তোমার যোগ্যতা বেশী। তাই তিনি—

স্বামীর কথা শুনিতে শুনিতেই হাত দুইখানি উভয়কর্ণে রাখিয়া চাপা দিয়া নিভা আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, এ সব কথা শুনলেও মন বিষিয়ে ওঠে। হিঁদুর ঘরে এমন বউ কেউ কখনও দেখেছে কি—স্বামীকে বঞ্চিত করে শ্বশুরের বিষয়সম্পত্তি ভোগ করবার লালসা রাখে ?

এ কথার পর বিতর্ক না করিয়া হঠাৎ রাধানাথ বলে, বেশ তো, তা হলে বাবার কাছে বিষয়কর্ম চালাবার শিক্ষাটা বন্ধ করলেই পার, তা হলে আর কোন কথা থাকে না।

নিভাও তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া উত্তর করে, বাবা যদি আমাকে ডাকেন. আমি মুখ তুলে কখনই বলতে পারব না যে—যাব না। তুমি তো বাবার কোন খবর রাখ না, সব দিন দেখা করবারও ফুরসত পাও না ; এই বয়সে তিনি কি নিয়ে থাকেন বল তো ? যদি বিষয়আশয় সম্বন্ধে পুরানো কথা আমাকে শুনিয়ে আনন্দ পান, সে আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা কি দারুণ নিষ্ঠুরতা নয় ?

রাধানাথের কঠিন অন্তর কিন্তু এই কথা শুনিয়াও শান্ত হয় নাই, ইহার পরও সে রুক্ষস্বরে বলে, বুড়োদের স্বভাব জানতে আমার বাকি নেই। যাদের বিষয়-সম্পত্তি থাকে, কর্তৃত্ব ছেড়েও তার মোহ কাটাতে পারে না। যে কর্তৃত্ব চালায়, কি করে তাকে দাবাবে, সেইটিই হয় মোক্ষম চিন্তা। উপযুক্ত ছেলেকে এরা বরদাস্ত করতে পারে না, ছেলেকে শত্রু মনে করে, আর মেয়ে বা বৌকে ছেলের জায়গায় বসিয়ে শান্তি পেতে চায়। এটা হচ্ছে এই ক্লাসের স্বার্থপর বুড়োদের মনোবৃত্তি। অনেক ভেবেচিন্তেই আমি তোমাকে ঐ বুড়োর সংস্রব থেকে সরাতে চাইছি।

স্বামীর কথাগুলি শুনিতে শুনিতে নিভার সর্বাঙ্গ বুঝি ঘৃণায় রী রী করিয়া ওঠে। ক্ষণকাল নীরবে স্বামীর দিকে চাহিয়া সে গাঢ়স্বরে বলিয়া ওঠে, ছি ছি, তুমি এত নীচুতে নেমে গেছ ! দেশের লোক যাঁকে ঋষির মত মহাত্মা মনে করে, ছেলে হয়ে তুমি তাঁর সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা পোষণ কর। আমার মনে হয়, এ সব কথা শুনলেও পাপ হয়। আমি তোমার কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ

করছি—এর পর এমন কোন কথা আমাকে বলবে না—যাতে ওঁকে ছোট করা হয়েছে।

গম্ভীর মুখে রাধানাথও স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, এর পর আর নিজের সাফাই গেয়ে আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না—ঐ স্বার্থপর বুড়োর কাছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির দীক্ষাটা ভাল করেই নাও।

এই ঘটনার পর কিছু দিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। এদের এই বিতর্ক সম্বন্ধে কর্তার কানে কোন কথাই ওঠে নাই—তাঁহার ধারণা স্বাভাবিক ভাবেই সংসারযাত্রা চলিতেছে।

সে দিন প্রায় অপরাহ্ণের দিকে গাড়ির পুরাতন সহিস বিহারী এক-জোড়া মাছ লইয়া বহির্মহলে প্রবেশ করিতেই একটা হল্লোড় উঠিল। কর্তা তখন তাঁহার খাস কামরায় ফরাসের উপর বসিয়া পার্শ্বোপবিষ্টা বধূকে অভ্রের প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছিলেন। মুঙ্গেরে তাঁহার যে অভ্রের খনি আছে, এক সময় তাহা হইতে প্রচুর অর্থাগম হইত। ইদানীং খনি হইতে যে সব অভ্র উঠিতেছে, তাহার বর্ণ শুভ্র নহে, ঈষৎ লালচে রঙ। বাজারে চলিতেছে না। সেখানকার কর্মকর্তার ইচ্ছা যে, জলের দরে সমস্ত মাল বিক্রয় করিয়া দেয়। রাধানাথের আয়ত্তে থাকিলে অনেক আগেই সেগুলি অল্পদরে বিক্রীত হইত। কিন্তু অভ্রের এই খনিটি সাতকড়িবাবু বধূ নিভাননীর নামে দানপত্র করিয়া দিয়াছিলেন, আরও কতিপয় সম্পত্তির সহিত। সেইজন্য অভ্রখনির অধ্যক্ষ টালার বাড়িতে বধূর কাছে প্রস্তাবটি পাঠাইয়াছেন।

সাতকড়িবাবু সেই প্রসঙ্গেই বধূর সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, খনির মাল খারাপ হলেও জলের দরে বেচতে নেই, বরং যত্ন করে গুদামজাত করে রাখা উচিত। তাই তিনি বধূকে দিয়া খনির অধ্যক্ষকে আদেশ জানাইলেন যে, যে পর্যন্ত লালচে রঙের অভ্রের চাহিদা না হয়, সমস্ত মজুত ও নূতন উৎপন্নের মাল যেন সযত্নে গুদামজাত করিয়া রাখা হয়। বধূকেও নির্দেশ দিলেন, ওরা ঐ মাল বেচবার জন্যে যতই পীড়াপীড়ি করুক, তুমি যেন রাজী হয়ো না মা! আমি শুনেছিলাম, এই শ্রেণীর মাইকাগুলো অনেক জরুরী কাজে লেগে থাকে, তখন এর দর খুব বাড়ে। তবে সে কাজগুলোর কথা মনে পড়ছে না।

এই সময় সহিস মাছ দুটি লইয়া দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। গুরুভার বলিয়া সামনেই মেঝের উপর রাখিয়া দেয় পুরাতন সহিস বিহারী। সেই সঙ্গে

মাথা হেঁট করিয়া বাড়ির কর্তা ও বধূর হাতে রাধানাথের পত্রখানি দিল।

বড় বড় দুটি মাছ দেখিয়া কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে পাঠিয়েছে রে?

বধূ নিভাই প্রশ্নের জবাব দিল। বলিল, ওঁর বন্ধু কৃত্তিবাস কোলে মাছ দুটি খুব সুবিধায় কিনে এনেছেন। আজ রাতে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। হুকুম হয়েছে—এই মাছের পোলোয়া, কালিয়া, চপ হবে। জন-বারো লোক খাবে।

গম্ভীর ভঙ্গিতে কর্তা বলিলেন, ভাল। কিন্তু আধ মন মাছে অনেক লোক খাবে। শুধু ওঁর বন্ধুরা নয় মা, আমার এখানকার সেরেস্তার সবাইকে আজ রাতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করা যাক—কি বল?

সহিস বিহারী রাউত কর্তা সাতকড়িবাবুর আমলের লোক। গাড়িঘোড়ার সম্পর্কেও সে কর্তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও মহানুভবতার নানা দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়াছে। কর্তার আচরণে এমন কোন ত্রুটি বা কর্তব্যের ব্যতিক্রম কোন দিন দেখে নাই, যেজন্য মনে মনেও ব্যথা পাইয়াছে। কিন্তু কর্তা অবসর লইবার পর তাঁহার গদিতে বসিয়া পুত্র রাধানাথবাবু যে ভাবে কাজ চালাইতেছেন, ইয়ার বক্সীদের লইয়া দবাজ হাতে যেভাবে বাজে খরচ কবিতেছেন, তাহা প্রভুভক্ত পুবাতন ভৃত্য বিহারীর মনঃপুত নহে। কর্তাও তাঁহার আমলের পুরাতন ভৃত্যদের সম্বন্ধে এইরূপ একটা ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, কাজ-কারবাবের ব্যাপারে তাঁহার অজ্ঞাতে কোথাও কোন প্রকার দুর্নীতি বা অন্যায় ঘটিলে তাহারা নীরব থাকিবে না, তাঁহার কর্ণগোচর না করিয়া নিরস্ত থাকিবে না। ইতিমধ্যেই পুরাতন ভৃত্যদের তরফ হইতে রাধানাথবাবুর বিরুদ্ধে এমন কিছু কিছু তথ্য তাঁহার কানে উঠিয়াছে, যেগুলি আদৌ প্রীতিপ্রদ নয়। নিজের আমলের পুরাতন কর্মচাবী বা সাধারণ ভৃত্যদের মুখভাব সহসা চোখে পড়িবামাত্র তিনি অনুমান করিতে অভ্যস্ত যে, কিছু অন্যায় হইয়াছে, কিন্তু ইহারা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত। এ অবস্থায় সামান্য জেরা করিলেই সব প্রকাশ হইয়া পড়ে।

এদিনও সহিস বিহারী বড় বড় দুইটি মাছ আনিয়া তাঁহার কক্ষের সামনে খোলা স্থানটিতে যখন বাখে এবং সেই মাছের সম্বন্ধে রাধানাথের পত্রে লিখিত নির্দেশটিও যখন বধূমাতা নিভা কর্তাকে শুনাইয়া দেয়, সে সময় কর্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সহিস বিহারীর চোখে পড়িয়াই অন্তরে একটা সংশয়ের সৃষ্টি করে। তিনি তখন তন্ন তন্ন করিয়া সুলভে মাছ কেনার প্রসঙ্গটি তুলিতেই সমস্ত ফাঁক হইয়া যায়। বিহারী তখন অকপটে সে যতখানি জানিত সবই প্রকাশ করিয়া দেয়।

তার মুখের কথার উপর জেরা করিয়া কর্তা যে কথাগুলি বাহির করিয়া

লইলেন, তাহার কিছু কিছু পূর্ব হইতেই তিনি জ্ঞাত ছিলেন। যেমন, পুত্র রাধানাথ মাছের কারবার করিবার জন্য তাঁহার সম্মতি চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, বরং দৃঢ়ভাবে উক্ত ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে কঠোর মতবাদ প্রকাশ করিয়া বাধা দিয়াছিলেন। এদিন বিহারীর নিকট হইতে খবর সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, রাধানাথ প্রকাশ্যভাবে মাছের কারবারে স্বয়ং না নামিলেও, তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কৃত্তিবাসকে নামাইয়াছে এবং তাহার পিছনে টাকাও ঢালিয়াছে। অবশ্য আটঘাট বাঁধিয়া এমনভাবে কাজটা করিয়াছে যে, ধরিবার ছুঁইবার উপায় নাই। তাহারই তরফ হইতে তাহারই গাড়ি চড়িয়া কৃত্তিবাস হাওড়ার মাছের বাজারে রফা করিতে গিয়াছিল। মুঙ্গের হইতে তাহার নামে মাছের চালান আসিতেছে, ওখানে পাইকারী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু ঐ বাজারের যে মাথা, সেই পাতিরামের নিকট সে নাকি আমল পায় নাই। অথচ অন্যান্য কারবারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া কৃত্তিবাস যখন গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে, সেই সময় পাতিরামের লোক এই দুটি মাছ আনিয়া বলে যে পাতিরাম বাবু পাঠাইয়াছে। মাছ দুটি দেখিয়া কৃত্তিবাস ঘাবড়াইয়া গিয়া দাম জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু জবাব পায় —তাহার মালিক সওগাদ দিয়েছে, দাম লাগবে না। একটা মাছ রাধানাথ বাবুর বাড়িতে পাঠাবে আর একটা কৃত্তিবাস নিজে নেবে। সেই মাছ নিয়া কৃত্তিবাস আপিসে যায়। এত বড টাটকা মাছ দেখিলে কার না আনন্দ হয়। কৃত্তিবাস কিন্তু রাধানাথকে জানাইল, সস্তায় কিস্তিমাত করিয়া আসিয়াছে—মাত্র ত্রিশ টাকায় মাছ দুটো কিনিয়া আনিয়াছে রাধুবাবুর জন্যে। রাধুবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া ভোজের ব্যবস্থা করিয়া মাছ দুটো বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়াছে। আর কৃত্তিবাস তার মাথায় হাত বুলাইয়া ত্রিশটা টাকা নিজের পকেটে ফেলিয়াছে।

কথায় কিছুটা রসান দিয়া গৃহস্বামী বধূমাতা নিভাকে বৃত্তান্তটি বুঝাইয়া দিলেন, এই তোমার মাছের ইতিহাস বৌমা। আর এই সব বদ বন্ধু নিয়ে রাধুবাবুর কারবার! একটা লোক সওগাদ পাঠালে, তার কিনা এইভাবে সদ্‌গতি করে বিশ্বাসী বন্ধু একটা লাভের বাণিজ্য করে নিলে। এইসব বন্ধুর কবল থেকে ওকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে বৌমা। সেই জন্যেই তো তোমাকে হাতে কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন ভাবে তৈরী করতে চেয়েছি, যাতে প্রয়োজন হলে তুমি নিজেই হাল ধরে ঐ লাভের কারবারটাকে রক্ষা করতে পার।

বিহারীকেও তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন যে, কথাটা সে যে ফাঁস করিয়া দিয়াছে, কোনক্রমে যেন আপিসে জানাজানি না হয়। অতঃপর রাতের ভোজের ব্যাপারে

একটু কৌতুকের স্বরেই বলিলেন, বন্ধুবান্ধবদের ভোজ খাইয়ে রাধানাথবাবু তৃপ্তি পাবেন, কিন্তু আমার সেরেস্তার লোকগুলিকেও না খাওয়ালে আমি যে তৃপ্তি পাব-না বৌমা।

বৌমা তাড়াতাড়ি বলিলেন, বেশ তো, ওঁরাও খাবেন বাবা! বাড়িতে লক্ষ্মী-পূজো হলেও ওঁদের কাউকে যখন বাদ দেওয়া হয় না, এরকম একটা ভোজে ওঁরাও আসবেন বৈকি।

খুশি হইয়া শ্বশুর মন্তব্য করিলেন, ঠিক বলেছ মা, আমি এখনই সেরেস্তায় নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি। বিহারী তখনও দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া কর্তা বলিলেন, তোদের ভোজ তো দু বেলাই চলে, তবুও আজকের রাতের এই মাছের ভোজে তোদেরও নিমন্ত্রণ—বুঝলি।

বুঝিয়াই বিহারী হাসি মুখে সামনে ঝুঁকিয়া কর্তা ও বধূর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। কর্তা বলিলেন, শোন বৌমা, আজকের এই ব্যাপারটা থেকে আমাদের ভাববার ও সতর্ক হবার অনেক কিছু আছে। এই ছোট একটা ঘটনা থেকেই বুঝতে পারছ মা, রাধুবাবু কি রকম ইতর প্রকৃতির বন্ধুবান্ধবদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়েছে। এখন এদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করা চাই, নৈলে ও সব নষ্ট করে ফেলবে।

বিহারী তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বুদ্ধিমতী বধূ মৃদুস্বরে বলিল, এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি পরে আলোচনা করব বাবা! এখন এই মাছ দুটোর ব্যবস্থা করতে হবে, সন্ধ্যার পরেই একটা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারও যখন রয়েছে।

মনে মনে বধূর বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া কর্তা তৎক্ষণাৎ বিহারী ও ভৃত্য নিধি-রামকে মাছ দুইটি অন্দরমহলে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া প্রসন্নমুখে বধূকে বলিলেন, বুঝিছি মা, এখন তোমার মন এদিকে আসতে পারে না। বাবুও মাছ পাঠিয়ে ভোজের হুকুম দিয়েই খালাস, তার পর তোমাকেই তো সব দিক সামলাতে হবে। আচ্ছা মা, এখন তোমাকে ছুটি দিচ্ছি। তবে যে ব্যাপারটা বিহারীর কাছ থেকে আদায় করে তোমাকে শুনিয়ে দিলাম, তার বিশ্রী দিকটা তুমিই এক সময় রাধুকে জানিয়ে সতর্ক করে দিও। আমি আর এ সম্বন্ধে তাকে কিছু বলব না। তবে আগামী কাল থেকে আমার প্রধান কাজ হবে মা, বিষয়-আশয় আর ব্যবসা-ব্যাপার রক্ষণাবেক্ষণের হদিসগুলো তোমাকে এমন ভাবে জানিয়ে দেওয়া যাতে তুমি একাই নিজের বুদ্ধিতে অসময়ে সব সামলাতে পার। রাধুর ওপর আমি মা ক্রমশই আস্থা হারিয়ে ফেলছি।

ধীরে ধীরে কথাগুলি বধূকে শুনাইয়া দিয়া স্থবির পুরুষসিংহ সশব্দে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বধূ নিভা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া নীরবেই সব শুনিল। তাহার পর বিহারী ও ভৃত্যকে অনুসরণ করিয়া অন্দরমহলে চলিয়া গেল। এখন তাহার অনেক কাজ। সংসারে পাচক-পাচিকা দাস-দাসীর অভাব নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বধূ নিভার দায়িত্ব বড় কম নয়—সর্বত্র উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে সংসারে সব কিছুই দেখাশোনা করিতে হয়। সে তো এ-বাড়ির শুধু বধূ নহে আসলে গিন্নী বা গৃহিণী।

॥ পাঁচ ॥

রাধানাথ ভাবিয়াছিল, রাতের ভোজটা তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে মনে সে বিরক্ত হইল। এত বাড়া-বাড়ি না করিলে বন্ধুদের ভোজের ব্যবস্থা আরও অনেক আগেই শেষ হইয়া যাইত। আহারান্তে বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া নিজের শয়নকক্ষে বসিয়া আপন মনে সে গুম-রাইতে থাকে। ওদিকে বধূ নিভার ব্যবস্থায়ও কোনও ত্রুটি হইবার জো নাই—আগাগোড়া সর্বত্র তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য নিবদ্ধ। নিখুঁতভাবে কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাহার তো ছুটি নাই। সকলের খাওয়ার পর নিজে এক বাটি দধি ও দুটি মিষ্ট মাত্র মুখে দিয়া সে যখন নিশ্চিন্তমনে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল, রাত্রি তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

অধৈর্যভাবে রাধানাথ পত্নীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। পারিবারিক ঘটনা সম্পর্কে বধূ যে পরিমাণে শান্ত, সংযত, সহনশীলা ও অবস্থার তালে তালে আপনাকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে অভ্যস্তা, স্বামী রাধানাথ কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্ম-সুখ, স্বার্থ, সুবিধা ও আত্মতুষ্টিপরায়ণতার দিক দিয়া রাধানাথ এতই সচেতন যে, এসব ব্যাপারে সামান্য ত্রুটিও তাহার পক্ষে অসহ্য। পুত্রকন্যাদের রোদন শুনিলে সে অধৈর্য হইয়া উঠে, প্রত্যেক জিনিসটি তাহার নাগালের মধ্যে না পাইলেও অনর্থ উপস্থিত করে, এমন কি খাতাপত্র লইয়া হিসাব করিতে বসিয়াও মাথা সে স্থির রাখিতে পারে না—হিসাব না মিলিলে আর রক্ষা থাকে না, খাতা-পত্রের উপরেই রাগিয়া অস্থির, ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেও বাধে না; কিন্তু এই সব ব্যাপা-রের চরম অবস্থায় বধূ নিভাকে আসিয়া শেষ রক্ষা করিতে হয়। যেসব ত্রুটি বা

ভুল তাহার চোখে বার বার দেখা সত্বেও ধরা পড়িতেছিল না, সেই সময় সহসা নিভা আসিয়া সেই ভুল বা ত্রুটিগুলির উপর আলোকপাত করিয়া যখন স্নিগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে নীরবে চাহিয়া থাকে, ব্যস্তবাগীশ রাধানাথকেও তৎকালে গুম্ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। যাহার জন্য ভুলটা ধরা পড়িল, অশান্তির অবসান ঘটিল, তাহাকে একটা শুষ্ক ধন্যবাদ দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করে না।

হয়তো—একট টাইপরাইটার মেশিন লইয়া টাইপ করিতে বসিয়াছে, হঠাৎ তাহার কল বিগডাইয়া গেল, মেশিন চলে না। কিন্তু কেন চলে না, কোথায় কি আটকাইয়া কল বিগড়াইয়া দিল, তাহা ধরিবার চেষ্টা নাই, যত বাগ পড়ে মেশিনটার উপর, বিকল মেশিনের উপব যখন প্রবল পীডন চলিয়াছে, সেই সময় নিভাকে হাতেব কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতে হয়, এবং যে সামান্য একটু গলদের জন্য এত কাণ্ড, সেটি সংস্কার করিয়া দিতেই মেশিন চালু হইয়া যায়। গম্ভীর মুখে পত্নীর দিকে একটি বার চাহিয়া পুনরায় সে হরফগুলি টিপিতে বসে। যেন এ ত্রুটি সংশোধন করা পত্নীরই কর্তব্য। প্রত্যেক ব্যাপারেই এই অসহিষ্ণু মানুষটি এই এই ভাবে গলদ ঘটাইয়া বসে, এবং শেষ পর্যন্ত চরম অবস্থায় পত্নীকে আসিয়া শেষ রক্ষা করিতে হয়।

এই প্রকৃতির স্বামীকে লইয়া ঘর করা সকল শ্রেণীর নারীর পক্ষে সম্ভব নয়, এখানে প্রত্যহই ঠোকাঠুকি বাধিবার কথা। কিন্তু এমন অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই নিভা যে, মুখ বুজিয়া স্বামীর অধৈর্যতামূলক যাবতীয় উপদ্রবগুলি নীরবে সহ্য করিয়া যায়—যে সব ভুল ত্রুটি একটু চেষ্টা করিলেই সংশোধন করিয়া লওয়া যায়, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই, ক্রমাগতই সে চীৎকার সহ জিনিসপত্র ফেলিয়া ছড়াইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতে থাকে এবং এই অবস্থায় নিভা আসিয়া সামান্য চেষ্টায় আসল গলদটি ধরাইয়া দিলেই যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ে। আশ্চর্য এই খানেই যে, নিভা এইভাবে শান্তিজল ছড়াইয়া দিয়াই স্বামীর বিরুদ্ধে এমন কোন মন্তব্য কোন দিনই করে না যাহার জন্যে পুনরায় অশান্তি ঘটিতে পারে। এ সময় স্বামীর প্রতি তাহার একটি নীরব দৃষ্টিই যথেষ্ট। স্বামী রাধানাথ স্ত্রীর সেই নির্বাক দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করিয়া মনে মনে নিজের অসহায় অবস্থা ও অক্ষমতার জন্য লজ্জিত হইলেও চাপিয়া যায়, প্রকাশ করে না, তার ধারণা—এসব গলদ দূর করা পত্নীরই কর্তব্য।

নিভাও স্বামীর প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়াছিল বলিয়া নীরবেই এই সব

বিরক্তিকর ব্যাপার তাহার অদ্ভুত উপস্থিতবুদ্ধির প্রভাবে সংশোধন করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত, কথা আর বাড়াইত না। কিন্তু এমন গুণবতী পত্নী পাইয়াও রাধানাথ মনে মনে সুখী হইতে পারে নাই। স্ত্রীর কথাবার্তা বলিবার কায়দা ও তৎকালীন মুখভঙ্গি হইতে সে নিজের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া ক্ষুব্ধ হইত। স্ত্রীর এ সম্পর্কে উৎকর্ষ তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিত। পিতার সঙ্গে কথা হইলেও তিনি প্রতিবারই বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন যে, ব্যবসায়ের ব্যাপারে সে যেন বধূমাতার পরামর্শ লইয়া পাকাপোক্ত করিয়া লয়। পিতার কথায় সে বেশ বুঝিতে পারে, তিনি বধূকেই তাহার চেয়ে উপযুক্ত মনে করেন। তার পর সে শুনিয়াছে সদাসর্বদা নিভা শ্বশুরের সঙ্গে থাকিয়া বিষয়-আশয় ও ব্যবসায়ের ব্যাপারে আলোচনা করে এবং শ্বশুর নাকি পাখি পড়ানোর মত তার কানে শিক্ষামন্ত্র গুঞ্জন করেন। পুত্রের প্রতি উপেক্ষা ও বধূর প্রতি এতটা নির্ভরতা হইতে সময় সময় তাহার মনে সংশয় হয়, কর্তা কি শেষে বিষয়সম্পত্তি পরিচালনার ভার বধূকেই অর্পণ করিয়া যাইবেন? ইহার ফলে সংসারে প্রভাব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দুই ভ্রাতার মধ্যে যেরূপ একটা প্রতিযোগিতার ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, রাধানাথ যেন নিজেই মনে মনে তেমনি একটা বিরোধী ভাব ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে থাকে। এই জন্যই দেখা যায়, যখনই সাংসারিক কোন ব্যাপার লইয়া কথা ওঠে, রাধানাথ সেই বিরুদ্ধ মনোবৃত্তিটাই খুঁচাইয়া তুলিয়া নিভার নির্মল চিত্তকে উত্তপ্ত করিতে সচেষ্ট হইতেছে।

এদিনের ভোজের ব্যাপার হইতেই তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

নিভাকে দেখিয়াই রাধানাথ রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখছ, রাত কত হয়েছে—বারোটা বেজে পঁচিশ।

শান্ত কণ্ঠে নিভা বলিল, কিন্তু তোমাদের খাওয়া তো এক ঘণ্টা আগেই হয়ে গেছে। রাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার হলে, এর আগে হয় না।

হুঙ্কার দিয়ে রাধানাথ জিজ্ঞাসা করিল, এত লোক খাওয়াবার কি প্রয়োজন ছিল? মাছ দুটো পাঠাবার সময় আমি শুধু আমার বন্ধুবান্ধবদের কথা বলেছিলাম। সেরেস্তার এক গাদা লোককে আমি তো খাওয়াবার কথা বলি নি।

নিভা বলিল, তুমি বল নি তা মানি। কিন্তু বিহারী বাবার সামনে মাছ দুটো এনে ফেললে। আমি তোমার অভিপ্রায় তাঁকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, সেরেস্তার লোকজনরাও আমার গোষ্ঠীর মধ্যে, তারাও খাবে। সেই মত হুকুম তিনি দিলেন। আর তুমি কি জান না, বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো হলেও সেরেস্তার লোকেরা বাদ পড়ে না?

সরোষে উত্তর দিল রাধানাথ, জানি না আবার! এইভাবে ওদের আস্কারা দিয়ে বাবা মাথায় তুলেছেন। চাকর চাকরি করবে, মাসমাসান্তে মাইনে পাবে। তাদের সঙ্গে এই পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ। বাবার ব্যবস্থা কিন্তু আলাদা, দু বেলা এখানে বসে বসে গিলবে, যাদের বাড়ি শহরের বাইরে—সেরেস্তায় থাকবে! দেখলে আমার গা জ্বালা করে।

নিভা বলিল, এই নিয়মেই তো বাবা ওঁদের বরাবর প্রতিপালন করে আসছেন। বাবার ধারণা, এতে কাজ ভাল পাওয়া যায়। বাড়িতে দু বেলা এতগুলো লোকের পাতা পড়া কি সামান্য ভাগ্যের কথা!

তর্জন করিয়া উঠিল রাধানাথ, রেখে দাও তোমার ভাগ্য! আমি এ সব ভালবাসি না—ষণ্ডা ভোজ দেখে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

নিভা বলিল, বাবা যা পছন্দ করেন, বংশানুক্রমে যে ব্যবস্থা চলে আসছে, তুমি পছন্দ না করলেও চালাতে হবে। এ নিয়ে এত রাতে মাথা গরম করেও কোন লাভ নেই। বাবা এ সব শুনলে—

বাবাকে শোনাতে তো তুমি! বেশ, কালকের পরামর্শ সভায় বসে কথাগুলো তাঁর কানে ঢেলে দিও, আরও বেশী প্রিয়পাত্রী হতে পারবে।

ক্ষণকাল নীরবে মুখের পানে তাকাইয়া নিভা বলিল, এর মধ্যে আমাকে টেনে এভাবে একটা বিশ্রী কথা বললে কেন? জানি, মেয়েদের মধ্যে লাগানো-ভাঙানো দোষ আছে। কোন একটা কথা তুললে, সে কথাকে আরও ফাঁপিয়ে তারা শুনিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু তুমি কি আমাকেও ঐ দলের মেয়ে দেখলে?

রাধানাথ কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হইয়াই বলিল, কেন, আমি বেরিয়ে গেলে তোমার কাজকর্ম তো সব বাবার সেরেস্তাতেই চলে। কানে কত মন্ত্র দেন, যুক্তি পরামর্শ দেন, আমি কি জানি নে? বাচ্চাগুলোকেও তোমার দেখবার ফুরসত হয় না, যত কিছু কাজকর্ম পরামর্শ যুক্তি আলোচনা বাবার ঘরে—

নিভা এবার একটু শান্ত হইয়াই বলিল, বাবা যখন আমার হাতে এ সংসারের ভার দিয়েছেন, আমি সে ভার চালিয়ে যাচ্ছি বরাবর। এত বড় একটা সংসার ঘরের ও বাইরের এত লোকজন এর সংস্রবে রয়েছে, আমার এখানে কর্তব্য ও দায়িত্ব কতখানি, তুমি তা বুঝবে না। নিজের ছেলেপুলে, আরও পাঁচটা ছেলেপুলে আছে, তাদের প্রতি আমার কতখানি কর্তব্য তোমার কাছে শেখবার প্রয়োজন হবে না। এই যে বৃদ্ধ বাবা রয়েছেন মাথার ওপর, একই বাড়িতে থাক, কিন্তু কোন খবর তাঁর রাখ? তিনি নিজে না ডাকলে নিজে থেকে তাঁর কাছে

বসে স্বাস্থ্যের কথা, কাজকর্মের কথা কখনও জিজ্ঞাসা করেছ ? ব্যবসা সম্বন্ধে কোন পরামর্শ কোন দিন ওঁর কাছ থেকে নিয়েছ ?

রাধানাথ এবার ঈষৎ ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলিল, পরামর্শ—ঐ আশী বছুরে বুড়োর কাছে ? তার কোন দাম আছে ? যদি বুঝতাম, আমরা জাতে গয়লা, তা হলে নয় কথা ছিল ; কেন না, শুনেছি আশী বছর বয়স না হলে ওদের মাথায় বুদ্ধি খেলে না। আমাদের ঘরে আশীতে পড়লে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি খোকার মত হয়। তাই তো, তোমার শিক্ষানীতি দেখে আমি মনে মনে ভীত হয়েছি।

মনের ক্ষুব্ধভাব সবলে চাপিয়া রাখিয়া শান্ত ও সংযত স্বরে নিভা বলিল, ক'বছর হল তোমাদের বাড়িতে এসেছি ; সকলকেই দেখছি আর প্রত্যেকের বুদ্ধির পরিচয়ও পাচ্ছি। কিন্তু বাবাকে দেখে দেশের মহাপুরুষদের কথাই মনে পড়েছে, বাবার সঙ্গ পেয়ে সমস্ত মন যেমন আনন্দে ভরে গেছে, তেমনি দুঃখও হয়েছে, তোমাকে বরাবরই তাঁর সংস্রবের বাইরে থেকে যেতে দেখে। ছোট একটা ঘটনা বলেই বুঝিয়ে দিই, বাবার তুলনায় কত—কত ছোট তুমি, কতখানি নীচুতে এখনও পড়ে আছ ! চোখে দেখে হাতেকলমে কাজ করে যে ভুল তোমরা কর, বাবা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে তা থেকে সত্য নির্ণয় করেন। এই যে আজকের মাছ দুটো তোমার বন্ধু কৃত্তিবাস সস্তায় কিনে এনেছে বললে, আর তুমিও বিশ্বাস করে ভোজের ব্যবস্থা করলে। বাবা কিন্তু বিহারীকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করেই জানতে পারেন, কৃত্তিবাস তার কাছে গাছের ব্যাপারে গেলে, এ পাড়ার পাতিরাম পাকড়ে ও দুটো মাছ সওগাদ দেয়—একটা তোমাকে, আর একটা তোমার বন্ধুকে, কিন্তু বাবু সে কথা চেপে মিছে কথা বলে তোমার মাথায় হাত বুলিয়েছে—বুঝলে ? এখানেই বাবার আশী বছরের বুদ্ধিটার কথা ভাবতে পার !

রাধানাথ পুনরায় তর্জনের সুরে বলিয়া উঠিল, মিথ্যা কথা, হ্যাঁ—নিছক মিথ্যা, বানানো কথা।

পুনরায় স্থির দৃষ্টি স্বামীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া নিভা কহিল, বুদ্ধির এত বড়াই কর, কিন্তু কি ভাবে কার সঙ্গে কথা বলতে হয়, সে শিক্ষা এখনও পাও নি। না জেনে মিথ্যাকে নিয়েই গর্ব করতে চাও। বেশ, কাল সকালে তোমার কৃত্তিবাস কোলেকেই জেরা করলে কথাটা সত্য বা মিথ্যা জানতে পারবে। তুমি যে বিশ্বস্ত সূত্রে পাতিরামের পক্ষ থেকে ব্যাপারটা শুনেছ—একথার ওপর জোর দিয়ে তাকে জেরা কর। তার পর, মিথ্যা বলার জন্য আমাকে শাস্তি দিতে এস। অনেক

রাত হয়েছে, আজ আর এসব কথা নিয়ে মাথা গরম না করাই ভাল।

কথাগুলি বলিয়াই নিভা পাশের ঘরে ছেলেদের দেখাশুনা করিতে গেল, রাধানাথও দারুণ একটা দুশ্চিন্তা লইয়া শয্যায় আশ্রয় লইল।

॥ ছয় ॥

কথা ছিল, পরদিন সকালে রাধানাথও কৃত্তিবাসের সঙ্গে হাওড়ার মাছের হাটে যাইবে। সেই সূত্রে কৃত্তিবাস খুব ভোরেই টালার বাড়িতে উপস্থিত হয়। রাত্রের কথাগুলি রাধানাথকে এমনি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল যে রাধানাথ প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া কৃত্তিবাসের প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

কৃত্তিবাস ভাবে নাই যে, আসিবামাত্র তাহাকে বৈঠকখানায় দেখিতে পাইবে। এক গাল হাসিয়া উল্লাসের সুরে সে বলিল, ভেবেছিলাম ডাকাডাকি করতে হবে; কিন্তু আগে থেকেই তুমি উঠে পড়েছ। এ একটা শুভলক্ষণ, এখন গাড়ি বার করতে বল।

কথাগুলো শেষ করিয়া রাধানাথের মুখের ওপর চাহিতেই সে চমকাইয়া উঠিল। এ কি! মুখখানা এমন গম্ভীর কেন? তবে কি কোন···তাড়াতাড়ি কথাটা পাল্টাইয়া কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় করিয়া শুধাইল, কি ব্যাপার! মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে—

শুষ্ককণ্ঠে রাধানাথ জবাব দিল, যে পতা পাকড়ে আমাদের সঙ্গে সমান তালে চলতে চায়, বিজনেসের ব্যাপারে আমাদের বাগুায় বসাতে চায়, আমাদের সেই পরম দুশমনটাই কালকের মাছ ভেট দিয়ে বাহাদুরি দেখিয়েছে, আর আমরা খুব জাঁক করে সেই মাছকে উপলক্ষ করে ভোজ খেয়েছি—এই মাত্র ওরই লোকের কাছে কথাটা শুনে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারছি না। গলাটা শুকিয়ে উঠছে···

রাধানাথের কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই কৃত্তিবাসের মুখখানা যে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল, রাধানাথ আড়চোখে দেখিয়া সেটা বুঝিতে পারিল। দোষী না হইলে দোষের কথা শুনিয়া এভাবে মুখের ভাব পরিবর্তিত হয় না।

তথাপি কৃত্তিবাস গলায় একটা চাপ দিয়া গলাটাকে শানাইয়া লইয়া বলিল,

সকাল বেলাই এ খবর কোথা পেলে শুনি ?

রাধানাথ বলিল, রাতের খাওয়াটা জোর হওয়ায় বাড়ির সামনে খোলা মাঠে বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় ওর সেই তুলসী নামে লোকটা সামনে এসে প্রাতঃপ্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল, কালকের মাছ খেলেন বাবু ? আমি তো অবাক ! আমাকে একথা শুধোয় কোন্ সাহসে ? একটা ধমক দিতেই সব ফাঁস হয়ে গেল। বেহারীও ঠিক এসময় ঘোড়া দুটোকে টহল দিয়ে ফিরছিল, কথাটা শুনে সেও থমকে দাঁড়াল। তখন জানা গেল, তোমার কারবারে সাহায্য করবে না জানালেও, তার পর মাছ দুটো নাকি সওগাদ দেয়—একটা তোমাকে, একটা আমাকে। বেহারীও সে কথা—

তাড়াতাড়ি মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া কৃত্তিবাস এখানে বলিয়া উঠিল, তা হলে তোমাকে বলি ভাই, মাছ দুটো পাকড়ে তোমার বাড়িতেই পাঠিয়েছিল। আমি তখন ঠিক করি ফেরৎ দেব, কিন্তু তার পর মত বদলে সাব্যস্ত করি—আজ বাজারে গিয়েই ঐ টাকাটা তাকে দিয়ে বলব, রাধুবাবু তোমার সওগাদ নিলেও দামটা দিয়েছেন। এও একটা খুব চমক দেওয়া হবে।

মুখখানায় বিরক্তভাব ফুটাইয়া রাধানাথ বলিল, ছাই হবে। সে যদি টাকা না নেয় ?

কৃত্তিবাস বলিল, না নেয় টাকাগুলো ওর টাটের ওপর ছড়িয়ে দেব।

রাধানাথ চুপ করিয়া রহিল, এ সম্বন্ধে কোন কথা আর ব্যক্ত করিল না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে পত্নী নিভার রাত্রের কথাগুলি উজ্জ্বলভাবে একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সুস্পষ্টস্বরে এই মেয়েটি তাহাকে বলিয়াছিল—ছোট একটা ঘটনা বলেই বুঝিয়ে দিই তোমাকে, বাবার তুলনায় কত—কত ছোট তুমি, কতখানি নীচুতে এখনও পড়ে আছ ! তোমরা চোখের সামনে হাতে-কলমে দেখে শুনে যে ভুল কর, বাবা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে তা থেকে সত্য নির্ণয় করেন।···কথাটা যে কত সত্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা প্রতিপন্ন হইয়া গেল ? এর পর নিভার সামনে কি করিয়া সে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবে। তাকে কি বলিবে ?

কিন্তু ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনি ভাবে একটা উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া কৃত্তিবাস পরবর্তী ব্যাপার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিল। শেষে গলার জোর দিয়া বলিল, তুমি যদি ঐ আড়তে গিয়ে এক বার দাঁড়াও বন্ধু, তখন দেখবে সুড়সুড় করে···

রাধানাথ সহসা সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, না, মাছের আড়তে রাধানাথ মুখুজ্যে কোন দিন দাঁড়াবে না। ওটা হচ্ছে ওর জাতব্যবসায়, ঐ নিয়ে আমাদের প্রতিযোগিতা না করাই ভাল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া কৃত্তিবাস বলিল, সে কি হে! অতগুলো টাকা ওর পিছনে—

একটু শক্ত হইয়া রাধানাথ বলিল, যাক্। ওর জন্য আমি তোমাকে দায়ী করব না। তুমি ওখানে গিয়ে মাছগুলো বরং বেছে বেছে ভদ্রলোক দেখে বিলিয়ে দিয়ে এস, আমি তাতে বরং খুশি হয়ে নিশ্বাস ফেলব।

তবুও কৃত্তিবাস রাধানাথের হাত ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, ব্যাপারের অসম্ভব লাভের কথা বলিয়া লোভ দেখাইল, হাতের লক্ষ্মী এভাবে পায়ে ঠেলিতে নিষেধ করিল। কিন্তু রাধানাথ অটল, কৃত্তিবাসের কোন কথাই তাহার অন্তর স্পর্শ করিল না।

রাধানাথের একান্ত ইচ্ছা এবং সেটা সে স্পষ্ট করিয়াই কৃত্তিবাসকে বলিয়া দিয়াছিল, চালানী মাছের ব্যাপারে কৃত্তিবাসের হাতে যে টাকা সে দিয়াছে, তাহার উপর কোন লোভ তাহার নাই, কৃত্তিবাসও যদি লোভ কাটাইয়া মাছগুলি বিলাইয়া দেয়, তাহাতে রাধানাথ খুশিই হইবে। কৃত্তিবাস কথাগুলি নীরবেই শুনিল, কিন্তু রাধানাথের ইচ্ছার ধার দিয়াও গেল না।

আড়তে গিয়া কৃত্তিবাস দেখিল, বাক্সবন্দী হইয়া ত্রিশ মন মাছ আড়তে উঠিয়াছে। বুকিং আপিসের এক জন ক্লার্ককে টাকা খাওয়াইয়া তাহার পার্সেল আসিবামাত্র আড়তে যাহাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয় সে ব্যবস্থা পূর্বদিনই করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আড়তে নির্দিষ্ট ঘরের অভাবে প্রকাণ্ড চত্বরের একপার্শ্বে কুলীরা পার্সেলগুলি রাখিয়া যায়। আড়তদারের নাম কৃত্তিবাস কোলে কোম্পানি।

কিন্তু বাজারের কলকাঠিটি অদৃশ্য হস্তে এমনি কৌশলে টিপিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, কৃত্তিবাস কোলে কোম্পানির সমস্ত মাছ এক ধারে গাদা হইয়া পড়িয়া আছে দেখিয়াও তাহার সম্বন্ধে কেহই কোন প্রশ্ন করিল না। বেলা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় কৃত্তিবাসের চৈতন্য হইল, সে তখন পাতিরামকে বাদ দিয়া হাটের অন্যান্য আড়তদারদের কাছে ধরনা দিয়া পড়িল; উচ্চ কমিশনের লোভ দেখাইয়া তাহার চালানের মাছগুলির বিলি বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের কাছ হইতে একই উত্তর শুনিল, এখানকার চালানী মাছ

যারা কেনে, তাদের কেউ আপনার মাছ ছোঁবে না। আপনি বরং পাতিরাম-বাবুকে ধরুন।

বাবু! মুখখানা রীতিমত বিকৃত করিয়া কৃত্তিবাস কহিল, পাতিরাম পাকড়ে মেছোহাটায় এসে বাবু হয়েছে বটে। বনজঙ্গলে শিয়াল রাজা! এই চামচিকের খোশামোদ করবে হার্ডওয়ার মার্চেন্ট কোলে কোম্পানির মালিক কৃত্তিবাস কোলে? বিক্রি না হয়, মাছগুলো গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে যাব।

জনৈক আড়তদার বলিল, তাতেও হাঙ্গামা আছে।

তার মানে?

মানে এই বেলা একটার এদিকে মাছগুলোর যদি গতি মুক্তি না হয়, তখন কর্পোরেশনেই এর জন্য তদ্বির করতে হবে। তাতে ফেলবার খরচা তো আছেই, উপরন্তু পঞ্চাশটি টাকা ফাইন দিতে হবে। কৃত্তিবাসের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এ সমস্তই পাতিরামের ষড়যন্ত্রের ফল। সে তাহাকে এ হাটে কিছুতেই ব্যাপার করিতে দিবে না। কিন্তু সেও মনে মনে সংকল্প করিল—কিছুতেই পাতিরামের দ্বারস্থ হইবে না।

কিন্তু গোড়া হইতেই কৃত্তিবাস এ ব্যাপারের হিসাবে ভুল করিয়া কাজে নামিয়াছিল। এবং এই ভুলের পথেই সে নিজের প্রকৃতিসিদ্ধ দম্ভের সহিত অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিল। ফলে, শেষ পর্যন্ত বিবিধ চেষ্টা যত্ন ও আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের পর তাহাকে একান্ত হতাশ অবস্থায় হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাধানাথ এই কারবারে তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছিল। কিন্তু মাছের প্রথম চালান আসিবার আগের দিন পাতিরাম দত্ত দুটি মাছ উপলক্ষ স্বরূপ হইয়া রাধানাথের মনে এই সংকল্প দৃঢ় করিয়া দেয় যে, অতঃপর কৃত্তিবাসের সহিত কারবার সম্পর্কে কোন সংস্রব রাখিবে না, বন্ধুত্ব যেমন বজায় আছে থাকুক। এজন্য সে পাঁচ শত টাকার মায়াও ত্যাগ করে। কিন্তু প্রথম দিন লোকসান হইলেও কৃত্তি-বাসের রোখ চাপিয়া যায়, সেও সংকল্প করে রাধানাথের সহায়তা না লইয়াই সে এই বিজনেস চালাইয়া যাইবে। ইহার ফলে তাহার হার্ডওয়ারী বিজনেসের মূলধন হইতে দশ হাজার টাকা তুলিয়া এই কারবারে ফেলে। প্রথম দিন সে ব্যাপারীদের সাহায্য লাভে সমর্থ না হইলেও পাতিরামের বিরোধী পক্ষের এক আড়তদারকে হাত করিয়া তাহার সহিত বখরাদারিতে কাজ চালাইতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে সমস্ত টাকা লোকসান দিয়া এই লোভনীয় ব্যবসায়ের মায়া কাটাইতে হয়। এই সময় সে বুঝিতে পারে, প্রথম দিন এই কারবার সম্পর্কে পাতিরাম যে

কথাগুলি বলিয়াছিল তাহা নিরর্থক বা মিথ্যা নহে।

যেদিন এখানকার বাজারের সকলেই জানিল, কৃত্তিবাস কোলে তাহার কার-বারের জাল গুটাইয়াছে এবং রীতিমত আক্কেল সেলামী দিয়া বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই দিন পাতিরাম নিজেই উপযাচক হইয়া কৃত্তিবাসকে আহ্বান করিল, শোন, কথা আছে।

এখন কৃত্তিবাসের চেহারায় সে দম্ভের চিহ্ন ছিল না, পোশাক-পরিচ্ছদেও পূর্বের মত আড়ম্বর নাই; এমন কি এদিন সে ছ্যাকরা গাড়ি বা রিক্‌শা চাপিয়া বাজারে আসে নাই, পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছে। এই লোকটির ব্যাপারে পাতিরাম যতই নির্লিপ্ত থাকিবার ভান করুক না কেন, অপ্রকাশ্যে যে ইহার উপর তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য বরাবর রহিয়াছে, এ সন্ধান তাহার অতি বিশ্বস্ত দুই-এক জন কর্মচারী ভিন্ন আর কেহই জানিত না।

পাতিরামের আহ্বান পাইয়া কৃত্তিবাস ম্লান মুখে তাহার তক্তপোশখানির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পাতিরাম হাসিমুখে স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, বসো কৃত্তিবাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে সরিয়া বসিয়া কৃত্তিবাসের বসিবার স্থান করিয়া দিল। কৃত্তিবাস বসিল। পাতিরাম দেখিল, মুখখানা তাহার অতিশয় মলিন। চক্ষু দুইটিও দীপ্তিহীন। যে চোখে সর্বদাই বিদ্রূপের ভঙ্গি দেখা যাইত, কোথায় এখন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সেই মুখে নিবদ্ধ করিয়া পাতিরাম কহিল, সেদিন যদি এই ভাবে এসে দেখা করতে, বা পরামর্শ চাইতে, তা হলে এ দুর্গতি তোমার হত না কৃত্তি।

উদাস কণ্ঠে কৃত্তিবাস বলিল, অদৃষ্ট।

পাতিরাম একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, টালার হাইস্কুলে পড়ার কথা সেদিন বল-ছিলে না? সে সময় রাধু আর তুমি ছিলে বড় দলের চাঁই। আমি তো বরাবরই গরিবের ঘরের ছেলে, সে সময় আমার বাবা মারা যেতে মা আমাকে মাছ বেচে পড়াত। এই নিয়ে কত খোঁটাই তোমরা দিতে আমাকে জব্দ করতে—সবার সামনে ছোট করবার মতলবে কত চেষ্টাই করেছ। কিন্তু একটি দিনও আমাকে কাবু করতে পার নি কিছুতেই। বল—কোন দিন আমাকে নীচু হতে দেখেছ তোমাদের কাছে?

কৃত্তিবাস নীরবে কথাগুলি শুনিল, কোন উত্তর দিল না। কিন্তু উত্তর না পাইলেও পাতিরাম বুঝি তাহার মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাহার অন্তরের ভাষাটুকু পড়িয়া লইল। পরক্ষণে সে কহিল, রাধুর বাবা মস্ত জমিদার, তার ওপর কলিয়ারী আর

মাইকার ফালাও কারবার, কলকাতায় হার্ডওয়ারী কারবারের ওরাই মাথা। তোমার বাবা শ্বশুরের দৌলতে ঐ কারবার একটা ফেঁদে বসেন, তোমাদেরও শাঁসালো অবস্থা। তোমাদের তুলনায় আমি ছিলাম নেহাৎ গরিব, তাই তোমরা আমাকে সবদিক দিয়ে ছোট ভাবতে। আমি সব বুঝতাম, আর তখন থেকেই আমার মনের মধ্যে কি ভাব হত জান? আর সেই ভাবটাকে জোর করে কি রকম তৈরী করতাম শুনবে?...নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আমি এক দিন বড় হবই; আর যারা—বাপ-পিতামহের পয়সা আর নামের জোরে বড়লোক বলে বড়াই করে, তাদের সবাইকে আমি যেমন করে পারি দাবিয়ে দেবই। সেই সাধনাই আমার চলেছে—বুঝলে?

একটা ঢোঁক গিলিয়া কৃত্তিবাস আস্তে আস্তে বলিল, বুঝেছি। কিন্তু হঠাৎ তোমার মনের চাকাখানা ঘুরে গেল কেন? অর্থাৎ, যাকে কায়দা করে ডুবিয়ে দিলে, তাকেই আবার কি মতলবে ডেকে কাছে বসালে, সেইটিই বুঝতে পারছি নে।

সহজ কণ্ঠেই পাতিরাম বলিল, বুঝিয়ে দিচ্ছি এখুনি, আর এটা বলবার জন্যই তোমাকে ডেকেছি। যে দিন তুমি রাধুর জুড়ি ছেড়ে ছ্যাকরা গাড়ি বা রিক্শায় চড়ে এখানে আস, সেদিন বুঝেছিলাম রাধুর পিরীত চটবার দাখিল হয়েছে। জুড়ি পাঠায় নি যখন, নিশ্চয়ই জোড় ভেঙে গেছে।

কৃত্তিবাস ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে পাতিরামের প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল। পাতিরাম সে দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, তোমার হাল আমার সব জানা হয়ে গেছে।

কৃত্তিবাস কহিল, তুমি যখন এ বাজারের হর্তা-কর্তা-বিধাতা, আমার এখানকার হাল সব জানবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

পাতিরাম কহিল, তোমার এখানকার হাল তো একটা বিহারী কুলী পর্যন্ত জানে। এ জানায় আর বাহাদুরি কি বল? আমি বলছি, তোমার ওদিককার হাল—হার্ডওয়ার বাজারের গো!

চমকিত হইয়া কৃত্তিবাস শুধাইল, মাছের বাজারে বসে তুমি ক্লাইভ স্ট্রীটের খবরও রাখ নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া পাতিরাম কহিল, তোমার জন্যই রাখতে হয়েছে বন্ধু। শুনতে চাও?

কৃত্তিবাস বলিল, বেশ, বলে যাও। শুনতে আমার আপত্তি নেই।

প্যাতিরাম তখন ধীরে ধীরে অথচ খুব সংক্ষেপে কৃত্তিবাসের কর্মজীবনের অধ্যায়টি এমনভাবে আনুপূর্বিক শুনাইয়া দিল যে, কৃত্তিবাসের মনে হইল, সে বুঝি এমন করিয়া তাহার জীবনের ছোট বড় ঘটনা এবং সেই সঙ্গে ভুল-চুক লইয়া বিশ্লেষণ করে নাই বা সে সামর্থ্যও তাহার নাই। প্যাতিরাম যাহা বলিল, তাহার মর্মাংশ এই রূপ:

বাপের কারবারটি হাতে পাইয়া কৃত্তিবাস তাহার দফা-রফা করিয়া ছাড়িয়াছে। বাহিরের ঠাটখানি বজায় আছে মাত্র, ভিতরটা ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে। এদিকে মাছের কারবার করিয়া পাতিরমি পাকড়ে ফাঁপিয়া উঠিয়াছে শুনিয়া ভাগ্য ফিরাইবার মতলবে রাধুকে বখরাদার করিয়া এদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু বাপের বাপটে রাধুবাবু তো আর এই ইতর কারবারে নামিতে পারেন না, অথচ এই কারবার করিয়াই তাহাদের ছাত্রজীবনের সহপাঠী পাতিরাম দেদার টাকা পয়দা করিতেছে, এ সুযোগও ছাড়া যায় না! তাই দুই বন্ধুর এই পথে অভিযান। কিন্তু প্রথম দিনেই আমার সওগাত রাধুবাবুর মন ভেঙে দিলে। তুমি সে সময় সরে পড়লে ভাল করতে, কিন্তু তোমারও রোখ চেপে গেল। একলাই নামলে, রাধুবাবু যে পাঁচ হাজার দেবে বলেছিল, সেটা দিলে ধার বলে—হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে। সে টাকা তো ডুবলই, তার পর আপিসের টাকায় হাত পড়ল—সেও শেষ হয়ে গেছে এখানকার দেনা মেটাতে। এখন রাধুবাবু ঐ পাঁচ হাজার টাকার জন্য জোর তাগাদা চালিয়েছে। সেই তাগাদা থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাপের কারবারটা তাকেই বেচবার মতলব করেছ। এই তোমার বন্ধু! প্রথম দিনে যে পাঁচ শ টাকা ছেড়ে দিয়েছিল—মাছ সব জলে ভাসিয়ে দিতে বলেছিল, তার পর তার শেয়ারের টাকাটা যেই ধার বলে চাইলে, রাধু তখন সাড়ে চার হাজার টাকা ঠেকিয়ে পুরো পাঁচ হাজারের হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলে!···এই তো তোমার অবস্থা হে? ঠিক বলেছি কি না?

পাতিরামের কথা শেষ হইলে কৃত্তিবাস ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর অভিভূতের মত বিহ্বলভাবে শুধাইল, তুমি কি জ্যোতিষ জান পাতিরাম?

মৃদু হাসিয়া পাতিরাম কহিল, কারবার করতে বসলে কারবারীর কি কর্তব্য জান? শকুনির মত দৃষ্টি দিয়ে সব কিছু দেখা, আর সেই সঙ্গে হিসাব রাখা। ভাল হিসাবী না হলে জ্যোতিষী হওয়া যায় না। ও দুটোই আমাকে রপ্ত করতে হয়েছে। থাক্, এখন আমি একটা কথা তোমাকে বলতে চাই—

আমার হতে যখন তোমার এতগুলো টাকা লোকসান হয়েছে, আমি অন্য দিক দিয়ে সেটা উসুল করে দিতে চাই।

কৃত্তিবাস নীরবে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে পাতিরামের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। পাতিরাম বলিল, কথা বাড়াতে চাই না; কাজের কথাই বলি। ছেলেবেলা থেকে তোমাদের বন্ধুত্ব। অথচ আজ তুমি বিপন্ন জেনেও তোমার বন্ধু দেনার দায়ে কারবারটা কেড়ে নিচ্ছে।

একটু তিক্ত কণ্ঠেই কৃত্তিবাস কহিল, কেড়ে নেবে কেন, আমি দলিল করেই বেচে দিচ্ছি। ভিতরে মজুত মালও বেশী নেই, টেনেটুনে ঐ টাকাটা উঠতে পারে। বাজার-দরও ক্রমশঃ নামছে।

পাতিরাম মনে মনে কিছু ভাবিয়া তাহার পর কহিল, কিন্তু তোমার বাবা নাকি শেষের দিকে ম্যাকিনটস্ বরনের পুরানো একটা গুদামের মাল—

কৃত্তিবাস একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল, এ খবরও তোমার জানা আছে? কিন্তু শোন নি বাবা মরবার আগে বুদ্ধির ভুলে ঐ একটা ভুল করে গেছেন। মাল বলতে গাড়ি দশেকের ভাঙা-চোরা লোহা, এ বাজারে ওর কোন দাম আছে নাকি?

পাতিরাম বলিল, তা হলেও রাধুবাবু বন্ধুত্বের খাতিরে আরও কিছু টাকা দিতে পারতেন।

কৃত্তিবাস বলিল, না, তার দেনার টাকার ওপর আর কিছুই দেবে না। ওর দেনা শোধ করে আমাকে খালি হাতে ফিরতে হবে। তা ছাড়া, ওর দেনা আমি রাখব না, শোধ আমাকে করতেই হবে।

মুখখানা বিকৃত করিয়া পাতিরাম কহিল, এই তোমাদের বন্ধুত্ব! এই তোমরা বড় ঘর, বড় বংশ, বড় লোক বলে অহংকার কর! ছ্যা-ছ্যা—

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। একটু পরে পাতিরাম বলিল, আমি বলি কি, দেনার টাকাটা বরং তুমি মিটিয়ে দাও, কিন্তু কারবারটা ছেড়ে দিও না।

কৃত্তিবাস বলিল, ও কারবার আমি রাখব না। লোহালক্কড় নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে কাজ করে কি মনমেজাজ ঠিক থাকে? লোহা থেকে কখনও রস বেরোয়? সাধে কি আমি রাধুর প্রস্তাবে সায় দিয়েছি?

পাতিরাম সহসা সোজা হইয়া বসিল এবং মুখখানা শক্ত করিয়া কৃত্তিবাসের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া চাপা গলায় কহিল, তা হলে এক কাজ কর, কারবারটা আমাকেই বেচে ফেল, আমি তোমাকে তার জন্য নগদ দশ হাজার টাকা দিচ্ছি।

এই টাকা থেকে তুমি রাধুর পাঁচ হাজার চুকিয়ে দাও, বাকি পাঁচ হাজার নিয়ে অন্য কোন লাভের কারবারে লেগে পড়।

কিছুক্ষণ বিস্ময়াতিশয্যে নীরব থাকিয়া তাহার পর কৃত্তিবাস সহসা ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিল, তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ পাতিরাম?

স্নিগ্ধ ও কোমল কণ্ঠে পাতিরাম বলিল, না। তোমার এ অবস্থায় হালচাল সব জেনেও যদি আমি ঠাট্টা করি, তা হলে সবাই আমায় পাষণ্ড বলবে। তুমি বললে না, লোহা থেকে কি রস বের হয়? লোহা ঘেঁটে যখন তাকে চিনতে পার নি বন্ধু, আমার ইচ্ছা হল, আমি যে কাঁচা মালের ব্যাপার করি, তার রস তো দেখেছি, এখন ঐ পাকা শক্ত জিনিসটা নেড়ে-চেড়ে দেখি—এর ভিতর থেকেও রস বের করতে পারা যায় কিনা! যাক্, জান তো, আমার যে কথা, সেই কাজ। এখন তুমি তৈরী হও, চাও তো আজই রেজিস্টারি করতে পার!

কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাতিরামের হাত দু খানা ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, অনেক অন্যায় আমি করেছি তোমার ওপর, কিন্তু তুমি তার বদলে যা করলে তার নজির মেলে না। যাই হোক, আমাকে ভাই ক্ষমা কর।

পরদিন অপরাহ্ণে রেজিস্টারি আপিস হইতে ফিরিয়া পাতিরাম তাহার সেই লালরঙের খেরোবাঁধা খাতাখানিতে কৃত্তিবাসের নামচিহ্নিত পাতায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিল :

দশ হাজার টাকায় কোলে কোম্পানির হার্ডওয়ারী কারবারটি যাবতীয় মালপত্র আপিস-সরঞ্জাম ও গুডউইল সহ ক্রয় করিলাম। কৃত্তিবাসের বিশ্বাস, আমি রীতিমত ঠকিয়াছি। আমি দেখিতেছি, ভাগ্যদেবী হাতছানি দিয়া আমাকে এই প্রতিষ্ঠানে আনিয়া তাঁর আঁচলের চাবিকাঠি আমার হাতে তুলিয়া দিতেছেন। আশ্চর্য হইয়া ভাবি, ইহারা শিক্ষিত হইয়াও দুনিয়ার খবর রাখে না। তাই লোহার বাজার নামিতে থাকায় সবাই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আমার বিদ্যা নাই, তাহা হইলেও বাংলা সংবাদপত্র আগাগোড়া পড়ি; নিয়মিত পড়িতে পড়িতে মাথা খুলিয়া গিয়াছে। সেই মাথার মধ্যে তালগোল পাকাইয়া একটা শব্দ যেন সব সময় জানাইয়া দিতেছে—সব উলটাইয়া যাইবে। এই যে লোহার বাজার দিনে দিনে নামিয়া চলিয়াছে, একটা দমকা বাতাসের ভর পাইলেই হু হু করিয়া উঠিতে থাকিবে। সেই বাতাসটা কী—কবে বহিবে? কাগজ খুলিলেই দেখি—ওদেশে লড়াই বাধিতে আর বিলম্ব নাই। যাহা রটে, তাহা বটে। যুদ্ধের এমন গরম বাতাস একটা জায়গায় জমা হইতেছে...একটু দোলা পাইবার ওয়াস্তা

—তবুও লোহা নামিতেছে, লোহার ব্যাপারী যাহারা ভাল দর পাইলেই গুদামের পুরাতন মাল পাচার করিয়া দিতেছে। মাছের ব্যাপারীর পক্ষে মাছ তো ধরিয়া রাখা যায় না, তাই সে লোহা ধরিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ ব্যাপারে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছে বন্ধু কৃত্তিবাস কোলে। ভাগ্যদেবী বলিতেছেন—মাভৈ, দিন আগত ঐ।...দেখা যাক তামাশা।

॥ সাত ॥

বন্ধু রাধানাথকে না জানাইয়া কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি তাহার কারবার বিক্রয়ের কোবালা রেজিস্টারী করিয়া ফেলে। সে ভাবিয়াছিল, ব্যাপারটা জানাজানি হইতে সময় লাগিবে, সুতরাং বন্ধুমহলে চাপিয়া রাখাই ভাল।

কিন্তু রেজিস্টারীর পরদিনই পাতিরাম কোলে কোম্পানির আফিস ও গুদামে প্রবেশ করিয়া দখল লইল, সেই সঙ্গে এক সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিল। তাহাতে বড় বড় হরফে নূতন প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষিত হইয়াছে—নগদ-বিদায় আয়রন এজেন্সি।

খবরটা রাধানাথের কানে আসিতেই কৃত্তিবাসকে ডাকিয়া কহিল, এ কি কাণ্ড করেছ—পাকড়ের হাতে কারবার বেচে তাকে এ লাইনে টেনে এনেছ?

কৃত্তিবাস কহিল, কি করি বল, নগদ পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকার লোভ সামলানো শক্ত কথা। তার পর, ভাল ভাল মাল যা ছিল, বেশীর ভাগ তো তোমার গুদামে আগেই উঠেছে। ও বোকচন্দ্র আর পাবে কি? শুনলে তুমি অবাক হবে, বাবা শেষকালে সেই যে ম্যাকিনটস্ বার্নের পুরোনো গুদোমের মালগুলো কিনে নেন, আমাদের গুদোমের তিন ভাগেরও বেশী জায়গা জুড়ে পড়ে আছে যে মালগুলো, তাই দেখেই মশ্‌গুল! বলে কিনা, এ থেকেই টাকাটা উসুল হয়ে যাবে —পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে কিনা।

রাধানাথ একটু গম্ভীর হইয়া মন্তব্য করিল, কথায় আছে না—শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। এরও হয়েছে সেই দশা। মাছ বেচা টাকা লোহার মরা-বাজারে পাচার করে আমাদেরই পেট ভরাবে। তা মন্দ কি।

বাড়ি ফিরিয়া সেদিন রাধানাথ বধূ নিভাকে বলিল, শুনেছ, কৃত্তিবাস কোলের কারবার বিক্রি হয়ে গেছে, কিনেছে—নিকিড়িপাড়ার পাতিরাম পাকড়ে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ঐ বন্ধুটির কথা উঠলেই আমার খালি মনে পড়ে সেই মাছ দুটোর কথা। ঐ মাছ থেকে তোমার সঙ্গে ওর কারবারে ছাড়াছাড়ি হয়; জেদের বশে একলাই নামল মাছের কারবার করতে; শুনেছি, তাতেই নাকি ডুবেছে। এখন ভাবি, ভাগ্যিস্ তুমি ও কারবারে নাম নি?

রাধানাথ বলিল, ওর সেই মিছে কথাটাই কাল হয়েছিল। তাতেই না আমার মন বিগড়ে যায়। লোহার বাজার মন্দা দেখে ওকেই সামনে রেখে ঐ লাভের কারবারটা চালাবার প্ল্যান করা গিয়েছিল। হতভাগাটার দোষেই আর হয়ে উঠল না।

নিভা বলিল, ভালই হয়েছে। হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওর কারবারটা বিক্রিই যখন হল, তুমি কেন কিনে নিলে না?

মুখখানা ভারী করিয়া রাধানাথ বলিল, বাবার কাছে বসে বসে বাণিজ্যবিদ্যা শিক্ষা করে খুব জ্ঞান অর্জন করেছ তো?

মৃদুস্বরে নিভা বলিল, কেন, অন্যায় কিছু বলেছি কি?

বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করিয়া রাধানাথ বলিল, দুনিয়া সুদ্ধ সবাই জানছে, লোহার বাজারের ভার দুর্দিন; দিন দিন দর নেমে যাচ্ছে, মজুতমাল কারবারীরা কেনা দামে ছাড়বার জন্যে ছুটোছুটি করছে, শেয়ার মার্কেটের দরেরও ঐ অবস্থা, কেউ নতুন শেয়ার কিনছে না, আমাদের মতন স্টকিস্টরা মাল বুকে করে দরের দিকে তাকিয়ে আছে, এ সময় কোন কারবারী নতুন কারবার ফাঁদে, না দাঁওয়ে কোন কারবার কেনে? কেন, বাবা তোমাকে বলেন নি—আমাদের এই ব্যবসার ওপর কি দারুণ দুঃসময় ঘনিয়ে এসেছে?

গম্ভীর মুখে নিভা বলল, বলেছেন—সে অনেক কথা। বাবা এখনও নিত্য খবরের কাগজ আগাগোড়া দেখেন। লোহা নিয়ে বিশ্বময় কি সমস্যা, কি রকম গোলমাল চলেছে, আমাকেই সেগুলো পড়ে ওঁকে শোনাতে হয়; সেই নিয়ে আমাদের মধ্যেও…

ব্যঙ্গের সুরে রাধানাথ বলিয়া ওঠে, বটে! তা হলে বাবার বৈঠকখানায় দুপুরবেলায় তোমাদের শেয়ার মার্কেট বসে বল? ভাল, ভাল, তা তোমরা আলোচনা করে কি জেনেছ—লোহার এ বাজার আবার উঠবে, না এইভাবে থাকবে?

নিভা একটু তিক্ত স্বরেই বলিল, নিজে যখন একটা কারবার চালাচ্ছ, তার গতি-প্রকৃতির খবর রাখ না? কোন জিনিসের বাজার একভাবে কি বরাবর থাকে? বাবা বলছিলেন, আমাদের দেশের লোহার বাজারের হিসাব করতে হলে, ওদেশের

রাজনৈতিক ব্যাপারগুলোর খবর রাখতে হবে।

মুখে একটু বক্র হাসি ফুটাইয়া রাধানাথ বলিল, ইউরোপের রাজনীতির খবর আজ-কাল সবাই রাখে; অনেকেই বলছে, একটা যুদ্ধ বাধবার খুব সম্ভাবনা। কিন্তু ইউরোপে যদি যুদ্ধই বাধে, তার সঙ্গে এদেশের লোহার বাজারের সম্বন্ধ কি?

নিভা একটু ক্ষুব্ধ হইয়াই বলিল, ইস্কুলের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলে, তারাও এর জবাব দিতে পারে। আর, তুমি একটা বিখ্যাত লোহার কারবারের মালিক হয়ে আজকের দিনের পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ডের কোন খবর রাখ না! তোমার সামনে দাঁড়িয়ে তোমাকে সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষে হয়তো ধৃষ্টতা হবে, নতুবা—

রাধানাথের প্রকৃতিগত অসহিষ্ণুতা এখানে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, স্ত্রীর মুখে এই শ্রেণীর বড় বড় কথা শুনিতে আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না, সহসা রুক্ষস্বরে বলিল, থাক্। এ সব কথা নিয়ে বাবার সঙ্গেই আলোচনা কর—আমার কাছে বিদ্যা প্রকাশ না করাই ভাল।

নিভা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তথাপি স্বামীকে অনুরোধের ভঙ্গিতে বলিল, দেখ, শুধু ইউরোপে নয়, আমাদের দেশেও একটা মস্ত দুর্দিন আসছে। এ সময় ব্যবসায়ীদের ভাববার অনেক কিছুই আছে। আমি বাবার কাছে যা শুনেছি, তাই বলছি। তুমিও একটু সময় করে নিয়ে বাবার কাছে বসে এ সম্বন্ধে আলোচনা যদি কর, তাতে তোমার ভালই হবে। তুমি যদি বল—

নিভার কথায় বাধা দিয়া রাধানাথ কণ্ঠস্বর বিকৃত করিয়া বলিল, থাম। তোমাকে সুপারিশ ধরে আশী বছরের বৃদ্ধ বাবার কাছে বসে বর্তমান যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরামর্শ নেবার কোন প্রয়োজন নেই। তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে। ওঁদের দিন ও যুগ চলে গেছে। আর ওঁদেরও এখন উচিত, সন্ধ্যঘরে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করে পরলোকের পথটা পরিষ্কার করে রাখা।

নিভার দুই নেত্র-মণি বুঝি স্বামীর কথায় জলিয়া উঠিল। স্বামীর মুখের উপর তাহার একটা ঝলক বর্ষণ করিয়াই সে সবেগে চলিয়া গেল। রাধানাথ আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া সিগারেটের বাক্সের দিকে মনোনিবেশ করিল।

টালার বড় বাড়ির একটা নিয়ম রাধানাথ নিষ্ঠাসহকারে মানিয়া থাকে; তাহা হইতেছে, নিয়মিত সময়ে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আপিস যাওয়া। পিতার আমল হইতে রাধানাথ প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আপিসে হাজিরা দিতে অভ্যস্ত। দশটায় বাড়ি হইতে বাহির হইয়া সাড়ে দশটার মুখে অফিসের দেউড়িতে তাহাকে অবতরণ করিতে দেখা যাইত।

কর্তা বারোটা বাজিলে ভোজনে বসিতেন, সে সময় নিভাকেই তাঁহার পরিচর্যা করিতে হইত। তাহার পর সেরেস্তা ও সংসারের আর সকলের আহারের ব্যবস্থা করিয়া বধূ শ্বশুরের পাতেই প্রসাদ গ্রহণ করিত। দশটা হইতে বারোটা পর্যন্ত পূর্ণ দুইটি ঘণ্টা কর্তা বধূকে কাছে বসাইয়া বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কোন দিন বা আলোচনা চলিত। কর্তা সহজে পুত্র রাধানাথকে ডাকিয়া কোন কথা বলিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেন না। বধূ পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি বলিতেন, তুমি তার প্রকৃতি জান না, কারও যুক্তি কানে নিতেও চায় না, অথচ নিজে কিছুই বোঝে না! তা সত্বেও আমাদের ঐ লক্ষ্মীর টাট তারই হাতে তুলে দিতে হবে। তাই আমি ভেবেছি মা, আমার জমিদারি, কলিয়ারি, মাইকা মাইন এসব তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব। শুধু হার্ডওয়ার বিজনেস নিয়ে ও থাকুক, আর তুমি এগুলো চালাবে।

বধূ তখন সবিনয়ে শ্বশুরকে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করিতে থাকে। সবিনয়ে বলে, বাবা, আপনি এ সংকল্প ত্যাগ করুন। আমি এই যে আপনার কাছে বসে নানা বিষয় শিখি, পরামর্শ নিই, এসবও ওঁর পছন্দ নয়। স্ত্রীর সম্বন্ধে উনি সেই সাবেক ধারণাই পোষণ করে আসছেন। আজ্ঞাবতী দাসীর মত আমি তাঁর সব আদেশ নতমুখে পালন করব, ওঁর ভুল ত্রুটি অন্যায় হলেও আপত্তি বা প্রতিবাদ করব না, উনি যা করবেন—সে ভাল হোক বা মন্দ হোক, মুখ বুজে দেখে যাব, মেনে নেব—এই উনি চান। এর ওপর আপনি যদি লেখাপড়া করে কোন কোন বিষয়ে কর্তৃত্ব আমাকে দিয়ে যান, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না, হয়তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েই যাবেন। তার চেয়ে, আপনি যা করছেন, তাই করুন বাবা, আমাকে সব বিষয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে এমন পাকা পোক্ত করে দিন, আমি যেন—যদি কখনও তেমন কোন দুর্দিন আসে, হাল ধরে দাঁড়াতে পারি।

বধূর কথা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া কর্তা বলেন, দেখ মা, বাধুর ওপর আমি গোড়া থেকেই আস্থা রাখতে পারি নি। তাই যখন ওর বিয়ের সম্বন্ধ আসে, সে-সময় স্থির করি যে, নিজেই দেখে শুনে এমন একটি মেয়ে আনব, সব দিক দিয়ে স্বভাবতঃই যে হবে চৌকশ, তার ওপর আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে পাকা করে নেব। সেই থেকে এক শ মেয়ে দেখেছি মা, পরীক্ষায় তুমিই জিতে গিয়ে এ বংশের বধূ হয়ে এসেছ। আদর্শ মেয়েদের যে সব গুণ থাকা দরকার, তার সব কটিই মা জগদম্বা তোমাকে দিয়েছেন; তার ওপর আমি দিয়েছি মা বিষয়-আশয়

দেখবার, মানুষ চালাবার, কর্তৃত্ব করবার উপযুক্ত শিক্ষা। তাতেও তুমি পাস করে আমাকে তৃপ্তি দিয়েছ। বেশ, তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি মা, অশান্তির সৃষ্টি না করে আমি তোমাকেই সব দিক দিয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে চৌকশ করে নেব।

কয়টি বৎসর ধরিয়া সেই শিক্ষাকার্যই চলিয়াছে।

সেদিন রাধানাথের গাড়ি বাহির হইবার কিছু পরেই কর্তার ঘরে বধূ নিভার ডাক পড়িল। সেদিনের খবরের কাগজগুলি হাতে করিয়া নিভা তাহার দোতলার ঘর হইতে নামিয়া নিম্নতলে শ্বশুরের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল।

বৈঠকখানার নীচু পাটাতনের উপর আস্তৃত শুভ্র ফরাসের উপর তেমনি সাদা আস্তরণ দেওয়া বিশ-বাইশটি তাকিয়া। মাঝখানে একখানি আস্ত বাঘছাল বিছানো, তাহার উপর সুদীর্ঘ দেহটি ঋজু করিয়া যোগীর মত ভঙ্গিতে বসিয়াছিলেন ঋষিকল্প গৃহস্বামী সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। নিভা দ্বারদেশে আসিয়াই মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল ও পদধূলি লইল। প্রসন্নমুখে কর্তা আহ্বান করিলেন, এসো মা, বসো।

আস্তৃত বাঘছালটির পাশেই বধূ স্থান গ্রহণ করিল। কর্তা বলিলেন, ওদেশের অবস্থার কথা ভাবছিলাম মা, ঝড় উঠল বলে। সারাবিশ্বের অবস্থাটা এখন থমথম করছে। বড় রকমের ঝড় ওঠবার আগে এরকম অবস্থা হয়। দেশে যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধের জন্য যে সব জিনিসের দরকার, যারা সেইসব জিনিস নিয়ে ব্যাপার করে, তাদের মাথা ঘামাবার সময় এসেছে মা—

এই সময় বৈঠকখানার বাহিরে বড় রাস্তার উপর জুড়িগাড়ি আসিবার আওয়াজের সঙ্গে গাড়ির ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ রাস্তায় জুড়িগাড়ি চেপে কে এল রে! এ তো আমার গাড়ির আওয়াজ নয়—

ভৃত্য নিধিরাম পরক্ষণে দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিল।

কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এল রে?

নিধিরাম কম্পিতকণ্ঠে মৃদুস্বরে ও কুণ্ঠিতভাবে কহিল, এজ্ঞে, নিকিড়িপাড়ার পাতিরাম পাকড়ে, কর্তা?

সঙ্গে সঙ্গে কর্তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল, ওষ্ঠের উপর স্থূল গুম্ফ-জোড়াটি স্ফীত হইয়া উঠিল সেই সঙ্গে। কণ্ঠ হইতে রুক্ষস্বর নির্গত হইল, কে? রূপার

বেটা এসেছে জুড়ি চেপে আমার বাড়িতে? তবু যদি নিজের কেনা জুড়ি হত! আওয়াজ শুনেই বুঝেছি—

বলিতে বলিতে একটু ঝুঁকিয়া খড়খড়ির ফাঁক দিয়া জুড়িখানা দেখিয়াই কহিলেন, হুঁ! ঠিক তাই; কুকের আড়গড়া থেকে ভাড়া-করা—যাক্ গে, কি মতলবে সে এসেছে রে?

নিধিরাম করজোড়ে বলিল, হুজুরের কাছেই তেনার বরাত।

গম্ভীর ভাবে হুজুর হুকুম দিলেন, আসতে বল্।

সেই সঙ্গে বধূকেও ইশারা করিলেন তিনি পাশের ঘরে গিয়া বসিবার জন্য। নিভাও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেল। এই অদ্ভুত লোকটার সম্বন্ধে অনেক কথাই সে শুনিয়াছে। এখন কি উদ্দেশ্য লইয়া কর্তার সন্নিধানে আসিয়াছে তাহা জানিবার জন্য তাহার মনে একটা কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। আলোচনার সময় বাহিরের কোন ব্যক্তি বিশেষ প্রয়োজনে কর্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে, তৎকালে বৃহৎ বৈঠকখানায় পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র একটি কক্ষে কর্তার ইঙ্গিতে বধূকে প্রতীক্ষা করিতে হয়। আগন্তুকের প্রস্থানের পর বধূ পুনরায় বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগ দেয়।

মনের মধ্যে একটা কৌতূহল বহন করিয়াই বধূ পার্শ্বের কক্ষে আশ্রয় লইল। ইতিমধ্যে কর্তার নির্দেশমত নিধিরাম পাতিরামকে লইয়া বৈঠকখানায় কর্তার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কর্তা যদি পূর্বেই ভৃত্যের মুখে সাক্ষাৎপ্রার্থী মানুষটির পরিচয় না পাইতেন, তাহা হইলে হয়তো মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদধারী আগন্তুককে চট্টগ্রাম বা আসাম-প্রদেশের কোন খেতাবধারী রাজপুরুষ অনুমান করিয়া অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতেন। কিন্তু ভৃত্য নিধিরাম পূর্বেই জ্ঞাপন করিয়াছে—নিকিড়িপাড়ার পাতিরাম পাকড়ে লায়েক হইয়া কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

তাই পাতিরাম কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া প্রবেশ করিতেই কর্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রথমেই তাহার অঙ্গের মূল্যবান পরিচ্ছদ ও আভরণগুলির দিকে নিবদ্ধ হইল। গায়ে তাহার বিদেশী ক্রেপ সিল্কের পাঞ্জাবি, তাহার স্থানে স্থানে জরীর কারুকাজ, গলার বোতামগুলি আসল বা নকল টেটস্ ডায়মণ্ড যাহাই হউক—আসল হীরার মতই ঝকমক করিতেছে। পরনে জরির পাড়ের বাহার দেওয়া ঢাকাই মিহি ধুতি, পাঞ্জাবির উপর জরিদার একলাই চাদরের জমকালো আঁচলা দুইটি এমন কায়দায় কাঁধের দুই দিকে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যে, সহজেই সকলের

দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এহেন চক্ষুচমৎকারী পরিচ্ছদের উপর প্রায় বাইশভরি ওজনের এক ছড়া মোটা গার্ড চেইন এবং উভয় হস্তের দশটি অঙ্গুলিতেই বিভিন্ন বর্ণের মূল্যবান রত্নাঙ্গুরি।

এক নজরে আগন্তুকের বিচিত্র বেশভূষা আগাগোড়া দেখিয়া কর্তা তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি উন্নত করিয়াছেন, এমন সময় আগন্তুক তাহার মূল্যবান অঙ্গুরী-পরিহিত অঙ্গুলিগুলি যুক্ত করিয়া ললাটের দিকে তুলিল; অবশ্য মধ্যে ব্যবধান রহিল একটি বিঘতেরও অধিক। পূজনীয় বা শ্রদ্ধাভাজনদের উদ্দেশে নতিপ্রকাশের এই যে প্রথা, অধুনা সুপ্রচলিত হইলেও, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সম্ভবতঃ পাতিরামই ইহার প্রবর্তক। অশীতিপর স্থবির পুরুষসিংহকে এইভাবে অভিবাদনের ছলে উভয়হস্তের অঙ্গুরীগুলির শোভা প্রদর্শন করিয়াই পাতিরাম ফরাসের এক ধারে গৃহস্বামীর অনু-মতির প্রতীক্ষা না করিয়াই বসিয়া পড়িল।

পলকহীন দৃষ্টি আগন্তুকের মুখের উপর অব্যাহত রাখিয়া যুগল উজ্জ্বল চক্ষুর আলোকে তিনি যেন এই মানুষটির অন্তর বাহির এক নিমেষে পড়িয়া লইলেন।

এরূপ নীরবতায় আগন্তুক পাতিরাম মনে মনে অস্বস্তিবোধ করিয়া কহিল, আমি আপনার কাছেই এসেছি মুখুজ্যে মশাই!

সহজ সুরেই কর্তা উত্তর দিলেন, সে তো দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। কিন্তু তবুও মনের ধোঁকা আমার কাটছে না—কেবলই মনে পড়ছে···

পাতিরাম একটু অসহিষ্ণুভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কথাগুলো কেমন কেমন···

পাতিরামের কথায় ভ্রূক্ষেপও না করিয়া কর্তা বলিলেন, বোধ হয় বছর বত্রিশের কথা হবে···নৈত্য জেলে মুখুজ্যে সরকারের জল-আবাদের তদ্বির করত। ঝিল, খাল, জলা, পুকুর, দিঘির বিলি বন্দেজ, ডিম ফুটিয়ে মাছ করা, পুকুরে পুকুরে সেই মাছ ফেলা, ধরা, বেচা—সবই থাকত তার হাতে। মাথা ঘুরিয়ে খ্যাপলা জাল ফেলতে সে ছিল নিকিড়িপাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ওস্তাদ। দেহখানা তার লম্বায় চার হাতের এলাকা পেরিয়ে যেত; কিন্তু রেলির বাড়ির আটহাতি একখানা ধুতি, আর বেগমপুরের পাঁচ হাতি গামছা—এই ছিল তার লজ্জানিবারণের সম্বল।

কর্তার মুখের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে পাতিরামের মুখখানা ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তাহার অখ্যাত দীনদরিদ্র পিতার প্রসঙ্গ এভাবে তুলিবার কি সার্থকতা তাহা সে ভাবিতে লাগিল। দরিদ্র পিতার কথা তুলিয়া তাহাকে অপ্রস্তুত করাই কি ইহার অভিপ্রায়। এই অবস্থায় সে সন্তর্পণে তাকাইয়া তাকাইয়া

দেখিল যে, বৃদ্ধ গৃহস্বামী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত আছে কি না। তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বের সন্ধান না পাইয়া এবং যে ভৃত্যটি তাহাকে এই কক্ষে উপস্থিত করিয়াছিল, সে ব্যক্তিও চলিয়া গিয়াছে জানিয়া, পাতিরাম আশ্বস্ত হইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষিপ্রকণ্ঠে কথাগুলি বলিয়া কর্তা একটু থামিয়াছিলেন। পাতিরামও মুখভার করিয়া কথাগুলি শুনিতেছিল, আড়চোখে তাহার দিকে চাহিয়া কর্তা এবার বক্তব্য উক্তিটার শেষ করিলেন—সেই নেত্যর ছেলে তুই আজ লায়েক হয়ে নকল নবাব সেজে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিস্…কুক কোম্পানির ভাড়াটে জুড়ি চড়ে! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! শুনেছিলাম, ব্যবসা করে তোব নাকি শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে; কিন্তু এখন দেখছি সেটা বাজে কথা, তুই শুধু আত্মগরিমায় ফেঁপে উঠেছিস্—টাকার গরম হলে এমনি হয়। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর নর্তন।

পাতিরাম এতক্ষণে অন্তরে সাহস সঞ্চয় করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চস্বরেই বলিল, আমার বাবাকে আপনি নিজের সুবিধার জন্যে আপনার কাজের ব্যাপারে আটকে রেখেছিলেন বলেই, রেলির বাড়ির আটহাতি ধুতি পরে আর গামছা একখানা গায়ে দিয়ে তাঁকে লজ্জা নিবাবণ করতে হত, কিন্তু তাঁর ছেলে এখানকার সম্পর্ক কাটিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের উপার্জনের টাকায় অঙ্গসজ্জা করে মাথা তুলে সামনে এসে কাছে বসেছে বলে, আজ আর বুঝি নিজেব লজ্জাটাকে বাগ মানাতে পারছেন না—তাই আগেকার কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন? এখন আমি যদি এব জন্যে আপনাকে 'ছি ছি' বলে…

শেষের কথাটা বলিয়াই কর্তার সৌম্যমূর্তিটার অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই বক্তাকে নীরব হইতে হইল, কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। পরক্ষণে কর্তার অস্বাভাবিক মূর্তির মত কণ্ঠ হইতে অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধস্বর নির্গত হইল, চোপরাও বেয়াদপ! সাতকড়ি মুখুজ্যের বৈঠকখানায় ঢুকে তার হুকুম না নিয়ে এর আগে আর কেউ তার ফরাসে বসতে ভরসা করে নি, আর এমন করে বে-পরোয়া হয়ে মুখে খোলে নি। তুই যদি সেই নেত্যর ছেলে না হতিস, তা হলে এতক্ষণে তোর জিভখানা মুখের মধ্যে থাকত না—

অগ্নিমূর্তি কর্তা এত জোরে ও গুরুগম্ভীরস্বরে কথাগুলি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন যে, তাহার আওয়াজে অদূরবর্তী সেরেস্তা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। পাশের ঘরে বধূ নিভাও দারুণ উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া ভৃত্য নিধিরামকে ডাকিয়া কর্তাকে নিরস্ত করিবার জন্যে নির্দেশ দিল। সহসা এরূপ উত্তেজনা যে বর্তমান অবস্থায় কর্তার

স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, বধূ ভালভাবেই তাহা জানে। তাই সে নিধিরামকে বলিয়া দিল, যদি ঐ ইতর লোকটা ভদ্রভাবে সংযত হয়ে বাবার সঙ্গে কথা না বলে, তা হলে তোমরা ওকে ওঘর থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যাও।

সেরেস্তার কর্মচারীরাও কৌতূহলী হইয়া বৈঠকখানার বাহিরে সমবেত হইতেছিল। পাতিরামের মুখমণ্ডলে আতঙ্কের একটা ছায়া পড়িলেও, সঙ্গে সঙ্গে জোর করিয়া মুখের সে-ভাব বদলাইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরেই তাহাকে বলিতে শোনা গেল, বুঝতে পেরেছি মুখুজ্যে মশাই, আপনার ঘরে ঢুকেই হুকুমের অপেক্ষা না করে এই ফরাসে বসায় আপনি চটে গেছেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে কোন কিছুর প্রার্থী হয়ে আসি নি, এসেছি আপনার একটা দেনা শোধ করবার জন্যে। সেটা চুকিয়ে দিয়েই আমি এ ফরাস ছেড়ে উঠে যাব। দেনা-পাওনার ব্যাপার যেখানে, সেখানে না বসে তো উপায় নেই।

পাতিরামের এই কথাগুলি কর্তার ক্রোধানলে বুঝি জলসিঞ্চন করিল। সবলে নিজেকে সংযত করিয়া তিনিও ঈষৎ শ্লেষের স্বরে বলিলেন, প্রার্থী হয়ে তুমি আস নি তা জানি; কিন্তু দেনা শোধ করবার জন্য এসেছ—এ কথা কি উদ্দেশ্যে বললে? আমার সেরেস্তায় তোমার নামে তো কোন দেনা নেই বাপু। তবে—

শান্ত কণ্ঠে পাতিরাম উত্তর করিল, দেনা একটা নিশ্চয়ই আছে, অবিশ্যি আমার বাবার আমলের নয়, বাবার মৃত্যুর পর আমার মায়ের আমলের সে দেনা। বাবা কিছুই রেখে যেতে পারে নি, তাই মা আমাকে নিয়ে মাথায় মাছের টুকরি তুলে জাত-ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। কিন্তু আপনিই সে সময়—

অতীতের স্মৃতিসূত্র ধরিয়া কর্তা এখন শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রূপকে আগেই বলেছিলাম, তোর ছেলেটার মুখ দেখে মনে হয় প্রতিভা আছে, ও মানুষ হবে। ওকে আর মাছের বাজারে নিয়ে যাস নি বাছা; আমি বলি কি—ওকে স্কুলে দে, পড়ুক। আমার কথা শুনে রূপ তো ভেবেই অস্থির, স্কুলে পড়ার খরচ যোগাবে কি করে—

পাতিরাম ইহার পর কথাটার জের ধরিয়া বলিল, সে সব পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কোন লাভ নেই, মা নিজেই আমাকে সে কথা বলেছে—আপনিই তার সে ভাবনা ঘুচিয়ে দেন, আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া থেকে মাস মাস মাইনে যোগানো, জামা-কাপড়-জুতো, বই-খাতা কেনবার খরচপত্র সব নিজেই বহন করেন। কাউকে একথা জানতে দেন নি, আমার মাও কথাটা চেপে রাখেন কিন্তু মুখুজ্যে মশাই, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে যায় শেষে।

নীরবেই কথাগুলি শুনিতেছিলেন কর্তা। কিন্তু এখানে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া কর্তা বলিলেন, তোর কথা থেকে এইটেই মনে হচ্ছে—কথাটা জানাজানি হয়ে গেল; অর্থাৎ লোকে শুনল—সাতকড়ি মুখুজ্যে দ্রৌপদীর ছেলের পড়াশোনার ভার নিয়েছে। ভদ্রলোকের ছেলেদের মত সে সেজেগুজে স্কুলে যাচ্ছে, পড়াশোনা করছে—এই তো? এতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি?

বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই পাতিরাম এখানে বলিল, তা হলে বলি শুনুন মুখুজ্যে মশাই, যেই কথাটা আমার কানে উঠল, অর্থাৎ আমার মা নিজেই আমাকে যেদিন একটু কড়া মেজাজে জানিয়ে দিলেন—স্কুলে যে মুখুজ্যে-বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে আমি সমান চালে চলি, বামুন বলে সমীহ করি নে, তাদের দৌলতেই আমার এই পড়াশোনা···তখনই মাকে বলেছিলাম—এ কথা আমাকে আগে বল নি কেন, তা হলে আমি বাবুদের স্কুলে যেতাম না, জামা জুতো কাপড় পড়তাম না। বেশ, পড়াশোনায় আজ থেকে ইস্তফা দিলাম।

কর্তা নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনিতেছিলেন; এই সময় তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথা শুধু বাহির হইল, বটে!

তেমনই উত্তেজিত ভাবে ও তীক্ষ্ণস্বরে পাতিরাম একথার পর কহিল, সেই দিনই ইস্কুলের পাট তুলে দিয়ে তার সাথী বই সিলেট খাতা জামা-কাপড় প্যাণ্ট জুতো মোজা সমস্তই আগুন জেলে পুড়িয়ে ফেলি; তার পর—নিজের চেষ্টায়, নিজের উপার্জনের পয়সায় নিজেই মাথা খেলিয়ে যে কাজ চালিয়ে টাকা পয়সা করেছি—তার সঙ্গে আপনার পয়সায় এখানকার ইস্কুলে পড়া বিদ্যের কোন সম্বন্ধই নেই।

উভয় পার্শ্বের মোটামোটা তাকিয়া দুইটি অবলম্বন করিয়া কর্তা আরও একটু সোজা হইয়া বসিলেন, সেই সঙ্গে মুখখানিও রীতিমত গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তোর মা ক্রুপ এখনও বেঁচে আছে; বাড়ি গিয়ে তাকে এক বার জিজ্ঞাসা করবি—আমার দেওয়া বইখাতা জ্বালিয়ে দিয়েছিস, এগুলো থেকে যে বিদ্যে শিখেছিলি হজম করে ফেলেছিস্, তার পর নিজেই লায়েক হয়ে দেদার পয়সা কামিয়েছিস্ বললি না—কিন্তু কার দয়া-দৌলতে এটা হল, সে কথা জেনেছিস্? শুধু তুই কেন, তোর তিন পুরুষের কথা তুলে সে শুনিয়ে দেবে—দায়ে-ঘায়ে সবরকমে কে তাদের রক্ষা করেছিল।

কর্তার কথার পিঠে পাতিরামও চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, বিনা স্বার্থে কেউ

কাউকে রক্ষা করে না, দায়ে-ঘায়েও তাকিয়ে দেখে না মুখুজ্যে মশাই! তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটেছে—উদয়াস্তকাল আপনার কাজ করেছে, তাই আপনিও তাদের দেখেছেন, অমনি কিছু করেন নি।

উদ্ধত ক্রোধ সবলে দমন করিয়া অতঃপর কর্তা একটু স্নেহের সুরে বলিলেন, ও! মনগড়া হিসেবও একটা করে ফেলেছিস্ দেখছি! এখন আমি একটা হিসেবের কথা বলছি, শুনে রাখ্—পরে কাজে লাগবে। সিমলের সাতুবাবু লাটুবাবুদের নাম শুনেছিস্ তো! তাদের বাবা রামদুলাল সরকার তখনকার মস্ত ধনী মদন দত্তের সেরেস্তায় দশ টাকা মাইনের চাকরি করতেন। পরে তিনি নিজে ব্যবসায় ফেঁদে কোটিপতি হন। কিন্তু বাংলা মাস কাবার হলেই তার পর দিন আধময়লা একখানা ধুতি পরে পায়ে হেঁটে দত্তদের সেরেস্তায় গিয়ে মাসিক বরাদ্দ দশটি টাকা হাত পেতে নিতেন। বলতেন—এখানকার অন্নে ও অর্থে দেহ পুষ্ট হয়েছিল বলেই না পরে ভাগ্যদেবীকে ধরবার মত শক্তি পাই! বাইরে আমি যাই হই না কেন, এখানে আমি দশ টাকা মাইনের চাকর, আর দত্তবাবুরা আমার মনিব। এই মূলধনটুকু ধরে রেখেছিলেন বলেই, রামদুলাল সরকার সারা কলকাতার মধ্যে সেরা ধনী হতে পেরেছিলেন। সাহেবরা পর্যন্ত তাঁকে ইণ্ডিয়ার রথচাইল্ড বলে সম্মান করতেন। বাড়ি গিয়ে আমার এই কথাটা ভাল করে তলিয়ে ভাবিস, ভুল ভেঙে যাবে।

এমন একটা দৃষ্টান্তও পাতিরামের মনের ঔদ্ধত্য দমন করিতে পারিল না, তিক্ত-কণ্ঠেই সে শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান পুরুষটির কথার উত্তর দিল, ভুল আমি করি না মুখুজ্যে মশাই, শুধু একটা ভুলই নিজের গাফিলতির জন্য হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে—উপায় করবার মুখেই আপনার দেনাটা উসুল না করে সুদে বাড়তে দেওয়া। অনেক কথা হয়েছে, আর বাড়িয়ে কাজ নেই, এখন আমাদের দেনাটা উসুল করে নিষ্কৃতি দিন এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

স্থির ও সংযত কণ্ঠে কর্তা কহিলেন, তা হলে রামদুলাল সরকারের যে আখ্যানটা বললাম, সে বৃথাই হল! তাঁর মনিব আমার চেয়েও অনেক বেশী দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়েছিলেন, রামদুলাল কিন্তু লায়েক হয়ে মনিবের দয়াদাক্ষিণ্য বা কর্তব্যকে ঋণের খাতে ফেলে টাকা দিয়ে উসুল করতে এগিয়ে যান নি, বরং মাসে মাসে বরাদ্দ মাইনের টাকা হাত পেতে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যেহেতু, মনিবদের ধাতুটা তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল।

বিতর্কের সুরেই পাতিরাম কহিল, কিন্তু মুখুজ্যে মশাই, তাঁর ধাতুর সঙ্গে

আমার ধাতুর একটুও মিল নেই। আমি তাঁর মত মহাপুরুষও নই, আমি সাধারণ মানুষ। আমার কথা হচ্ছে—আজকের দুনিয়ায় সবাই সমান, এখানে মনিব বলে আমি কাউকে মানতে চাই না, তাই বাপ-পিতামহের মনিবানাটা চুকিয়ে দেবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছি। আমি কিন্তু একে ঋণ বলেই সাব্যস্ত করেছি।

অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কর্তা এইবার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে কহিলেন, কি সাব্যস্ত তুমি করেছ পাতিরাম, তোমার হিসেবের দৌড়টা জানতে পারি?

তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ভাঁজ করা চেক-বইখানা বাহির করিয়া পাতিরাম কহিল, ব্যাঙ্কে কারেণ্ট একাউণ্টে আমার এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা জমা আছে। আপনার কাছ থেকে দেনার হিসাবটা জানতে পারলেই—

ধীর স্থির কণ্ঠে গৃহস্বামী বলিলেন, যদি আমি ঐ টাকাটা সবই দাবি করি?

অম্লানবদনে পাতিরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল, বেশ, করুন, বলুন—ঐ টাকা-গুলো পেলেই আপনার ঋণ শোধ হবে, আমার ঋণের রেখাগুলোও মুছে যাবে। নিজের মুখে বলুন আপনি—এখনই চেক লিখে দিচ্ছি।

পাতিরামের মুখের এই কথাগুলি শুনিতে শুনিতেই স্থবির পুরুষসিংহের মুখভাব পরিবর্তিত হইতেছিল। শেষের কথাটিও নিবিষ্টমনে শুনিয়া তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ-ভাবে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন, সাবাস! বহুৎ—খুব সাহস তোর, টাকা দিয়ে আমাকে দাবাতে চাস্! বয়স আমার আশী পেরিয়ে গেছে; অনেক রকমের মানুষ আমি দেখেছি। তাদের আকৃতি আর প্রকৃতির মধ্যে বিস্তর ফারাক দেখে আমি সৃষ্টিকর্তার তারিফ করেছি। কিন্তু এখন না মেনে পারছি নে, আমার চোখে-দেখা সেই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তুই এমন এক অদ্ভুত সৃষ্টি, বুঝি নিজেই পয়দা হয়েছিস্। এমনটি আর দেখি নি। মহা-ভারতের মুষলের মত, আকাশের ধূমকেতুর মতই তুই স্বয়ম্ভু!

মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সেই বিকৃত মুখে তীক্ষ্ণ একটা হাসির আভা ফুটাইয়া পাতিরাম কহিল, সাবাস্ মুখুজ্যে মশাই! পাতিরাম পাকড়ের চোখেও আপনার আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে—আপনার মুখের ঐ স্পষ্ট কথা থেকেই। আমি জানি হাত পেতে আপনি আমার উপার্জনের টাকা নেবেন না—নিতে পারেন না। তা হলে যে আপনার ইজ্জতে দাগ পড়বে। কিন্তু আপনি না নিলেও আমার দেওয়া হয়ে গেছে। আমি এখন খালাস! হ্যাঁ, তবে বলে যাচ্ছি—আপনার ছেলেপুলে বা বংশধরদের কেউ যদি কোন দিন প্রার্থী হয়ে হাত পাতে এই পাতিরাম পাকড়ের কাছে, সে তাদের বিমুখ করবে না…

একটা অসহ্য জ্বালা অনুভব করিয়া বর্ষীয়ান গৃহস্বামী সাতকড়ি মুখুজ্যে মহাশয় আর্তনাদ করিয়া উঠলেন, ও! ও! ওরে···ওরে···

বক্তব্য কথাটা শেষ হইবার আগেই তিনি শয্যায় একটা তাকিয়ার উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

পার্শ্বের ঘরে বসিয়া বধূ নিভা উভয় পক্ষের কথাই শুনিতেছিল। পাতিরামের মুখ দিয়া শেষের দিকের কথাগুলি নির্গত হইতেই তিনি সবেগে উঠিয়া কক্ষদ্বার অতিক্রম করিলেন। ঘরের সামনে অলিন্দে তখন সেরেস্তার কর্মচারীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এভাবে বধূকে বাহির হইতে দেখিয়া এবং কর্তার আর্তস্বর শুনিয়া তাহারা বুঝি হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বধূ লজ্জা সঙ্কোচ কাটাইয়া জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে তাহাদের পানে চাহিয়া কহিল, এখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কি তামাশা দেখছেন আপনারা—ঐ ইতর জানোয়ারটার ঘাড় ধরে বের করে দেবার সাহস কারও হয় নি?

চাপাগলায় গুঞ্জন উঠিল, বউরাণী মা—বউরাণী মা—

বধূর উগ্র কণ্ঠের স্বরের সহিত কর্মচারীদের গুঞ্জন পাতিরামের দুই কানে জ্বলন্ত লৌহশলাকার মত প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বধূ নিভা দেবী কর্তার কক্ষে প্রবেশ করিল। পাতিরাম তাহার উদ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেই পরস্পর চোখাচোখি হইয়া গেল। সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির একটা ঝলকে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকটির উভয় চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়া বধূ বিদ্যুদ্বেগে ফরাসের উপর আচ্ছন্ন ভাবে অর্ধ-শায়িত শ্বশুরের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। হঠাৎ উত্তেজিত হইলে কর্তা এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন এবং সে অবস্থায় একটা দ্রাবক পদার্থ দ্বারা বধূ অবসন্ন কর্তার বক্ষদেশ মালিশ করিয়া দিত, ফলে কিছুক্ষণ পরে তিনি পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতেন।

আকস্মিক এই ঘটনায় পাতিরামও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। বাহিরের দণ্ডায়মান কর্মচারীদের প্রতি বধূর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে শুনিয়াও সে স্থান ত্যাগ করে নাই; যেহেতু, তাহার ধারণা, এ বাড়ির বধূর এরূপ অশিষ্ট উক্তি যখন সে শুনিয়াছে, ইহার একটা উপযুক্ত উত্তরও তাহাকে শুনাইয়া দিয়া তবে এ কক্ষ হইতে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে, নতুবা তাহার মর্যাদা থাকে না।

এদিকে শ্বশুরের পরিচর্যা-রত অবস্থাতেও বধূ দুর্দমনীয় ক্রোধে তখনও ফুলিতেছিল। আগন্তুক লোকটাকে তখনও নির্লজ্জের মত কক্ষ মধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া বধূ আর এক বার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিল,

তুমিই নিকিরিপাড়ার পাতিরাম পাকড়ে? মাছের কারবারে টাকা কামাবার গরবে তোমার সাত পুরুষের মনিবের সামনে এই মূলধন নিয়ে তুমি বোঝাপড়া করতে এসেছিলে? কিন্তু তোমার কথা শুনে আমি বুঝেছি—তুমি দেউলে হয়ে এখানে এসেছ। তোমাকে ভয় করবার আমাদের কিছু নেই। এখন যেতে পার।

বধূর মুখ হইতে এইভাবেই উত্তর পাইবে, পাতিরাম তাহা ভাবে নাই। সে তৎক্ষণাৎ সে তীব্র বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছিল। সেই অবস্থায় সে বধূকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বেশ, বেশ, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজকের এই কথাটা বউ-ঠাকরুন কগজে কলমে লিখে রাখবেন তা হলে।

দৃঢ়স্বরে বধূ কহিল, লিখতে হবে না, মনে থাকবে। তুমি এখন যেতে পার—তোমার মত কালসাপের নিশ্বাসে এঘরের বাতাস পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

বিকৃতকণ্ঠে পাতিরাম কহিল, কালসাপ! ভাল, ভাল, বউ-ঠাকরুনের একথাটাও আমার মনে থাকবে। আচ্ছা, আমি চললাম।

মুহ্যমান অবস্থায় শয্যাশায়ী গৃহস্বামীর কানে এই সংলাপের কিছু কিছু অংশ প্রবেশ করিতেছিল মাত্র। কিন্তু তখন তাঁহার বাক্‌শক্তির সামর্থ্য ছিল না যে তাহাতে যোগ দেন বা অন্তর্নিহিত বিক্ষোভ ব্যক্ত করিয়া আর একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি করেন।

সে দিন অপরাহ্ণে আপিস হইতে বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই রাধানাথ পাতিরাম সংক্রান্ত ব্যাপারটির কথা সব শুনিল। এ অবস্থায় তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া সেরেস্তার কর্মচারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনারা সে সময় কোথায় ছিলেন শুনি? না বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ ছিল না? রাস্কেলটাকে জুতিয়ে শায়েস্তা করতে পারলেন না কেউ?

এই সঙ্গে সহধর্মিণী নিভার প্রতিও কটাক্ষ করিয়া কহিল, মেয়েমানুষ কর্তা হলেই এমনি হয়।

কিন্তু প্রধান সেরেস্তাদার মহেশ শ্রীমানী একথা শুনিয়া রাধানাথের কাছে আসিয়া কহিল, অমন কথা বলবেন না দাদাবাবু, বৌমাই সে সময় পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে কর্তাকে ঠাণ্ডা করেন, তার পর তিনি যে কথা শুনিয়ে দিয়েছেন ঐ অসভ্য লোকটাকে, জুতোর মারের চেয়ে সে আরও কড়া।

সেই দিন হইতে সাতকড়ি মুখুজ্যে মহাশয়ের চিকিৎসা ও পরিচর্যা অন্দর-

সহজে শয্যাগৃহেই চলিতে থাকে। অধিকাংশ সময়ই বধূকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হয়।

বধূর ইচ্ছা, শ্বশুর বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন, এ-সম্পর্কে ডাক্তারদের নির্দেশ শুনাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু বর্ষীয়ান গৃহস্বামী এই সব নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার জীবনের এই শেষ অধ্যায়ে বধূকে বিষয়সম্পত্তি রক্ষা সম্পর্কেই পরামর্শ দিতে চান। প্রায়ই নিজেকে সংযত করিয়া এবং বধূকে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া জ্ঞাতব্য কথাগুলি মন্ত্রের মত শুনিতে বাধ্য করেন। এই অবস্থায় বলেন, জানো বৌমা, ঐ পাতিরাম ছোকরা আমার ভুল ভেঙে দিয়ে গেছে, আমাদের এই আভিজাত্যের আড়ালে পতনের যে পথ আছে, সেটা জানিয়ে দিয়ে গেছে। ও ছোকরাকে অসভ্য বেয়াদপ দাম্ভিক যাই বলি না কেন, ওগুলোর ভিতর দিয়েই ওর আসল রূপটা ধরা দিয়েছে। তার কতকটা তুমিও চিনেছ মা, কিন্তু আর কেউ—আমার সেরেস্তার লোকজন, আমার বড় বড় কর্মচারীরা কেউ ওকে চেনে নি, চিনবে না। বেশী কি বলব— রাধুও জানতে পারে নি ও ছোকরা কি চীজ! তাই মা, এই শেষ জীবনে, যখন ওপার থেকে ডাক আসছে, সেই সময় আমাকেও ভাবতে হচ্ছে।

বধূ জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও ভাবছেন বাবা?

কর্তা বলিলেন, হ্যাঁ মা, ইংরেজ সরকারের কালেকটার সাহেবকেও আমি গ্রাহ্য করি নি, তার হুমকিতে ভয় পাই নি, কিন্তু ঐ পাকড়ে ছোকরা সে দিন তার ঝাঁঝালো কথাগুলোর ভিতর দিয়ে যে ধারালো চেহারাখানা দেখাল আমাকে সেটা মনে পড়লে এখনও শিউরে উঠি। হ্যাঁ মা, শোন—ও যা বলে গেছে, সেটা দেখাবার জন্য ও পিশাচ সেজে নরকে নামতেও কুণ্ঠিত হবে না। আমার ভয় শুধু রাধুকে···ওর সঙ্গে টক্কর দিতে গেলে···ও! সে কথা ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছে! এদিকে আমারও দিন ঘনিয়ে আসছে, হ্যাঁ, তবে একটা উপায়, একটা পথ, সে তুমি।

লজ্জানম্রস্বরে নিভা বলিল, আমি তো এ-বাড়ির বউ, আমার সব দিকেই গণ্ডি দেওয়া, আমি কি করতে পারি বাবা!

দৃঢ় স্বরে কর্তা বলিলেন, তুমিই পারবে, তুমিই পারবে, প্রয়োজন হলে ঐ গণ্ডি ভেঙে দিতে হবে। রাধু আমার ছেলে হলেও আসলে অক্ষম, অপদার্থ! ওর হাতে এ সম্পত্তি যদি পড়ে, তার পর ঐ কালসাপ যদি ফনা তুলে ধরে, তা হলে···তা হলে···আমি দেখতে পাচ্ছি তার নিশ্বাসে সব পুড়ে যাবে। রাধু

ঠেকাতে পারবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, য়্যাটর্নীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমাকেই আমার সমস্ত সম্পত্তির পরিচালিকা করে যাব···তুমিই এ সম্পত্তি চালাবে, তুমিই আমার বংশের মুখ রাখবে।

উচ্ছ্বসিত স্বরে নিভা বলিয়া উঠিল, বাবা! বাবা!···

রাধানাথও এই সময় অফিস হইতে ফিরিয়া পিতার কক্ষে আসিতেছিল। অলিন্দ হইতেই পিতার কথাগুলি সে শুনিল, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজের কাজে ফিরিয়া গেল।

বধূ নিভা পরক্ষণে বিহ্বলভাব কাটাইয়া শ্বশুরকে অনুরোধ করিল, বাবা, বিষয়সম্পত্তি সবই সুখ আর শান্তির জন্য। পুরুষানুক্রমে বিষয়সম্পত্তি পরিচালনার যে ব্যবস্থা আছে, আপনি তার ব্যতিক্রম করবেন না। আপনার ছেলের মেজাজ তো জানেন! আমার কর্তৃত্ব তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। আপনি দয়া করে ও মত পরিবর্তন করুন। তবে আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করছি, আপনার বংশের মুখ ম্লান হতে দেব না। আপনার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছি, তার ওপর আপনার আশীর্বাদ সম্বল করে আমি এ বংশের গৌরব বজায় রাখব বাবা!

বধূর কথা শুনিয়া অগত্যা কর্তাকে আশ্বস্ত হইতে হয়, তিনি বধূর মস্তকে হাত খানি রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, তাই হোক মা, কুলদেবী তোমার সহায় হোন।

রাধানাথ তাহার শয্যাগৃহে ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত পদচারণা করিতেছিল। বধূ নিভাকে দেখিয়াই সে শুধাইল, কাজ গুছিয়ে এলে তো? বেশ, তা হলে আমার কি ব্যবস্থা করলেন বাবা? মাসোহারা দেবেন, না একটা পোস্ট খাড়া করে মাস মাস মাইনে—

নিভা বুঝিল, ও ঘরের কথাগুলি স্বামীর কর্ণগোচর হইয়াছে। নিশ্চয়ই শেষের কথাগুলি না শুনিয়া ফিরিয়া আসেন। এ অবস্থায় ধীরে ধীরে স্বামীর নিকটে আসিয়া নিভা বলিল, তুমি তো জান, কোন দিনই আমি ক্ষমতা চাই নি। বাবা যদি কিছু অন্যায় প্রস্তাব করে থাকেন, তাঁর বয়স আর ব্যাধির দিকে চেয়ে সেটা কি উপেক্ষা করা যায় না? হ্যাঁ, বাবার ভয়, পাছে তোমার হাতে পড়ে এ সম্পত্তি নষ্ট হয়, ঐ পাতিরাম পাকড়ে ঠকিয়ে নেয়। কিন্তু আমি বাবাকে আশ্বাস দিয়েছি, তিনি যেন ও মত পরিত্যাগ করেন—তাঁর বংশের মুখ কিছুতেই আমরা অবনত হতে দেব না। আমার কথা শুনে বাবাও মত পরিবর্তন করেছেন, তোমার ভয় নেই। এটা মনে রেখো, যতদিন বিধাতা এ-বাড়িতে আমার অন্নজলের ব্যবস্থা

করে রেখেছেন, স্বামী তুমি—তোমার হাতে তোলা দানেই আমি তুষ্ট থাকব। আমার নিজের বলতে কিছুই রাখতে চাই না, অবিশ্বাস হয়—এই নাও চাবির তাড়া, সিন্দুকপত্র সব খুলে টাকা গহনা দলিলপত্র পরীক্ষা করে দেখতে পার।

আঁচল হইতে রূপার শিকলে বাঁধা চাবির গুচ্ছ স্বামীর হাতে দিয়া নিভা নত হইয়া তাহার পদতলে মাথা নত করিল। পরক্ষণে উঠিয়া কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া বলিল, আমার একটা কথা কিন্তু তোমাকে রাখতে হবে।

রাধানাথ স্বপ্নেও ভাবে নাই যে পিতার আদরিণী বধূ—তাহার অভিমানিনী তেজস্বিনী স্ত্রী এভাবে তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। সেও অভিভূতের মত হইয়া বলিল, বল।

নিভা বলিল, তোমার প্রকৃতি আমি জানি। নিজের মতেই তুমি চলতে ভালবাস, কারও পরামর্শ···অন্ততঃ আমার—গ্রাহ্য কর না।

রাধানাথ বলিল, ঠিক ধরেছ, আমার স্বভাবের এটা বিশেষত্ব।

নিভা বলিল, কিন্তু নিজের ইচ্ছার তালে চলতে চলতে যদি কোন দিন হাঁফিয়ে পড়, চলবার শক্তি হারিয়ে ফেল, বল—সেদিন আমার কথা মনে করবে, আমার কাছে ধরা দেবে ?

রাধানাথ বলিল, ভগবান করুন, যেন সেদিন কখনও আমার জীবনে না আসে। আর একান্তই যদি তাই হয়, সেদিন—জীবনে সেই প্রথম আমি তোমার কথা শুনব, তোমার পরামর্শ নেব।

নিভা বলিল, না, শুধু তাই নয়, শুধু আমার কথা শোনা নয়, আমার পরামর্শ শোনা নয়, সেদিন সমস্ত ভার—সে যত বড় দুঃখের বা অনর্থের হোক না কেন, আমার উপর তুলে দিয়ে নীরব থাকবে।

রাধানাথ বলিল, বেশ, তাই হবে। আমি বুঝেছি তোমার কথা, তেমন দিন যদি আসে, আজ তুমি যেমন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করলে, সেদিন আমিও তোমার হাতেই আমাকে সমর্পণ করব, সেদিন আমার স্বত্ব স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না।

স্বামীর মুখে এই প্রতিশ্রুতি শুনিয়া নিভা পুনরায় নতমস্তকে স্বামীর যুগলপদে মাথাটি নত করিয়া দিল।

এই ঘটনার সাত দিন পরেই সমগ্র মহানগরীকে চমকিত করিয়া স্বনামধন্য মনীষী, টালার পুরুষসিংহ সাতকড়ি মুখুজ্যে মহাশয় পরলোকের পথে মহাপ্রস্থান

করিলেন। সকলেই বলিল—একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল।

পরিচিত মহলে একটা কানাঘুষা চলিতে থাকে যে, বিচক্ষণ সাতকড়িবাবু একমাত্র পুত্র রাধানাথকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার হাতেগড়া মনস্বিনী বধূ নিভা দেবীর উপরেই সমগ্র সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার দিয়া গিয়াছেন—এ-সম্পর্কে সংগোপনে দক্ষ আইনবিদ্‌দের দ্বারায় দলিল-পত্র সম্পাদিত হইয়াছে। রাধানাথের বন্ধু ও স্তাবকবৃন্দ এ সংবাদে বিমর্ষ হইয়া দিন প্রতীক্ষায় ছিল; আবার যাহারা এ বংশের প্রকৃত হিতার্থী, বধূ নিভা দেবীর নানাগুণের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার শ্রাদ্ধশান্তির পর হাইকোর্ট হইতে প্রবেট লইয়া রাধানাথ যখন রীতিমত ঘটা করিয়া বিভিন্ন কারবারগুলির সহিত সমগ্র এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিল, তাহার বন্ধু-মহলের আনন্দ দেখে কে! পক্ষান্তরে সত্যকার শুভানুধ্যায়ীরা হতাশ হইয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, যা শোনা গিয়েছিল, পালটে গেল! কর্তা অত বিচক্ষণ হয়ে কিন্তু কাজটা ভাল করে যান নি। রাধুর হাতে পড়লে এ সম্পত্তি রক্ষা পাবে না, ওর মোসাহেবরাই সব লুটেপুটে খাবে।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর রাধানাথের এই উত্তরাধিকারিত্ব লাভ আত্মীয়মহলে অধিকাংশেরই মনে অহেতুক একটা আশঙ্কার সৃষ্টি করে। নিভা দেবী আত্মীয়বর্গের সকলের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে স্বামীর পক্ষে ওকালতি করিয়াও তাঁহাদের তুষ্টিবিধানে অসমর্থ হন। নিভার সমক্ষেই তাহারা রাধানাথের দোষত্রুটিগুলির আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান যে, তাঁহাদের ধারণা মিথ্যা নয়। রাধুর প্রকৃতি তো তাঁহাদের অবিদিত নয়, মোসাহেবদের লইয়াই সে উন্মত্ত, তাহারাই রাধুর উপদেষ্টা, এখন মাথার উপর কেহ নাই, কাজেই রাধু এ সম্পত্তি রাখিতে পারিবে না।

অবশেষে বধূ নিভাকে কঠিন হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিতে হয় যে, তাঁহারা বিষয়-সম্পত্তির কি বোঝেন যে রাম না হইতে রামায়ণ গাহিতে শুরু করিয়াছেন। সবাই জানে, বাপের দোষগুণ পুত্রে বর্তাইয়া থাকে; জমিদারি বলুন, আর কারবারই বলুন, তাদের টাট বা গদির একটা গুণ আছে। নির্গুণ লোকও সেখানে বসিলে চালাবার শক্তি পান, স্বয়ং কুলপতি তাঁহার সহায় হন। উনি যখন মালিক হইয়া গদিতে বসিয়াছেন, কর্তার আশীর্বাদে ঠিকমত সব চালাইয়া যাইবেন। আপনারা ইহার জন্য বৃথা উদ্বিগ্ন হইবেন না।

বধূ নিভার কথা যেন জোঁকের মুখে নুনের ছিটা দেয়, অতঃপর মুখভার করিয়া

তাহারা নীরব থাকিতে বাধ্য হন, এবং নিজেরাই পরস্পর বলাবলি করিতে থাকেন—ঠিক কথা, আদার ব্যাপারীর মত তাহাদের পক্ষে জাহাজের খবর লইয়া যাতায়াতি করাই ভুল হইয়াছে।

॥ আট ॥

ওদিকে পাতিরাম পাকড়েও টালার সাতকড়ি মুখুজ্যের সুবিস্তীর্ণ ব্যবসায়ের সকল খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংগ্রহ করিতে থাকে। এ সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ ও উৎসাহ সেকালের তপোবন বর্ণিত ঋষিদের মতই বিস্ময়াবহ।

টালার মুখুজ্যে বাবুদের প্রতি তাহার একটা আক্রোশ বরাবরই অন্তর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই বাড়ির কর্তা সাতকড়ি মুখুজ্যের ঋণ পরিশোধ করিতে গিয়া তাহাকে সেদিন যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়, তাহাতে তাহার মনোবৃত্তি স্বার্থসিদ্ধি ও প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া আর একটি নূতন পথের অনুসরণ করে এবং সেই পথটি সে নিজেই গমনোপযোগী করিয়া লয়।

সেদিন মুখুজ্যে বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর শ্যামবাজারের পাঁচ মাথায় জুড়ি পৌঁছাইবা মাত্র পাতিরাম কোচোয়ানকে গাড়ি থামাইতে বাধ্য করে। সেইস্থানেই কোচোয়ান ও সহিসকে ভাড়ার সহিত বখশিশ চুকাইয়া দিয়া, গাড়ি হইতে নামিয়া এত দ্রুত পদে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয় যে, রাস্তার লোক তাকাইয়া তাকাইয়া তাহাকে দেখিতে থাকে। পাতিরামের মনে হয়, এভাবে টালার মুখুজ্যের সঙ্গে বোঝা-পড়া করিতে গিয়া সত্যই সে মস্ত একটা ভুল করিয়াছে। এখন এই ভুল তাহাকে শুধরাইতে হইবে, নতুবা তাহার নিষ্কৃতি নাই।

বাসায় ফিরিয়াই পাতিরাম তাহার পরনের মূল্যবান বসনভূষণগুলি টানা-হেঁচড়া করিয়া খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর আট হাতি একখানা আধময়লা ধুতি পরিয়া ততোধিক ময়লা বিছানাটির উপর ভেকভুক্ ঢোঁড়া সাপের মত কিছুক্ষণ নিথর ভাবে বসিয়া রহিল।

প্রভুর সাড়া পাইয়া ভৃত্য তুলসীরাম ছুটিয়া আসিতেই পাতিরাম হুঙ্কার দিয়া কহিল, এগুলো সব সরিয়ে নিয়ে যা আমার সামনে থেকে, খবরদার যেন আমার চোখের সামনে না পড়ে!

তুলসীরাম প্রভুর প্রকৃতি ভালভাবেই চিনিত। সে জানিত যে, তাহার প্রভু তাহার মত নেশায় চুর হইয়া থাকিত না এবং নেশা যদিও তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল, কিন্তু নেশা না করিয়াও তাহার মাতলামির অভিনয় তাহাকে ও তাহার নেশাখোর সহচরদিগকে প্রায়ই অবাক করিয়া দিত। অগত্যা তুলসীকে প্রশ্ন করিতে হইল, এই সব দামী দামী জামা কাপড় চাদর সোনার ঘড়ি চেইন আংটি কোথায় থোব ?

এবার বুঝি বোমা ফাটিয়া গেল। উত্তর আসিল, চুলোয়। বাগবাজারের গেলের জলে ফেলে দিয়ে আয়, না হয় দেশলাই জেলে পুড়িয়ে দে গে। যত সব পাজী বদমাশ নেশাখোর নচ্ছার নিয়ে আমার কাজ! হারামজাদাদের দেব এবার দূর করে।

যেমন প্রভু, তেমনি ভৃত্য। ইল্লির ধুপধুপুনি বিল্লির ঘাড়ে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল, মুখুজ্যে হুজুরদের সনে ঝামেলা বাঁধাতে গিয়েছিল, এখন নাজেহাল হয়ে ফিরে এসে আমাদের ওপর তম্বি হচ্ছে। মুখখানা প্যাচার মত করিয়া তুলসী ঝাঁঝাইয়া কহিল, এই দ্যাখ—ধান ভানতে বসে ভাঙা কুলো তুলসীর ওপরেই যত রোষ! এখন ওঠ দিকিনি, তেল মেখে গঙ্গাস্নান করে এসে ঠাণ্ডা হও, গায়ের জ্বালা ঘুচবে। আমারও যেমন দশা—আপন মনে গজ গজ করিতে সে ছাড়া কাপড়, জামা, চাদর, চেন, আংটি সব একটি একটি করিয়া কুড়াইয়া একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

পাতিরামের মা দ্রৌপদী ছুটিয়া আসিয়া শুধাইল, পাতু এসেছে তুলসী ?

তুলসী ভার মুখে বলিল, হ্যাঁ গো, এসেছেন। আজ মাথাগরম করে ফিরেছেন, তুমি যেন বাইরের ঘরমুখো হয়ো নি বাপু! নাইলে, খেলে আপনি ঠাণ্ডা হবে'খন। এগুলো সব সিন্দুকে তুলে রাখ, গুণে গুণে রাখ।

পাতিরাম তখন তাহার সেই লাল খেরো বাঁধা এক বিঘত চওড়া, দেড় বিঘত লম্বা ও দুই বিঘত পুরু সেই অপূর্ব খাতায় রোজনামচা লিখিতেছিল:

দেনদার—সাতকড়ি মুখুজ্যে, তার ওয়ারিসান রাধানাথ ও তার পত্নী নিভা ঠাকরুন, তার ঘর-বাড়ি, পুকুর-বাগান, বিষয়-আশয়, দোকানপাট, মানসম্ভ্রম, সর্বস্ব। এ সবের উচ্ছেদে দেনা শোধ হবে।

কিভাবে একাজ সফল হইবে, তাহারও এক ফিরিস্তি স্থির করিয়া ফেলিল পাতিরাম এবং এর পর দিনে দিনে চলিতে লাগিল তার প্রসাধন—নব নব পরিকল্পনার তুলিতে।

সাতকড়ি মুখুজ্যের মৃত্যুসংবাদ যেদিন পাতিরামের কর্ণগোচর হইল, সে তখন ক্ষিপ্তের মত তাহার পরিচিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লাল খেরো বাঁধানো সেই খাতাখানা বাহির করিয়া তাহার পৃষ্ঠায় লিখিল :

বৃদ্ধ শয়তান বেঁচে থেকে পাতিরামের হিম্মত দেখে যেতে পারলে না, বুড়ো মরে বেঁচে গেল—এমন করে আর কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে নি। যাক্, এখন তার ছেলে আর সেই বাচাল বৌটার পালা ; ওদের সঙ্গেই আমার বোঝা-পড়া।

কৃত্তিবাস কোলের লোহার কারবারের উপর ভিত রচনা করিয়াই পাতিরাম এই কারবারের এমন একটা শক্ত আস্তানা গড়িয়া তুলিল, বাহির হইতে তাহার বিশেষ কোন জলুস বা আড়ম্বর না থাকিলেও ভিতরে ভিতরে লৌহময় হইয়া উঠিয়াছিল। এত কাজের মধ্যেও পাতিরাম রাতের দিকে ঘণ্টা দুই সময় খবরের কাগজ পড়ায় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার প্রতি কাজটি যেমন হিসাবের দিক দিয়া বাঁধা ধরা, এই কাগজ পড়া কাজটিও তেমনি তাহার অসংখ্য কর্মধারার একটা অঙ্গ। প্রকাশিত খবরগুলির আগাগোড়া নিজের মনেই একটা ফয়সলা করিয়া নিত। ইউরোপ তখন বারুদের ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে, যে কোন মুহূর্তে একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের পরশে সেই বারুদস্তূপ জ্বলিয়া উঠিতে পারে। পাতিরাম মনে মনে স্থির করিয়াছে, ইউরোপে যুদ্ধ অনিবার্য, যুদ্ধ বাধিবেই।

অথচ এদেশের পণ্যের বাজার, বিশেষ করিয়া লোহালক্কড়ের দর যেন দিনে দিনে নামিয়াই চলিয়াছে। বড় বড় দোকানের লোহার বেচাকেনা প্রায় বন্ধ। হার্ডওয়ার মার্চেন্টরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। স্টকে যে সব মাল মজুত আছে, বাজার দরে তা বিক্রি করিতে গেলে পড়তায় পোষায় না, লোকসান খাইতে হয়। এমন কি, কেনা দরে মাল বেচিতে পারিলেও দায়গ্রস্ত ব্যবসায়ীমহল বুঝি বাঁচিয়া যায়।

গভীর রাতে খবরের কাগজে ছাপা খবরগুলির মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের খবরগুলির সহিত ভারতের লোহার নিম্নাভিমুখী দর দেখিয়া পাতিরাম আপন মনে বলে, লড়াই যদি বাধে তো বাধবেই—বড় জোর একটা বছরের ওয়াস্তা, কিন্তু তখন ? লড়াই বাধিলেই চাই লোহা। তবে ?

মাথার মধ্যে পাতিরাম একটা সঙ্কল্প দৃঢ় ভাবে পাকাইতে থাকে।

এদিকে ছোটখাটো হার্ডওয়ারী ব্যবসায়ীরা এ হেন মন্দার বাজারে পড়তা

মরেই গুদামের মাল সব পাচার করিবার জন্য মাতিয়া ওঠে। কিন্তু কিনিবে কে?

কিনিবার লোকও অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দিল। অতি সাধারণ ব্যাপারী, মেছোহাটায় মাছ বিক্রয় করিয়া কিছু কামাইয়াছিল, লোহার বাজারের সুনাম শুনিয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। কিন্তু মাছের ব্যাপারী লোহার ব্যাপারে আনাড়ী, তাই এই মন্দার বাজারে ব্যবসায়ীদের ইনভয়েস দেখিয়া কেনা দরে মজুত মাল কিনিতেছে। বেকুব আর কাহাকে বলে?

সুতরাং এইরূপ বেকুব ব্যক্তিকে তোয়াজ করিয়া ভবিষ্যতে বাজার দর উঠিবার প্রলোভন দেখাইয়া বুদ্ধিমান মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীরা দোকানের মজুত মাল বিক্রয় করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। হার্ডওয়ারবাজারে একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। কিন্তু বড় বড় ব্যবসায়ীরা তো আর যাচিয়া বা পড়তা দরে মাল বিক্রয়ের অপযশ লইয়া আগাইয়া আসিতে পারেন না, যদিও অনেকেই মনে মনে চুলবুল করিতেছিলেন।

পাতিরামও এই মাতব্বর ব্যবসায়ীদের মনোভাব বুঝিয়াছিল। ইহাদের উপরেই তাহার আক্রোশ অধিক, এখন কেমন করিয়া বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহুদিনসঞ্চিত প্রচুর মাল সংগ্রহ করিতে পারে, ইহাই হইল প্রধান চিন্তা।

এই চিন্তার ফলে হার্ডওয়ার অঞ্চলে আবির্ভূত হইলেন এক বাক্‌সিদ্ধ জ্যোতিবিদ, সাধুসমাজে তিনি ভৃগুরাজ নামে পরিচিত। তাঁহার চেহারা ও বেশভূষার চটক দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঘাড় পর্যন্ত লতানো চুল, দিব্য কার্লিং করা। গৈরিক বর্ণের রেশমী কাপড় পরনে, সেই বর্ণের পিরান ও চাদর, পদযুগলে মৃগচর্মের পাম্পশু। মুখে হাসিটুকু লাগিয়াই আছে। একটি মাসের মধ্যে ভৃগুরাজ অভিজাত ব্যবসায়ীমহলকে হাতের মুঠার মধ্যে আনিয়া ফেলিলেন। জাতকের হাতের রেখা দেখিয়া তিনি তাহার ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দেন। সকলেই উন্মুখ হইয়া থাকেন, কখন ভৃগুরাজ তাঁহার প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ধন্য করেন।

পারিষদবর্গের চেষ্টায় এক দিন রাধানাথবাবুর প্রতিষ্ঠানে ভৃগুরাজের আবির্ভাব হইল। ভৃগুরাজ রাধানাথের হস্তরেখা দেখিয়া সোল্লাসে বলিলেন—সি. আর. দাসের হাতেও এই রেখা ছিল। তার ফলে তিনি আঙুল ফুলে কলাগাছ হন।

রাধানাথ বলিল, দেখুন, আমাদের ব্যবসা তো যায় যায় অবস্থা। ঘরে যে মাল মজুত, পড়তার চেয়েও তার বাজার দর নেমে গেছে। এর ওপর মাস কয়েক আগে বিলেতে যে সব মালের অর্ডার দিয়েছিলাম, তার ইনভয়েস এসে

গেছে। ডিউ প্রায় লাখ টাকা। ও মাল ছাড়ালে লাভের দফা তো গয়া, বরং উলটে ঘর থেকে কিছু যাবে। এর কি অবস্থা হবে বলুন ?

করেখা বহুক্ষণ ধরিয়া বহুভাবে বিচার করিয়া ভৃগুরাজ বলিলেন, নীচের সঙ্গে আপনার একটা যোগাযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। সে লোক নীচ বংশের, আপনার প্রতি তার বিদ্বেষও যথেষ্ট। অথচ, এই করেখার প্রভাবে সেই লোকই আপনার ঐ ইনভয়েস কিছু লাভ দিয়েই কিনে নেবে। কিন্তু হুঁশিয়ার, কথাটা ফাঁস করবেন না !

রাধানাথও কথাটা শুনিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল, আরে মশাই, বিনা লাভে ইনভয়েসটা বেচতে পারলেই আমরা এখন বর্তে যাই, ওদের কাছে মানটা থাকে। আর আপনি বলছেন—কিছু লাভ দিয়ে···

ভৃগুরাজ বলিলেন, তিন দিন অপেক্ষা করুন।

কিন্তু তিন দিন অপেক্ষা করিতে হইল না, পর দিনই পাতিরাম পাকড়ের ফার্ম হইতে এক দালাল আসিয়া পাতিরামের ফার্মের নামে চারি হাজার টাকা লাভ দিয়া রাধানাথবাবুর ইনভয়েস কিনিয়া লইল। আপিসসুদ্ধ সবাই অবাক ! ভৃগুরাজের কি কথা !

ঘণ্টাখানেক পরে ভৃগুরাজের শুভাগমন হইতে তাঁহার খাতির দেখে কে ! রাধানাথ এক শ টাকার একখানা চেক কাটিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, আমার সামান্য প্রণামী।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে পাতিরামের সেই খোলার ঘরের বাসায় যখন ভৃগুরাজ উপস্থিত হইলেন, পাতিরাম সে সময় তাহার সেই লাল খেরো বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখিতেছিল, অর্জুন পণরক্ষার পথে শিখণ্ডীকে পাইয়াছিল, আমি পাইয়াছি ভৃগুরাজকে। এ আমারই সৃষ্টি।

ভৃগুরাজের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই পাতিরাম বলিল, এস ভৃগুরাজ, এই নাও তোমার ফী। এক শ টাকার এক শ খানি নোট গণিয়া নিয়া ভৃগুরাজের হাতে তুলিয়া দিল পাতিরাম।

সবিস্ময়ে ভৃগুরাজ বলিলেন, এ কি—দশ হাজার টাকা !

পাতিরাম গম্ভীর মুখে বলিল, হ্যাঁ, এই তোমার ফী। জানো তুমি, মুখুজ্যেদের লক্ষ্মীকে আমার ঘরে এনে দিয়েছ। ঐ লাখ টাকার মাল থেকে আমি অন্ততঃ দশ লাখ টাকা কামাব, অবিশ্যি তার দেরি আছে, এখন শুধু মজুত করব,

জমিয়ে রাখব, এর পর—

কথাটা শেষ না করেই পাতিরাম হো'হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

এই ভৃগুরাজকে সহায় করিয়া পাতিরাম তলে তলে যে ব্যাপার আরম্ভ করিল, সে এক অভূতপূর্ব রহস্যময় আখ্যান।

পাতিরাম যখন খবরের কাগজ পড়িয়া নিজের মনের সঙ্গে যুক্তি বিচার করিয়া যুদ্ধের তালে তালে লোহার বাজারের একটা অভাবনীয় উত্থানের পরিকল্পনা করিতেছে, মুখুজ্যে বাড়িতে নিরলস জীবনযাত্রার মধ্যে বধূ নিভাও তেমনি মনে মনে একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া হঠাৎ উল্লসিত হইয়া ওঠে।

সেইদিনই সে স্বামীকে বলিল, আমার একটা পরামর্শ শুনবে?

শুষ্ককণ্ঠে রাধানাথ বলিল, কী?

নিভা বলিল, দেখ, ইউরোপে যুদ্ধ বাধবেই, সেই সঙ্গে লোহার দর আগুন হয়ে উঠবে। শুনছি অনেকে দায়ে পড়ে মজুত মাল বিক্রি করছে, তুমি এই সুযোগে ঐ সব মাল কিনে স্টক কর, এর পর দর দেখবে—

মুখে বিদ্রূপের ভঙ্গি আনিয়া রাধানাথ বলিল, একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি। তোমার হাতে ব্যবসা পড়লেই হয়েছিল আর কি! সবাই এখন মজুত মাল পাচার করতে পাগল, আর তুমি বলছ স্টক করতে। জানো, লাখ টাকার ইনভয়েস এসেছে, চার হাজার টাকা লাভ নিয়ে সে ইনভয়েস আমি বেচে দিয়েছি।

নিভা বুঝি আকাশ হইতে আছাড় খাইয়া পড়িবার মত হইয়া বলিল, সে কি! নিজেদের ইনভয়েস তুমি বেচে দিয়েছ! বলছ কি? কাকে বেচেছ?

গম্ভীর মুখে রাধানাথ বলল, আবার কাকে—সেই বোকারাম পাতিরামকে, আমাদের ওপর টেক্কা দিতে হার্ডওয়ার মার্চেন্ট হয়ে বসেছেন! তাকেই বেচে দিয়েছি চার হাজার টাকা মুনাফায়।

কথাটা শুনিয়াই নিভার সমস্ত দেহ বুঝি অসহ্য এক বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। আর্তস্বরে সে বলিল, তুমি পাতিরাম পাকড়েকে মুখুজ্যে কোম্পানির ইনভয়েস বেচে দিয়েছ—হাতের লক্ষ্মী এভাবে পায়ে ঠেলেছ! এ কি সর্বনাশ তুমি করলে?

বিকৃত মুখে রুক্ষস্বরে রাধানাথ বলিল, খবরদার। প্রতিজ্ঞার কথা মনে কর, আমার ব্যবস্থার ওপর কোন কথা তুমি বলবে না, মনে নেই সে কথা।

অঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিভা বলিল, মনে ছিল না, আর বলব না, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই নিভা সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

॥ নয় ॥

সাত মাস পরের কথা। যুদ্ধের গতি তখন ভীতিপ্রদ হইয়া সমুদ্রপথে বিদেশীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। মালের চাহিদা সর্বত্র, আমদানি নাই। লোহালক্কড়, কাপড়, কাগজ, রঙ, ঔষধ প্রভৃতির বাজারে দরবৃদ্ধির অন্ত নাই। এ-বেলার হার ও-বেলায় দ্বিগুণ হইয়া সঞ্চয়ীর তহবিল নিত্যই স্ফীত করিতেছে। আবর্জনার স্তূপের মত যে সব লোহালক্কড় মরিচা ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল, যুদ্ধের মাহাত্ম্যে তাহাদের মর্যাদা উঠিয়াছে এত উঁচুতে, যাহা আরব্যরজনীর গল্পের মত চমকপ্রদ। ঠনঠনিয়ার পুরোনো লোহালক্কড়ের দোকানগুলির সম্মুখে লক্ষপতির গাড়ি সারি দিয়া দাঁড়াইতে দেখা যায়, দোকানদাররা চাহিদার অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য দেখিয়া মাটি খুঁড়িয়া বহুকালের পুরাতন পরিত্যক্ত মাল সংগ্রহ পূর্বক তাহাই সরবরাহ করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করে।

সাতটি মাসের মধ্যেই ব্যবসায় জগতের যে পরিবর্তন হইয়াছে, এমন কখনও দেখা যায় নাই। দেনার বোঝা ঘাড়ে করিয়া মালের বোঝা আঁকড়াইয়া যাহারা ধীর ভাবে বসিয়াছিল, তাহারা আজ লক্ষপতি। মুখার্জি কোম্পানিই ছিলেন এই অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী, বাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলির গৌরব, সঞ্চিত মালের পরিমাণ ও বিদেশ হইতে আমদানি মালের প্রাচুর্য এ অঞ্চলে তাঁহাদের অতুল প্রতিষ্ঠা প্রচার করিত। কিন্তু সমস্ত সঞ্চয় হস্তান্তর করিয়া—রেসের মাঠে লব্ধ অর্থের অধিকাংশ হারাইয়া তাহার দুর্ভাগ্য মালিক এই মহেন্দ্রক্ষণে অন্যান্যের ভাগ্যপরিবর্তনের নির্বাক দর্শক মাত্র।

সীতানাথ এখন পাতিরামের কর্মসচিব, প্রিয় পারিষদ ও তাহার গোয়েন্দা বিভাগের সর্দার। ভৃগুর বচন সন্তর্পণে বর্জন করিয়া সে এখন ক্লাইভ স্ট্রীটের মডার্ন ভগুদেবতার সাকরেদি ব্যাপারে তৎপর। সামনাসামনি দুইখানি কাষ্ঠময় হাতলদার কেদারা ও তাদের মধ্যস্থলে একখানি টুল রাখিয়া তাহার উপর অঙ্গ ঢালিয়া কলিকাতার হার্ডওয়ার বাজারের ভাগ্যবিধাতা একখানা অর্ধমলিন খাটো ধুতি পরিয়া নগ্নদেহে অপূর্ব ভঙ্গীতে ব্যবসায়ের খবরদারি করে এবং তাহারই অনতিদূরে তিন হাত পরিমিত খুপরির মধ্যে বসিয়া মন্ত্রীবর

নূতন প্রভুর দুইটি কর্ণে ও পদযুগলে একাধারে সংগৃহীত সমাচার ও তৈলাধার নিঃশেষ করিয়া দেয়।—এ অবস্থায় কোন দ্রব্যের চাহিদায় খরিদ্দার কেহ যদি আসে ও দরদস্তুর সম্বন্ধে কটাক্ষ করে, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার আর অবধি থাকে না। পুলিসের দারোগার কাছে সদ্যধৃত ঘটিচোরও বোধ হয় সেভাবে কথার রূঢ় প্রহার সহ্য করে না! আবার যে বুদ্ধিমান এই পীঠস্থানে প্রবেশ করিয়াই নগদবিদায় এজেন্সরি বিশ্বকর্মা হার্ডওয়ারির এই বিধাতার অতি প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হয়, তাহার খাতির তো অতিরিক্ত ভাবে হইবেই, উপরন্তু তাহার জন্য দরও হয় স্বতন্ত্র।

সমস্ত বাজারের পীন্ এইখানে সংগৃহীত, যে মাল সর্বত্র দুষ্প্রাপ্য এখানে তাহার রীতিমত প্রাচুর্য। সমগ্র মিল অঞ্চল এবং কলিকাতার বাজারে তখন চাহিদার কলরব—পীন্ পীন্। কিন্তু পীনের অক্ষয় ভাণ্ডার তাহার কুট বুদ্ধিমত্তায় কোন দিন নিঃশেষিত হয় না।—প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ পীন্ যেমন তাহার ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া চড়া দরে বিভিন্ন মিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, আবার তাহার অধিকাংশই নামমাত্র দরে তাহারই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করে!

গুদামে প্রচুর মাল মজুত সত্ত্বেও কতিপয় বিশেষ প্রয়োজনীয় মালের একটি মোটা রকমের 'অর্ডার' পাতিরাম বিলাতে পাঠাইয়াছিল এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যবলে সেই অর্ডার গৃহীত ও তাহা প্রেরিত হইবার সংবাদ ইতিমধ্যেই তাহার সমব্যবসায়ী মহলে ঈর্ষা ও বিস্ময়ের চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছে। ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় এই মালের জন্য তাহাকে পাঠাইতে হইয়াছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা; কিন্তু এই মালের উপর দালালরা তিন লক্ষ টাকা দর দিয়াছে! তথাপি পাতিরাম অটল। তাহার ধারণা, এই মালের দৌলতে সে হেলায় শ্রদ্ধীয় দশ লক্ষ টাকা লাভ করিবে।

সমব্যবসায়ীদের ভাগ্যপরিবর্তনই অবশেষে ভাগ্যান্বেষী রাধানাথবাবুর মোহ-জাল ছিন্ন করিয়া দিল। কিন্তু তখন তাহার সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের নামের প্রভাবটুকুই কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত বা ভুলের দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য শেষ অবস্থায় সে সর্বস্ব পণ করিয়া শেষ পরীক্ষায় নামিল। কলিকাতার জায়গা জমি ও বাড়ির দর তখন দিনের পর দিন বাড়িতেছিল। রাধানাথ অবশেষে সেই সুযোগটুকু লইয়া কলিকাতার বাড়ি এক মাড়োয়ারী ধনীর হাতে এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া পরিবারদের টালার বাড়িতে পাঠাইয়া দিল। অতঃ-

পর বাড়ির মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া এবং পরিবারবর্গের অলঙ্কারপত্র বন্ধক রাখিয়া সর্বসমেত দেড় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিল।

এই সঞ্চিত টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া কতকগুলি জরুরী মাল আনাইয়া শেষ ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বিলাতী 'কেবল' ভয়াবহ বার্তা আনিল—'সিটি অফ্ লিভার পুল' জলধিবক্ষে জার্মানীর সাবমেরিন কর্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজেই আসিতেছিল পাতিরামের অর্ডারী মাল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে দশ লক্ষ টাকা লাভের স্বপ্ন দেখিতেছিল! প্রচুর ব্যয় স্বীকার করিয়া সে সময় সকল কারবারীই 'ওয়াররিস্ক' ইনসিওর করাইয়া মাল আনাইতেছিল। কিন্তু পাতিরাম ইচ্ছা করিয়াই তাহা করে নাই। অনেকেই তাহাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিত, সতর্ক করিতে চাহিত, কিন্তু পাতিরাম দৃঢ়তার সহিত বলিত,—আমার মালের বিনাশ নেই, সুতরাং মালের পড়তার ওপর ওসব বাজে খরচ চাপানো বৃথা।

এ পর্যন্ত তাহার কথাই সার্থক হইয়াছে, সত্যই তাহার কোন মালই মারা পড়ে নাই এবং অন্যান্য আমদানি-কারকদের তুলনায় তাহার মালের পড়তা অনেক অল্প হওয়ায় সে সকলের অপেক্ষাই লাভবান হইয়াছে! অথচ তাহার মত এমন দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইতে আর কোন ব্যবসায়ীকেই দেখা যাইত না। বৃথাই তাহারা মনে মনে তাহাদিগের এই দুর্বার প্রতিযোগীটির প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। কিন্তু আজ এ কি অঘটন ঘটিয়া গেল! বিলাতী কেব্‌লের খবরে এই নিদারুণ ক্ষতির বেদনা অপেক্ষা তাহার সমব্যবসায়ীদিগের পরিহাসই তাহার পক্ষে অধিকতর মর্মন্তুদ হইল।

সীতানাথ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, উপায়?

ক্ষণিকের বিহ্বলতা হইতে সবলে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া পাতিরাম কহিল, উপায় আমাদের ধৈর্য, আর—

হাতের পাশেই টেবিলের উপর রক্ষিত ছোট হাত-বাক্সটি খুলিয়া বিলাতের ইনভয়েসটি দেখাইয়া কহিল, এক ঘণ্টার ভেতরেই এইটে বিক্রির ব্যবস্থা।

সঙ্গে সঙ্গে সীতানাথের কানের কাছে মুখখানা রাখিয়া পাতিরাম অস্ফুটস্বরে যে নির্দেশ দিল, তাহা শুনিয়া স্থিরভাবে ইন্‌ভয়েসখানি সন্তর্পণে লইয়া প্রভুর স্বার্থ সাধনে সীতানাথ দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

॥ দশ ॥

বহুদিন পরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সীতানাথকে দেখিয়া রাধানাথের মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাকে কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই সীতানাথ কহিল, আমি সেইমান নই মুখুজ্যে মশাই, এক দিন হয়তো আপনার ক্ষতির উপলক্ষ হয়েছিলাম, তাই আজ এসেছি সুদে আসলে সব উসুল করতে। পাতিরাম-পাকড়ের পাল্লায় পড়েছিলাম নিজের স্বার্থে নয়, আপনার জন্যই। এই ইন্‌ভয়েস এনেছি দেখুন। এক দিন যেমন চার হাজার টাকা মুনাফায় আপনি তাকে ইনভয়েস বেচেছিলেন, অনেক চেষ্টায় মাত্র চার হাজার টাকা বেশী নিয়ে তার প্রায়-এসে-পড়া-মালের এই ইনভয়েসখানা আপনাকে বিক্রি করতে তাকেও আজ রাজী করিয়েছি। এখুনি ব্যবস্থা করে ফেলুন, আপনার ক্ষতিটা উসুল হয়ে যাক্, আমিও নিশ্চিন্ত হই।

রাধানাথের দুই চক্ষু আর্দ্র হইয়া গেল। এই সীতানাথ ছিল এক দিন তাহার নিত্য সাথী, প্রিয়তম সহচর। পরে ঘটনাসূত্রে কত বড় অবিশ্বাসই ইহার সম্বন্ধে মনে মনে সে পোষণ করিয়াছে। অথচ, তাহার হিতের জন্য কি অপ্রত্যাশিত কার্য না আজ সে করিতে বসিয়াছে; হায় মানুষের মন!

কণ্ঠের স্বর অতঃপর গাঢ় করিয়া রাধানাথ কহিল, তুমি আমাকে মাপ কর সীতানাথ; কিন্তু ভাই, আমার কাছে মজুত আছে পুরোপুরি দেড় লাখ। এই টাকারই ড্রাফ্‌ট বিলেতে পাঠাবার কথা। এখনও যে পাঠানো হয় নি, হয় তো এই চান্সটা অদৃষ্টে রয়েছে বলেই।

সীতানাথ কহিল, নিশ্চয়ই, নইলে ঠিক সময়টিতে আমি আসব কেন বলুন, আর অত বড় হুঁশিয়ার মানুষটা নিতান্ত আহাম্মুকের মত আমার কথাটায় হঠাৎ রাজী হবেই বা কেন?

রাধানাথ দ্বিধাবিজড়িত কণ্ঠে কহিল, কিন্তু ব্যালেন্সটা—

তাহার মুখের এই কথাটা যেন লুফিয়া লইয়া সীতানাথ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নির্দেশ দিল, তাতে কি হয়েছে! টাকার জন্য রাধানাথ মুখুজ্যের কাজ আটকাবে না। ব্যালেন্স চল্লিশ হাজার, আর ঐ ইনভয়েসের ওপর মুনাফার চার হাজার—এই

চুয়াল্লিশ হাজারের একখানা 'অন ডিম্যাণ্ড আই প্রমিস টু পে' লিখে দিন আপনি।" তার পর মাল এলে, বিক্রি করে টাকাটা চুকিয়ে দেবেন তখন।

এই যুক্তিটা শুনিবামাত্র রাধানাথের মস্তিষ্কের ভিতর আভিজাত্যের অভিমান অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জলিয়া উঠিল এবং সেই আগুনের আলোকে অতীত ও ভবিষ্যতের বহু অবাঞ্ছিত চিত্র তাহার চক্ষুর উপর সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল। সে লিখিয়া দিবে পাতিরাম পাকড়ের নামে 'অন ডিম্যাণ্ড হ্যাণ্ডনোট'! চুলায় যাউক তাহার কারবার, লাভের মুখে পড়ুক ছাই,—পয়সাই কি দুনিয়ায় এত বড়? লোভে পড়িয়া সে আজ পিতৃপিতামহের নামে কলঙ্ক মাখাইয়া দিবে! তাহার পিতা এক দিন যাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে যে নির্দেশ তাহাকে জানাইয়া দেন, তাহাই সে আজ কালিকলমে আঁকিয়া প্রতিপন্ন করিবে এই লোকটির নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন সত্যই তাহার কর্মজীবনে উপস্থিত হইয়াছে। রাধানাথের মনে হইল, এইভাবে ইনভয়েস বিক্রয়ের মূলে নিশ্চয়ই পাতিরামের কোনও ক্রূর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে তখন সহসা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল, কি বললে, আমি লিখব হ্যাণ্ডনোট পাতিরাম পাকড়ের বরাবরে? কথাটা তুলতে তোমার মুখে আটকালো না সীতানাথ! কি তুমি আমাকে মনে করেছ শুনি?

সীতানাথ ভাবিয়াছিল তাহার শেষের প্রস্তাবটি রাধানাথের আরও প্রীতিপ্রদ হইবে এবং ইহাতে সে বর্তাইয়া যাইবে। এখন বুঝিল, জাতসাপ যতই নির্জীব হউক, ল্যাজে ঘা পড়িলেই ফোঁস করিয়া ওঠে, দংশন করিবার শক্তি না থাকিলেও 'চক্কর' তুলিতে দ্বিধা করে না। প্রস্তাবটা পাল্টাইয়া অন্যদিক দিয়া ঘুরাইয়া বলিবার জন্য সীতানাথ যেমন তাহার মুখটি খুলিবে, অমনিই ক্রীং ক্রীং শব্দে রাধানাথবাবুর সুদৃশ সেক্রেটারিয়েট টেবিল-সংলগ্ন টেলিফোনটি বাজিয়া উঠিল।

রিসিভারটি কানে লাগাইয়া রাধানাথবাবু কহিল, হ্যালো, কাকে চান?··· সীতানাথ শীল?···হ্যাঁ, আছে,·· তাকেই দিচ্ছি।

সচকিত ভাবে সীতানাথ জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার?

রাধানাথ কহিল, ধর, তোমাকেই কে ডাকছে। বোধ হয় তোমার মনিব পাকড়েই হবে।

সীতানাথের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতেছিল, তাহার মাত্রা বুঝি আরও বাড়িল, রাধানাথবাবুর হাত হইতে রিসিভারটা কম্পিত হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?···হ্যাঁ আমি সীতানাথ···না এখনও হয় নি, একটু গোল বেধেছে,

আচ্ছা এখুনি যাচ্ছি—

রিসিভারটি যথাস্থানে রাখিয়া সীতানাথ কহিল, বলেন কেন? ছোটলোকের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল। হুকুম হল, শীগগির এসো, কিছু বলবার আছে, ফোনে হবে না, এখানেই বলব!—আবার ছোটো। যাক্, আমি হ্যাণ্ডনোটের কথাটাও তুলে বলব, ওসব হবে-টবে না। আমি এলুম বলে!

কথার সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর হইতে বিলাতী ইনভয়েসখানি খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া সীতানাথ ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেল।

রাধানাথ ব্যাপারটার আগাগোড়া তলাইয়া বুঝিবার জন্য স্থির ভাবে মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে, এমন সময় সেই কক্ষে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল তাহার বাল্যসুহৃদ ও কর্মক্ষেত্রের সহযোগী কৃত্তিবাস কোলে। আজ তাহার সাজসজ্জা ইউরোপীয়ের মত, মাথায় সোলার হ্যাট, মনিবন্ধে রিস্টওয়াচ, চোখে চশমা, মুখে হাভানার মোটা চুরুট, হাতে ছড়ি।

টুপিটি খুলিয়া ইউরোপীয় কায়দায় অঙ্গভঙ্গী করিয়া কৃত্তিবাস কহিল, হ্যাল্লো মিস্টার মুখার্জ্জী, গুড ইভনিং—হা ডু-ডু-ডু—

রাধানাথ প্রথমে চিনিতেই পারে নাই লোকটা কে, কিন্তু বেপরোয়া ভাবে তাহাকে একেবারে পাশের চেয়ারখানায় বসিতে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে কহিল, কৃত্তি—তুমি! বেশ যাহোক, খুব লোক তো তুমি?

চুরুটটায় একটা টান দিয়া কৃত্তিবাস কহিল, একথা তুমি এক শ বার বলতে পারো, আর, এটা শোনবার জন্য আমি তৈরী হয়েই এসেছি। যদিও পিঠে কুলো বেঁধে আসি নি। কিন্তু আমার গত কটা বছরের ডেস্‌প্যারেট য়্যাডভেঞ্চার শুনলে তুমি নিশ্চয়ই অতীতের সব কথাই ভুলে যাবে, এমন কি সাত-খুন পর্যন্ত মাপ করবে—এ ভরসা আমার আছে।

রাধানাথ মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, আমাকে ভাঁওতা দিয়ে কারবারটা পাকড়েকে বেচে দিলে। টাকাগুলো নিজেই সব নিয়ে একেবারে গায়েব হলে, আমার পাওনা-গণ্ডা একটা পয়সাও দিলে না—

কৃত্তি কহিল, ইয়েস, আই য়্যাডমিট্, বাট—

রাধানাথ এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কৃত্তির মৃদু কণ্ঠের বক্তব্যটুকু ভাসাইয়া দিয়া কহিল, আমার পাওনা ক'হাজার টাকার জন্য আমি থোড়াই পরোয়া করি! কিন্তু জানো, কত বড় সর্বনাশ তুমি করেছ—ঐ ইতরটাকে ক্লাইভ স্ট্রীটের রাস্তা দেখিয়ে হার্ডওয়্যারী মার্কেটের সুলুক সন্ধান দিয়ে! ওর মাছের বাজারে তুমি তো

ঢুকতে গিয়েছিলে, কিন্তু সেখানে আঁশ বঁটির জলে নাকানি-চোবানি খাইয়ে তোমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে, আর তুমি এমনি আহাম্মুখ যে তাকেই সর্বস্ব সঁপে দিয়ে সড়ে পড়লে। মেছো হাটার সেই ভোঁদড়টা আজ হার্ডওয়ার মার্কেটের কুমীর হয়ে বসেছে।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কৃত্তিবাস মৃদু হাসিয়া কহিল, জানি। যদিও সেই থেকে টুরে বেরিয়েছিলুম এবং হপ্তাখানেক হল ফিরেছি, কিন্তু এসেই কলকাতা মার্কেটের সমস্ত খবরই নখদর্পণে ছকে নিয়েছি। তা ছাড়া তোমার জন্যই এত সব খবর আর সুযোগ সংগ্রহ করে এনেছি, যাতে তোমার সব ক্ষতিই উসুল হয়ে যাবে, আর ডুবু ডুবু জাহাজখানা ফের ডুবুরীর মত ভুস্ করে ভেসে উঠবে। হতাশ হয়ো না বন্ধু, don't be afraid, আমি সবই বুঝেছি, অনুভব করছি, the wearer only knows where the shoe pinches.

রাধানাথ এবার সহজকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কোথায় ছিলে এতদিন?

কৃত্তিবাস কহিল, সে একটা ইতিহাস, বলতে সময় লাগবে, ধীরে সুস্থে অন্য সময় বলব। শুধু সংক্ষেপেই মোটামুটি হিসেবটা দিচ্ছি—মেসোপটেমিয়া থেকে বিলেত, মায় ফ্রান্স পর্যন্ত টুর করে এসেছি এই কটা বছরে—

বিস্ময়ের স্বরে রাধানাথ কহিল, বল কি? ইউরোপ ঘুরে এসেছ?

কৃত্তিবাস কহিল,—শুধুই ঘুরে আসি নি, অনেক অভিজ্ঞতা এবং হার্ডওয়ারী বিজনেসের হাড়হদ্দ অর্থাৎ গোপন রহস্য সমস্তই সংগ্রহ করে ফিরেছি। ফের চুটিয়ে কারবার করছি।

—ক্যাপিট্যাল? সেটাও নিশ্চয় সংগ্রহ করে এনেছ?

—না। নিজের পয়সা বার করে এ যুগে যারা ব্যবসা ফাঁদে তারা আমার ভাষায় আহাম্মুক। পরের পয়সা বার করে নিজের পকেট ভারী করাই হচ্ছে আসল কারবার। তার ফন্দি আমি আবিষ্কার করেছি, বুঝলে?

—কিন্তু কার পকেট মেরে নিজের পকেট ভরবার সংকল্প করেছ শুনি?

—আপাততঃ আমাদের বাল্যবন্ধু পাকড়ের। মূলধনটা তার কাছ থেকেই আদায় করব ভেবেছি। তার পর, যার শিল যার নোড়া—তারই ভাঙবো দাঁতের গোড়া।

—পাকড়ের সঙ্গে তা হলে দেখা করেই আসছ?

—না। এখনও সে মুখো হই নি। প্রথমে তার কাছেই যাব ভেবেছিলুম, কিন্তু সেটা আপাততঃ মুলতুবী রেখে তোমার কাছেই এসেছি। পাকড়ের সঙ্গে

তোমার কোন যোগাযোগ আছে ?

রাধানাথ কহিল, ঠিক ডাইরেক্ট নয়, ঘুরিয়ে ; অর্থাৎ মধ্যস্থ দিয়ে। সেই মধ্যস্থটি এই একটু আগে একটা 'দাঁও' নিয়ে এসেছিল।

কৃত্তিবাস কহিল, বটে। তা দাঁওটা মেরেছ নিশ্চয়ই ?

রাধানাথ কহিল,—না, বাধা পড়ে গেল হঠাৎ। ব্যাপারটা হচ্ছে—একটা মোটা টাকার চালান তার বিলেত থেকে আসছে 'সিটি অফ লিভারপুল' জাহাজে—

—কি জাহাজ বললে ?

—'সিটি অফ্ লিভারপুল' !—ব্যাটল্‌ফিল্ডের গোলার আওয়াজ শুনে শ্রবণ-শক্তিটাও দুর্বল হয়েছে নাকি হে ?

কৃত্তিবাস মনের চাঞ্চল্য দমন করিয়া কহিল, না, তা হলে কথাটা খপ্ করে ধরতুম না ! আচ্ছা তোমার কথাটাই আগে শেষ কর।

রাধানাথ কহিল, মালটা যে আসছে, সেটা বাজারসুদ্ধ সবাই জানে। আর ঐ মাল বেচে পাকড়ে যে মোটা রকমের একটা দাঁও মারবে, তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই। চার হাজার টাকা মুনাফা নিয়ে মালের ইনভয়েসটা আমাকে বেচবার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কিন্তু একটা কথায় আমার মেজাজটা হঠাৎ বিগড়ে গেল, আর সেটা কেনা হল না।

কৃত্তিবাস এবার গম্ভীর হইয়া কহিল, একটা সাংঘাতিক বুলেট তা হলে তোমার রগ ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে বল। দেখছি, সত্যিই এবার তোমার জিতের পালা রাধু !

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে, রাধানাথ কহিল, এ কথার মানে ?

সহজকণ্ঠেই কৃত্তিবাস উত্তর দিল, 'সিটি অফ্ লিভারপুল' জার্মানীর গোলায় মহাসাগরের বুকে তলিয়ে গেছে ; পাকড়ের মালগুলোরও সেই সঙ্গে সলিল সমাধি হয়েছে।

রাধানাথের মনে হইল, সিটি অফ্ লিভারপুলের সহিত সেও বুঝি জলধিতলে তলাইয়া যাইতেছিল, সহসা কে যেন তাহাকে জলের উপরে তুলিয়া দিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সে কহিল, তুমি ঠিক শুনেছ ? খবর সত্য ?

কৃত্তিবাস কহিল, ফোন করে খবর নিতে পার, আর একটু পরেই ইভিনিং এম্পায়ারে এ খবর ছাপার হরফেই দেখতে পাবে। হায় বেচারী পাকড়ে ! দাঁওটা চালিয়েও বাগাতে পারলে না !

রাধানাথ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, কি সর্বনাশ করতে বসেছিলাম! উঃ, কি সাংঘাতিক লোক রে বাবা! এই জন্যই গাড়ি বয়ে এসে সাধাসাধি! ওঃ—ভাগ্যিস রাজী হই নি; তা হলে তো রাস্তায় দাঁড়াতে হত।

কৃত্তিবাস একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার কিন্তু হরিষে বিষাদ হচ্ছে।

রাধানাথ প্রশ্ন করিল, কেন?

কৃত্তিবাস কহিল, অনেক মাথা খেলিয়ে আমিও একটা দাঁও মারবার ফিকিরে এসেছিলুম হে। লাখ দুই টাকা ওর ফাঁসিয়ে দিতুম, আর সেইটিকে ক্যাপিটাল করে, নতুন কারবার ফেঁদে বসতুম। কিন্তু এখন ভাবছি, এত বড় ঘা খেয়ে আর কি ও হাত ঝাড়বে!

—ব্যাপারখানা কি? কি আবার নতুন মতলব ফেঁদেছিলে?

—বলব পরে তোমার বাড়িতে গিয়ে, এখানে নয়।

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং—টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

রিসিভার ধরিয়া রাধানাথ প্রশ্ন করিল, কে?

উত্তর আসিল, আমি সীতানাথ শীল। প্রণাম রাধানাথবাবু! দেখুন, মা লক্ষ্মীকে নিয়ে আপনার কাছেই গিয়েছিলুম, কিন্তু আপনি তাঁকে ঠাঁই দিলেন না, আমার অমন প্রস্তাবটা ঠেলে ফেলে নিজের পায়েই কুড়ুল মারলেন।

সীতানাথের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে রাগে রাধানাথের পা হইতে মাথা পর্যন্ত বুঝি একটা অব্যক্ত জ্বালা ধরাইয়া দিল। বক্তাকে নিকটে পাইলে, সে হয়তো হাতের রিসিভারটা ছুঁড়িয়া তাহার মুখে মারিয়া ইহজীবনের মত বাকশক্তি রুদ্ধ করিয়া দিত। মনের রাগটুকু মুখে প্রকাশ করিয়া সে কহিল, আর বুজরুকি করতে হবে না; আমাকে ফাঁসাতে এসেছিলে তুমি ঐ পাজীটার পরামর্শে; কিন্তু আমি জেনেছি, 'সিটি অফ লিভারপুল' মারা গেছে—

সীতানাথ উত্তর দিল, আপনি মিছে আমার উপর রাগ করেছেন। আপনি এখন যেটা শুনেছেন, আপনার কাছে যাবার অনেক আগেই আমি তা শুনেছি। সত্যিই 'সিটি অফ লিভারপুল' ডুবে গেছে। কিন্তু তাতে আপনার কিছু এসে যেত না, বরং মা লক্ষ্মীই তাতে আপনার দোরে বাঁধা পড়তেন—

রাধানাথ কহিল, দেখছি, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আরে বোকা-রাম, ঐ জাহাজেই তো ইনভয়েসের মাল আসছিল—যেটা আমাকে বেচবার ফন্দিতে এসেছিলে।

সীতানাথ উত্তর দিল, সবাই তাই জানত, এমন কি পাকড়ে পর্যন্ত। কিন্তু এর পরের খবরটা শুধু আমরাই জানা ছিল, সেটা চেপে রেখেই আপনার কাছে গিয়েছিলুম—আপনার ভাগ্যটা ফিরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু তা আর হল না। সেইটিই এখন জানাচ্ছি, শুনুন :—'সিটি অফ লিভারপুল' ম্যাসাকারের 'কেব্‌ল্' পাবার একটু পরেই বিলেতের পার্টির কাছে থেকে আলাদা যে 'কেব্‌ল্'খানা এসেছে, সেটি হচ্ছে এই—

> আপনার অর্ডারী মালগুলি যথারীতি ওয়াররিস্‌ক্ ইনসিওর হয় নাই। সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে এই কোম্পানির কোন দায়িত্ব রহিল না। পূর্ব প্রেরিত ইনভয়েসে একথা উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া এই 'কেব্‌লে' সেই ভুল সংশোধন করা হইতেছে। আর ইহাও জানানো আবশ্যক মনে করা যাইতেছে যে, 'সিটি অফ্ লিভারপুলে' স্থান না হওয়ায় আপনার মালগুলি 'কিং এড্‌ওয়ার্ড' জাহাজে পাঠানো হইয়াছে।

শুনলেন খবর ?

খবরটি শুনিয়াই রাধানাথের হাত হইতে রিসিভারটি সশব্দে টেবিলের উপর পড়িয়া কৃত্তিবাসকেও চমকিত করিয়া দিল।

॥ এগারো ॥

সীতানাথ টেলিফোনে যে খবরটি দিয়াছিল, তাহা যে নির্ঘাত সত্য, সেই দিনের সান্ধ্য-পত্রিকা 'এম্পায়ারে' প্রকাশিত চমকপ্রদ সংবাদেই তাহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল।

রাধানাথ বুঝিল, সে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছে। যদি ব্যালেন্স টাকার জন্য হ্যাণ্ডনোটখানা লিখিয়া দিয়া ইনভয়েসটা কিনিয়া ফেলিত!

কিন্তু কৃত্তিবাস তাহাকে বুঝাইয়া দিল, তুমি দেখছি ঐ চীজকে এখনও ভাল করে চেনো নি! ও সেই পাত্রই বটে! শেষের খবরটা পাবার আগেই তোমার মাথায় কাঁটালটা ভাঙবার চেষ্টা করেছিল। তা যদি না হবে, সীতানাথকে ডেকে পাঠালো কেন? এতেই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে সেই সীতানাথকে ওটা বেচতে পাঠিয়েছিল, তার পর শেষের কেব্‌ল্‌খানা যেই এসে পড়ে, অমনি ফোন করে তার দূতটিকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিলে। ওকি কম ধড়িবাজ!

রাধানাথ এতক্ষণে কথাটার সমর্থন করিল ও মৃদুস্বরে কহিল, ঠিক।

কৃত্তিবাস কহিল, মনে নেই তোমার, স্কুলে আমরা ওকে খেপাতুম—'পাক্তিরাম পাকড়ে, না পেয়ে আঁকড়ে!' এখন দেখছি, ছড়াটা হুবহু সত্যি হয়ে গেছে।

রাধানাথ জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, ও যে এরকম করে বাজারসুদ্ধ সবাইকে দাবিয়ে দেবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। মানুষ যে এতবড় ফন্দিবাজ হতে পারে, এর আগে জানা ছিল না। বুদ্ধির দোষে আমি আজ সমুদ্রে ভাসছি। আর বুদ্ধির জোরে ও আজ মনুমেণ্টের মত উঁচু হয়ে জেঁকে বসেছে কলকাতার বুকে।

কৃত্তিবাস কহিল, ওর গোড়া থেকেই লক্ষ্য হল, আর সবাইকে দাবিয়ে দিয়ে জেঁকে বসবে, তা সে চালাকি করেই হোক আর চুরি-জোচ্চুরি বাটপাড়ি করেই হোক; আমরা তো তা পারি নি!

রাধানাথ এবার তর্জন করিয়া কহিল,—থাক্, তুমি আর টস্ দেখিও না। ভারী ধর্মাত্মা হয়েছ আজ! জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ হয়েছ সাধু! তুমিই তো খাল কেটে ঐ কুমীরকে ঢুকিয়েছ; নইলে, হার্ডওয়ারী মার্কেটের রাস্তা ও চিনত? তুমি যদি তোমার কারবারটা ওকে বেচে না দিতে—কোনদিন ও এখানে পাত্তা পেত?

কৃত্তিবাস আজ দমিল না, সঙ্গে সঙ্গেই কথাটার এইভাবে উত্তর দিল, কিন্তু তার গোড়াতেও তুমি! ' কথায় আছে খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে! করছিল ও বেচারা মাছের কারবার, তাতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে খবর পেয়ে, তুমি কেন সেদিকে নজর দিতে গেলে? এর মূল কাঠি তো তুমি, তার পর আমি না হয় তোমার সঙ্গে জয়েন করেছিলুম। কিন্তু তুমি আড়ালে থেকে, শিখণ্ডীর মত আমাকে আগিয়ে দিলে। আমি নাস্তানাবুদ হয়ে সর্বস্ব খোয়ালুম; তখন কি করি বল, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিই নিতে হল! তুমিই বা তখন কতটুকু উদার হয়েছিলে? যে উদারতা ও দেখালে, তুমি কেন সেটুকু দেখাও নি? তুমি তখন নিজের কোলেই ঝোল টানতে চেয়েছিলে; সে অবস্থায় আমারই বা দোষ কি? আর তুমি তো জানই, চির দিনই আমি সুবিধাবাদী।

রাধানাথ কহিল, কিন্তু কারবারটা ওকে বেচে কি এমন সুবিধাটা তোমার হয়েছিল শুনি! তোমার টাটে বসেই আটঘাট সব বেঁধে মাস খানেকের মধ্যেই হুদুক সন্ধান সব জেনে নিয়ে আর কাজটুকু গুছিয়ে কারবারের নামটা পর্যন্ত ও পাল্‌টে দিলে! কেন দিয়েছিল জান? পাছে, তোমার পৈতৃক কারবারটির

নামটুকুও বজায় থাকে, ভবিষ্যতে পাছে কেউ বলে বা জানতে পারে আসলে এই কারবারের টাটখানা অমুক লোকের!

কৃত্তিবাস কহিল, সে আমি জানি, আর তার জন্য আমার কোন দুঃখই নেই। য়ুরোপ ঘুরে এসে যে আইডিয়া আমি পেয়েছি, হাতে কলমে যে সব জেনে এসেছি, তাতে ঐ নগদ বিদায় এজেন্সীর নাকের ওপর যদি আর একটা হার্ডওয়ারী গম্বুজ বানিয়ে তার ওপর থেকে তোপ না দাগি, তা হলে আমার নাম কৃত্তিবাসই নয়।

রাধানাথ গম্ভীর ভাবেই কহিল, ভাল।

অতঃপর একদা পাতিরামের বাড়িতে কৃত্তিবাসের আকস্মিক আবির্ভাব পাতিরামকেও চমৎকৃত করিয়া দিল।

বাড়ির বাহিরে সেই সুপরিচিত ঘরখানির ভিতরে তক্তপোশ বিছানো মলিন বিছানাটির উপর বসিয়া পাতিরাম তাহার এখানকার এজলাসের কাজ চালাইতে-ছিল। বাহিরের উঠানটির বাঁধানো চাতাল ভরিয়া বিভিন্ন সমাজের খাতকশ্রেণী তৃষিত চাতকের মত বাঞ্ছিত বস্তুটির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত বক্ষে বসিয়া আছে। এখানে পাতিরামের সাধারণ তেজারতির কারবার চলে। নিরক্ষর মজুর শ্রেণীর বা ছোটখাটো কারবার চালাইয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, খত বা হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া টিপসহি লইয়া পাতিরাম এখানে তাহাদিগকে পাঁচ হইতে এক শ পর্যন্ত টাকা কর্জ দিয়া থাকে। নূতন কর্জ লইতে বা কর্জের সুদ দিতে সকালের দিকে এই স্থানে প্রত্যহ চল্লিশ-পঞ্চাশটি প্রার্থী ও খাতকের সমাগম হইতে দেখা যায়।

কৃত্তিবাস এখানেও সাহেব সাজিয়া আসিয়াছিল এবং প্রথমেই তাহার দিকে উঠানে সমবেত খাতকগণের নজর পড়িতেই তাহারা সচকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কয়েক জনের মুখ হইতে এক সঙ্গেই একটা চাপা স্বর বাহির হইয়া আসিল,—সাহেব—সাহেব।

পাতিরামও একটা আগন্তুককে দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইল। তাহার আফিসে প্রত্যহ এরূপ অনেক সাহেবেরই আনাগোনা হইয়া থাকে। তাহার বাড়ি বাহিয়া আসিল এই লোকটা কে? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখখানা হাসিতে ভরিয়া গেল। অভ্যর্থনার ভঙ্গিতেই সে কহিল, আরে এসো, প্রথমটা ভড়কেই গিয়েছিলুম তোমাকে দেখে—গরীবের কুঁড়েতে কোথা থেকে আর কি মনে করে সাহেব

লোক এসে দেখুলে ! কিন্তু বেশীক্ষণ চোখে ধুলো দিয়ে রাখতে পার নি, ধরে ফেলেছি। ওরে কে আছিস, চেয়ারখানা খালি করে দে, সাহেব দাঁড়িয়ে আছে, দেখছিস না!

তক্তপোশের পাশেই একখানা চেয়ারের উপর কতকগুলি বই ও খাতাপত্র স্তূপীকৃত হইয়াছিল। পরিচারক তুলসী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সেগুলি অন্যত্র রাখিয়া চেয়ারখানা খালি করিয়া দিল।

কৃত্তিবাস উঠানে দাঁড়াইয়া পাতিরামের খাতকদিগকে দেখিতেছিল। সহসা তাহার চোখের উপর মেছো হাটার স্মৃতি ভাসিয়া উঠিল। বুঝিল, সমান শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা সে সর্বত্র কায়েম রাখিয়াছে। এতগুলি লোক বসিয়া আছে, টুঁ শব্দটি কাহারও মুখে নাই।

পাতিরাম ডাকিল, ওহে সাহেব, ভেতরে এসো।

উঠানে উপবিষ্ট সঙ্কোচকুণ্ঠিত মানুষগুলির পাশ কাটাইয়া কৃত্তিবাস সামনের ছোট ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিতেই পাতিরাম চেয়ারখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসো।

কৃত্তিবাস চেয়ারে বসিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া কহিল, ভেবেছিলুম চিনতে পারবে না।

পাতিরাম কহিল, বিলক্ষণ! স্কুলে পড়া কথামালার গল্পটা ভুলে গেলে? ভোল বদলালে সবাই ভোলে না। মনে নেই, দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছ পরে ময়ূর-গুলোকেও ঠকাতে পারে নি, কাকগুলোকেও নয়, ঠকেছিল সে নিজেই।

কৃত্তিবাসের মুখখানা এক নিমেষে যেন অন্ধকার হইয়া গেল। একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বক্রদৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের ভাবটুকু দেখিয়া লইয়া পাতিরাম উঠানের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাঁকিল, গুইরাম ধাড়া—

ডাকের সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া উঠানে সমবেত লোকগুলির পুরোবর্তী প্রৌঢ়বয়স্ক মানুষটি দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পাতিরাম দৃষ্টি ফিরাইয়া কৃত্তিবাসের দিকে ফেলিয়া কহিল, সাহেবকে একটু বসতে হচ্ছে; দেখতেই তো পাচ্ছ, পালখানেক খদ্দের এসে জমেছে, আমি টপাটপ কাজগুলো সেরে নিয়েই তোমার সঙ্গে আলাপ করছি। ক্ষতি হবে কি?

শুষ্ককণ্ঠে কৃত্তিবাস কহিল, না; একটা জরুরী কথা নিয়েই আমি এসেছি, নিরিবিলিতেই তোমাকে বলব। তুমি তোমার কাজগুলো সেরে নাও।

পাতিরাম হাঁক দিল, ওরে তুলসে, সাহেবের জন্তে ভাল করে চা তৈরী করিয়ে আন্; আর তার সঙ্গে, কেক, সিঙাড়া, নিমকি আর গোটাকতক রসগোল্লা; এই—নে।

আশেপাশে, বালিশের নীচে চারিধারেই নোট টাকা ও রেজকি অগোছাল অবস্থায় পড়িয়াছিল। একটা টাকা তুলিয়া পাতিরাম তুলসীর দিকে ফেলিয়া দিল।

কৃত্তিবাস প্রতিবাদের একটা কৃত্রিম ভঙ্গিপ্রকাশ করিয়া কহিল, না-না, ও সবের দরকার নেই—

পাতিরাম কহিল, খুব দরকার আছে, খালি পেটে কথার জুত হয় না! বিশেষ সাহেব লোকের পক্ষে।

কৃত্তিবাস চুপ করিয়া কহিল। পাতিরাম দ্বারদেশে দণ্ডায়মান গুইরাম ধাড়ার দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল, বেরো কাঠের মতন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলেই কাজ হয়ে যাবে, কেমন? আমার তো আর এখানে কাজকর্ম কিছু নেই—তোমাদের পেট ভরানো ছাড়া। জ্বালাতন—জ্বালাতন!

গুইরাম বেচারী ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার কি ত্রুটি, এখন কি তাহার কর্তব্য! যাই হোক, কোঁচার কাপড়ে যে কাগজখানা মুড়িয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সেখানা খুলিয়া পাতিরামের দিকে আগাইয়া দিল।

চিলে যেমন ছেলের হাত হইতে খাবার ছোঁ মারিয়া লয়, ঠিক সেইভাবে সেখানা লইয়া বিকৃতকণ্ঠে পাতিরাম কহিল, হারামজাদা কোথাকার! একেবারে পিণ্ডি চটকে এসেছে খতখানার, ক' টাকার খত?

গুইরামের নিকট হইতে খতখানা খুলিয়া তাহার উপর চকিতে দৃষ্টিটুকু বুলাইয়া পাতিরাম কহিল, এগিয়ে আয়, বুড়ো আঙুলটা দে—

কাছেই টিপসহি লইবার কালিমাখা পাথরখানা পড়িয়াছিল; গুইরামের আঙুলটির ছাপ দলিলখানির যথাস্থানে নিজের হাতে চাপিয়া দিয়া পাতিরাম তাহাকে রেহাই দিল। সঙ্গে সঙ্গে দশটাকার সাতখানি নোট এবং টাকায় ও রেজগীতে নয় টাকা এগারো আনা গুইরামের হাতে দিয়া কহিল,—এ মাসের সুদ টাকায় এক আনা কষে হিসেবে আগাম কেটে নিয়েছি, বুঝলি? মাসের গোড়াতেই সুদটি এমনি করে আগাম দিয়ে গেলে, এর পর দুপুর রেতে টাকার জন্তে এলেও ফিরতে হবে না।

ঘাড় নাড়িয়া কথাটায় সায় দিয়া গুইরাম চলিয়া গেল। এবার ডাক পড়িল, —হরিহর পাঁজা—

এইভাবে এক জনের পর এক জনকে ডাকিয়া এবং নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জোরে প্রত্যেককে দাবাইয়া পাত্তিরামের হাতের কাজগুলি শেষ করিতে দুইটি ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল।

কৃত্তিবাস ইতিমধ্যে চা ও তৎসহ নানাবিধ জলযোগে পরিতৃপ্ত হইয়া আগ্রহ সহকারে এই অদ্ভুত মানুষটির কার্যপদ্ধতি দেখিতেছিল।

আদানপ্রদান শেষ হইলে দলিলগুলি গুডাইয়া তক্তপোশের পার্শ্বে মেঝে ও দেওয়ালের সহিত গাঁথা লোহার সিন্দুকটির ভিতর নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিল। বিছানার নানা অংশে আস্তৃত নোট, টাকা, রেজকিগুলিও সিন্দুকের সুনির্দিষ্ট আধারে আশ্রয় পাইল।

কৃত্তিবাস নিসন্ধ দৃষ্টিতেই দেখিল, খাতকের হাতের টিপ সহি হইতে আরম্ভ করিয়া টাকার আদানপ্রদান ও লোহার সিন্দুকের ভিতর সংস্থান সম্বন্ধে পাত্তিরাম কোনও অনুচরের সহায়তা গ্রহণ করিল না, স্বহস্তেই এই কাজগুলি সম্পন্ন করিল।

উঠানটি জনশূন্য হইলে পাত্তিরাম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আঃ, বাঁচা গেল! বল কেন, রোজ সকালে আড়াই ঘণ্টা ধরে এই কর্মভোগ চলে।

কৃত্তিবাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু ব্যাপার যা দেখছি, তাতে লাভের যোগও কম নয়।

কথাটা পাত্তিরামের ভাল লাগিল না, ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিল, কি ভেবে কথাটা বলছ?

কৃত্তিবাস কহিল, ভেবে কেন, স্বচক্ষে দেখে। টাকা যা ধার দিলে—তার আগাম সুদ বলে কেটে নিয়ে সিন্দুকে যা তুললে, দেড় শর ওপর হবে। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এই উপার্জন; টাকায় আনা হিসাবে সুদ—তুমি সত্যিই বাহাদুর।

পাত্তিরাম মুচকি হাসিয়া কহিল, এটা হচ্ছে দর্শনডালি, দেখতে শুনতেই বেশ! শেষ পর্যন্ত টাকা আদায় করতে ঝকমারির চূড়ান্ত! শুধু হাতে টাকা দিতে হলে সুদটা একটু চড়িয়েই নিতে হয়, তাতে দোষ নেই। হরে দরে শেষ পর্যন্ত কিন্তু সেই হাঁটু জলেই দাঁড়ায়। কেউ ফেরার হয়, কেউ কলা দেখায়, কেউবা পটল তুলে আমাকেও পুতুল বানিয়ে দেয়। যা যায়, সব কি আসে ভাব? ঘর থেকে তো বেরিয়ে গেল আড়াই ঘণ্টার ভেতরে আড়াইটি হাজারের ওপর, এলো কুল্লে দেড় শ! বাকিটা যে আসবে—মারা যাবে না, তার কোন কথা আছে? আর ও কাগজগুলো তো কলাপাতার সামিল, ওর কি দাম আছে? বরাত—বরাত! দুর্ভোগ!

কৃত্তিবাস তখন মনে মনে মহলা দিতেছিল, কেমন করিয়া তাহার কথাগুলি পাতিরামের কানে তুলিয়া চমক লাগাইয়া দিবে। সে এবার সুযোগ বুঝিয়া খপ করিয়া কহিল, তা মিছে নয়, মহাজনী করা মার্চেন্টদের পোষায় না। তাদের টাকা খাটাবার রাস্তা আলাদা। তেমনই একটা রাস্তার খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি এই সন্দেহজনক মানুষটির মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া পাতিরাম প্রশ্ন করিল, ব্যাপারখানা কি?

কৃত্তিবাস কহিল, একটা জমিদারি কিনবে? খুব দাঁওয়ে যাচ্ছে।

—জমিদারি। কোথায় হে?

—কোথায় আবার, এই খাস কলকাতায়। অর্থাৎ যথায় আছি বসে এবং তুমি কর বসবাস।

—ঠাট্টা করছ নাকি?

—ঠাট্টা করব তোমার সঙ্গে? কি দরকার?

—কথাটা খুলেই তা হলে বল।

কৃত্তিবাস কথাটা তখন খুলিয়াই বলিল। পাতিরামের সহিত ইতিপূর্বে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া যদিও সে নাস্তানাবুদ হইয়াছিল, কিন্তু সে সম্পর্কেই এই অসাধারণ মানুষটির প্রকৃতির দুইটি দিকই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। মানুষ মাত্রেরই যে দুর্বলতাটুকু প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, পাতিরামের সম্পর্কে সেটুকুও কৃত্তিবাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। সুতরাং সেইদিকেও লক্ষ্য রাখিয়া কৃত্তিবাস তাহার প্রস্তাবটি এমন কায়দায় প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, পাতি-রামের মত সন্দিগ্ধচেতা মানুষকেও বিষয়টি তাহার একান্ত অনুকূল ভাবিয়া লুফিয়া লইতে হইল। প্রস্তাবটা এই যে, সমগ্র নিকিরিপাড়া অঞ্চলটির ইজারাদার হইতেছেন কৃত্তিবাসের মামা সৃষ্টিধর দাস। কিন্তু এই বহু লাভজনক ইজারাদারি সম্প্রতি তিনি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যেহেতু হঠাৎ তাঁহার লাখ তিনেক টাকার দরকার হইয়াছে। দেড়লাখ যোগাড় হইয়াছে, বাকী দেড় লাখ টাকা এই ইজারাদারিটা বেচিয়া সংগ্রহ করিতে চান। কিন্তু সম্পত্তিটার যেরূপ আয় আর যদি ইহার পিছনে মাথা খেলানো যায়, লাভের পরিমাণকে অন্ততঃ ত্রিশ পার্সেণ্ট বাড়াইয়া তোলা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়।

প্রস্তাবটা বুঝি পাতিরামকে স্তব্ধ করিয়া দিল। ইহা যে তাহার বহু দিনের স্বপ্ন, অন্তরের প্রচণ্ড আশা ও আকাঙ্ক্ষা। যেদিন সে এই পল্লীর বারোয়ারীতলায়

পঞ্চায়েতগণের সমক্ষে নিষ্ঠুর ভাবে লাঞ্ছিত হয়, সেই দিনই সে মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছিল—যদি কখনও এই অঞ্চলের মালিক হতে পারি—তখন এই অপমানের শোধ তুলব। তাহার পর কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পাতিরামের চক্ষুর উপর এখনও সেই দিনটির কথা যেন জল্ জল্ করিতেছে। তাহার খেরোবাঁধা সেই মোটা খাতাখানার প্রথমেই সেই দিনটির কথা ও কাহিনী অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রাখিয়াছে। এখনও পল্লীর অধিকাংশ মাতব্বর পাতিরামের সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না, দায়-দফায় যদিও অনেকে পাতিরামের কাছে হাত পাতিতে এখন আর দ্বিধা করে না, কিন্তু সমাজের দিক দিয়া তাহারা যেন পাতিরামকে এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। পাতিরাম সমস্ত বুঝিয়াও চুপ করিয়া থাকে, ইহাদের সম্বন্ধে তাহার সত্যকার মনোবৃত্তিটুকু কিরূপ তাহা সে অতিবড় অন্তরঙ্গের নিকটও কোনদিন প্রকাশ করে নাই। দায়-দফায় ইহাদিগকে ঋণপাশে বাঁধিয়াও পাতিরাম কোন ক্ষেত্রেই কায়দা করিতে পারে নাই। শীতলা মন্দিরের পুরোহিত চক্রবর্তী ঠাকুরের নিগ্রহ ইহাদের সকলকেই এমনই সতর্ক ও সচেতন করিয়া রাখিয়াছিল যে, ঋণের দড়ি গলায় পরিলেও শেষ পর্যন্ত যূপকাষ্ঠে মাথা দিবার পূর্বেই যেমন করিয়াই হউক তাহারা বন্ধনমুক্ত হইত।

পাতিরাম জানে, এই অঞ্চলটির ইজারাদারীসূত্রে কৃত্তিবাসের মামাদের এখানে কি প্রভাবপ্রতিপত্তি ও কি রকম খাতির! আজ সেই সম্মান প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ হাতছানি দিয়া পাতিরামকে ডাকিতেছে এবং অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছে তাহার এক সময়কার সহপাঠী কৃত্তিবাস কোলে।

মনের ভাবটুকু মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে যে লোকটির সতর্কতার অন্ত ছিল না, অতি উল্লাস আজ বুঝি তাহার সে সতর্কতাটুকু শিথিল করিয়া দিল। পাতিরাম সাগ্রহে জানাইল, আমি রাজী; ঐ টাকাই আমি দেব। আজ যদি হয় তো কাল নয়। বুঝলে?

কৃত্তিবাস বুঝিল, মাছ নিঃসন্দেহে টোপ গিলিয়াছে। সে অমনি একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, ভ্যাগ্যিস খবরটা আমি আনলুম, নইলে তো ফসকে যেত—আর রাধুই এটা লুফে নিত।

রাধু অর্থাৎ রাধানাথের নাম উঠিতেই পাতিরাম দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, রাধুবাবু! সে এখবর শুনেছে নাকি?

কৃত্তিবাস কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিল, শোনে নি আবার! ওর বাবার ছিল বরাবরের টাঁক, রাধু কি ছাড়তে পারে? আরে সেই তো আমাকে ধরে

বললে—কাজটা তুমি সেড়ে করে দাও ভাই, চিরকাল কেনা হয়ে থাকব। হাতে এখন টাকা আছে, তা হলে আর বিলেতে পাঠাই না মালের জন্তে।

শুষ্ক কণ্ঠে পাত্তিরাম প্রশ্ন করিল, তা হলে, রাধুবাবু পেছনে লেগে আছে বল?

কৃত্তিবাস মুখখানা এবার বিকৃত করিয়া উত্তর দিল, থাকলেই বা লেগে, তাতে কি হয়েছে! ওকে আমি সেই মাছের ব্যাপারে চিনে নিয়েছি। এগিয়ে দিয়ে তার পর গেল পেছিয়ে, কারবারটার পাট পর্যন্ত ঘুচিয়ে ছাড়লে! আমি কি সে সব ভুলেছি নাকি? আর সে সময় তুমি যা করেছ, তাও তো এইখানটায় লেখা আছে; এখন আমি তার কোলে ঝোল মাখাব, সেই ছেলেই আমি বটে!

পাত্তিরাম জিজ্ঞাসা করিল, তাকে কি জবাব দিলে?

কৃত্তিবাস উত্তর দিল, জলের মতন বুঝিয়ে দিলুম, টাকাগুলো খপ করে বিলেতে পাঠিও না! ধরে থাকো, আমি দেখি না কতদূর নামাতে পারি। সে এখন এই আশাতেই বসে আছে। বাছাধন চান সস্তায় কিস্তি মারতে। আর বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে শুধু হাতেই কৃত্তিকে দিয়ে কাজ সারতে চান। বড়লোক নামেই, দেবার থোবার বেলায় হাত দিয়ে জল গলাতে চায় না, ছ্যা—ছ্যা—

পাত্তিরাম কহিল, এখন কাজের কথা কও; আমার ইচ্ছা কি জানো? লোক জানাজানি হবার আগেই কাজটা হাসিল হয়ে যায়। তোমার খাঁইটা কি রকম, তাই এবার বল!

বিস্ময়ের স্বরে কৃত্তিবাস কহিল, আমার। খাঁই? তোমার কাছে? নাঃ, আমি কিছু চাই না, কানা কড়িও নয়; সম্পত্তিটা তোমার হাতে গেলেই আমি সুখী, সে দিনের সাহায্যের কথাটা আমি এখনও ভুলি নি।

পাত্তিরাম কহিল,—সে কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এখন আসল কথাটা আমার শোন,—তোমার কথার ওপর বিশ্বাস করে আমি এ ব্যাপারের সমস্ত ভার তোমার ওপরেই দিলুম। আমি কিছু দেখব না; দলিল হলেই টাকাটা ফেলে দেব, আর তোমাকে এর জন্তে আলাদা দেবো—

কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি কহিল, আমার কিছু চাই না!

পাত্তিরাম দৃঢ়স্বরে কহিল, চাই। কাজ হয়ে গেলে আমি তোমাকে হাজার টাকা আলাদা দেব।

কৃত্তিবাস আমতা আমতা করিয়া কহিল, কিন্তু আমি কোন প্রত্যাশা করে আসি নি, তুমি বিশ্বাস কর।

পাতিরাম কহিল, সেই জন্যই ওটা তোমাকে পান খেতে দিচ্ছি, এমন কিছু-বেশী নয়।

কৃত্তিবাস কহিল, তাহলে আজই বায়না করলে ভাল হয়।

পাতিরাম কহিল, বেশ, করে ফেলো বায়না ; আমি তোমার হাতেই পাঁচ হাজারের এক কেতা চেক লিখে দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরেই চেকখানা লইয়া কৃত্তিবাস যখন বিদায় লইল, সে সময় তাহার মুখের ভঙ্গিটুকু বোধ হয় পাতিরাম লক্ষ্য করে নাই।

॥ বারো ॥

অতি বুদ্ধিমানকে সময় বিশেষে এমন নির্বোধের মত কাজ করিতে দেখা যায় যে, তাহার কার্যপদ্ধতির ত্রুটি বালকেরও বিস্ময় উৎপাদন করে। যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্ববিদিত বড় বড় জেনারেলদেরও এমন মারাত্মক ভুল প্রকাশ পাইয়াছে, ইতিহাসে যাহা পাঠ করিয়া আমরাও চমৎকৃত হইয়া থাকি।

ছোটখাটো লেনদেনে দলিলের কাজে যে পাতিরামের অনুসন্ধিৎসার প্রাচুর্য বিস্ময়াবহ ছিল, লক্ষাধিক টাকার ব্যাপারে তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। পাছে শহরের কোন অভিজাত শ্রেণীর প্রার্থী খবরটুকু জানিতে পারে কিংবা রাধা-নাথবাবু কোনরূপ চাল চালিয়া বসে, সেই ভয়ে ব্যাপকভাবে বিশেষ কোন তদন্ত না করিয়াই সে তাড়াতাড়ি ক্রয়বাণিজ্যটি সম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

কথাটা কিন্তু পাড়ায় রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই একদিন শুদ্ধ বিস্ময়ে শুনিল, পাতিরাম পাকড়ে নিকিড়িপাড়ার ইজারাদারি রাতারাতি কিনিয়া ফেলিয়াছে। তখনই পাড়ার ভিতর একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িল, নানা স্থানে কানাকানি শুরু হইয়া গেল।

সেদিন পাতিরাম তাহার খাতকদের সহিত লেনদেনের কাজ শেষ করিয়া খাতাপত্র গুছাইতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে তাহার ছোট ঘরখানির সম্মুখে উঠানটির উপর আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অতি বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। একদিন যে শ্রদ্ধাভাজনটির প্রতি সে এইখানেই অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিয়াছে, শৈশবের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে যাহার প্রতি সে নিজের প্রকৃতিবিরুদ্ধ অবাঞ্ছিত অনাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে যিনি আজ সর্বহারা, পল্লীর এই

দেবায়তনটিই যাঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই শান্তমূর্তি সৌম্য ব্রাহ্মণ চক্রবর্তী মহাশয় বহুদিন পরে আজ অকস্মাৎ তাহারই গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত!

পাত্তিরামের চমক ভাঙ্গিবার পূর্বেই বৃদ্ধ হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, আমাকে হঠাৎ দেখে অবাক হয়ে গেছ বোধহয়।

পাত্তিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, প্রণাম! আপনার পায়ের ধুলো যে পড়বে, সে আশা সত্যই করি নি। বসুন—

একখানা চেয়ার পাত্তিরাম দেখাইয়া দিল।

চক্রবর্তী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, কল্যাণ হোক তোমার; কিন্তু বসবার এখন অবসর নেই বাবা। মন্দিরের কাজ পড়ে রয়েছে। একটা প্রয়োজনীয় কথা কর্তব্যের অনুরোধেই তোমাকে বলব বলে এসেছি।

পাত্তিরাম কহিল, বলুন।

চক্রবর্তী মহাশয় প্রশ্ন করিলেন, তুমি নাকি নিকিড়িপাড়ার ইজারাদারি কিনছ? কথাটা কি সত্য?

পাত্তিরাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিয়া উত্তর দিল, কিনছি কেন; কিনে ফেলেছি। তিন দিন হল দলিল রেজেস্ট্রী হয়ে গিয়েছে।

চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, বেচল কে? এখনকার ইজারাদার, না খোদ জমিদার?

পাত্তিরাম রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, সে খোঁজে আপনার দরকার?

চক্রবর্তী মহাশয় হাসিয়া উত্তর দিলেন, দরকার এইটুকু পাত্তিরাম, এক দিন তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছিলে। তোমার কাছে সে সময় অত সহজে টাকা না পেলে আমার দায় উদ্ধার হত না। তার পরিণাম অবশ্য আমার দিক দিয়ে যাই হোক না কেন, তোমার উন্নতিই আমার কামনা। এখনকার ইজারাদার আর জমিদার দু তরফই আমার জানিত লোক, দু পক্ষের হালচাল সবই আমি জানি। যদি তুমি ইজারাদারের কাছ থেকে এ সম্পত্তির ইজারা নিয়ে থাক, সব টাকাই তোমার জলে পড়েছে, তুমি তা হলে রীতিমত ঠকেছ।

পাত্তিরাম অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিল, বুঝেছি, খবরটা শুনেই পাড়ার মাতব্বরদের বুকে ঢেঁকি পড়েছে, তাই তারা আপনাকে পাঠিয়েছে। তা ভালই তো, ঠকেই যদি থাকি কি হয়েছে তাতে? এর জন্যে পাড়ার লোকের মাথাব্যথা কেন?

চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, পাড়ার লোক আমাকে পাঠায় নি পাত্তিরাম,

খবরটা শুনে আমি নিজেই এসেছিলুম বাবা! তা যাক, তুমি যা ভাল মনে করেছ করেছ, তাইতেই তোমার ভাল হোক। আমার আর কিছু বলবার নেই।

যেমন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তেমনিই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। পাতিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারের দিকে আগাইয়া গেল; দুই হাতে দরজার দুই পাটি কপাট ধরিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়কে পুনরায় ডাকিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতে চাহিল না।

কয়েকদিন পরেই পাতিরাম খরিদ করা ইজারাদারির অধিকার সাব্যস্ত করিতে যে তোড়জোর আরম্ভ করিয়া দিল, তাহাতে সমস্ত নিকিরিপাড়া বুঝি কাঁপিয়া উঠিল। এই পল্লীর বিখ্যাত মন্দিরটির সম্মুখে বারোয়ারীতলার প্রশস্ত অঙ্গনটির উপর গাড়ি গাড়ি ইট, চুন, বালি প্রভৃতি আসিয়া পড়িতেছিল। জনরবে ইহার উদ্দেশ্য এইভাবে প্রচারিত হইল যে, এইখানেই উঠিবে পাতিরাম পাকড়ের বসতবাটীর পাকা ইমারত। যে লোক আঙুল ফুলিয়া কলাগাছ হইয়াছে সে এবার তিনতলার ছাদে বসিয়া সমস্ত নিকিরিপাড়ার খবরদারি করিবে। কিন্তু যে শুভদিনটি উপলক্ষ করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে ইমারতের ভিত্তি স্থাপনের কথা, সেইদিন প্রত্যূষে মূল জমিদার হাটখোলার হাতীবাবুদের তরফ হইতে তাহাদের ম্যানেজার বহুসংখ্যক লাঠিয়াল ও পুলিস প্রহরী সমভিব্যাহারে অকস্মাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া পাতিরাম পাকড়ের এই ইট-গাড়া কার্যে বাধা দিল।

পাতিরাম যদিও প্রথমে অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু স্থির-বুদ্ধি ম্যানেজার উচ্চ আদালতের ইনজাংশনের আদেশ দেখাইয়া সেই মুহূর্তে তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

সমবেত সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনিল,—ভূতপূর্ব ইজারাদারের ইজারার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে। পাতিরাম পাকড়েকে তাহার ইজারাদারি বিক্রয় করিবার কোনও এক্তিয়ার নাই। পাতিরাম তদন্ত না করিয়া নিজের দায়িত্বেই এই বেকুবি করিয়াছে। আদালতের আদেশ অনুসারে হাতীবাবুর সরকার নিকিরিপাড়া মহলের উপর দখল লইতে আসিয়াছে, পাতিরাম পাকড়ের ইহাতে কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব নাই। সে এই মহলের এক জন সাধারণ প্রজামাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়।

পাতিরাম নিরুত্তরে নিজের বাড়ির দিকে এমন ভঙ্গিতে চলিয়া গেল, সে যেন সমবেত দর্শকদেরই এক জন, তাহাদের মতই এই চাঞ্চল্যকর ব্যাপারটা দেখিতে আসিয়াছিল; তাহার মুখের উপর বিক্ষোভ বা নৈরাশ্যের চিহ্নমাত্র নাই!

কথায় আছে—'ঠেকনা ঠকিলে বাপকেও বলে না।' পাতিরামের অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইল। সে বুঝিয়া দেখিল যে, রীতিমতই ঠকিয়াছে এবং তাহাকে ঠকাইবার জন্য যদিও কৃত্তিবাস মুখপাত্র স্বরূপ দেখা দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পশ্চাতে তাহার বিরুদ্ধবাদী আরও অনেকেই আছে। এই দলটির চাঁই হইতেছে—রাধানাথ মুখোপাধ্যায়। সুতরাং পাতিরামের যত কিছু রাগ ও বিদ্বেষ এই অভিজাত বংশীয় যুবকটির উপরে গিয়াই পড়িল। সেইদিনই পাতিরাম তাহার লাল খেরো বাঁধা মোটা খাতাটির পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে লিখিল—বাজে খরচ এক লাখ তিপান্ন হাজার টাকা! এই খরচা করাইল শহর কলিকাতার শিক্ষিত ভদ্রসমাজ; যথা-রাধানাথ মুখুজ্জে, কৃত্তিবাস কোলে, সৃষ্টিধর দাস। উসুল চাই এই বাবদ পুরা তিন লাখ। উসুল করিবে ইহারা এবং হাটখোলার হাতীবাবুদের সরকার।

নিজের বিখ্যাত খাতায় এই খরচার কথা লিখিয়াই পাতিরাম এত বড় খরচা স্থির হইয়া সহ্য করিল। এই ব্যাপার লইয়া কোন শোরগোল তুলিল না, চীৎকারে বাড়ি ও পাড়া মাথায় করিল না, শহর ব্যাপিয়া ঢাক পিটিল না, এমন কি, আদালতে ও খবরের কাগজে কোনও রূপ ইন্ধনও যোগান দিল না। সিভিল ও ক্রিমিনাল কোর্টের আইনবিদগণ প্রতারকদিগকে দুমুখো বিধানের উভয় ধার দিয়া জবাই করিবার ও খেসারত সমেত সমস্ত টাকা পাতিরামের সিন্দুকে ফিরাইয়া আনিবার কত নির্ঘাত ব্যবস্থাই দিলেন, কিন্তু পাতিরাম কিছুতেই সায় দিল না। গম্ভীর হইয়াই কহিল, যেতে দিন, ওতে কিছু হবে না। ও পথে আমার টাকা ফিরবে না।

সে কি! তা হলে নালিশ করবেন না?

না; টাকা যখন পালায় তাকে পাকড়াবার জন্য আবার তার পেছনে টাকা পাঠানো মস্ত ভুল, তখন প্রয়োজন শুধু মাথার।

তার মানে?

মানে এই, মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি বার করা, কেননা টাকা যে রাস্তা দিয়ে পালায়, সেই রাস্তা দিয়েই তাকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

ঝুনো মামলাবিদরা এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের কথা শুনিয়া অবাক! লোকটা বলে কি? হঠাৎ এইভাবে ঘা খাইয়া লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির আঘাত পাইয়া নিশ্চয়ই ইহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে, নতুবা প্রতিকার চাহে না, নালিশ করিতে সর্বস্ব পণ করে না, প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া ওঠে না! অদ্ভুত!

কিন্তু আইনবীরদের উৎসাহবহ্নির শিখা তথাপি নির্বাপিত হইতে চাহে না। আদালতের নজির তুলিয়া বুঝাইতে চাহিলেন,—এমন সঙীন কেস্‌, সাক্ষাৎ

প্রমাণের অভাব নাই, আসামীপক্ষও শাঁসালো! এ ক্ষেত্রে এভাবে উপেক্ষা গভীর লজ্জা ও পরিতাপের কথা যে! লোকে হাসিবে, দুষ্টজন আস্কারা পাইবে, কিল খাইয়া তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিলে সবাই বলিবে—কাওয়ার্ড, কাপুরুষ!

পাতিরাম অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, তা বলুক! ওতে আমার লাভও নেই, ক্ষতিও নেই! আমার নজর কিসে শুনবেন,—কত এল, আর কতইবা গেল! আজ যেটা গিয়েছে, সেটা যাতে ফিরে আসে তার ডবল হয়ে—সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে। খোয়া টাকাগুলো ফেরাতে পারি ভাল, না পারি বয়ে গেল! কিন্তু এর জন্যে আপনাদের কাছে বুদ্ধি ধার করবার কোন দরকারই আমি মনে করছি না; তবে একথাও বলছি, আপনাদের যদি টাকার দরকার হয়, টিকিট নিয়ে আসবেন, হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার দিতে এখনও আমি পেছপাও নই; মনেও ভাববেন না যেন, একটা লোকসান খেয়ে পাতিরাম পাকড়ে পড়ে গেছে! আর ঐ এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা,—ও তো আমার ভগবান তুলেই ফেলেছেন মশাই —বছর ফিরতে না ফিরতেই ডবল করে ফিরিয়ে দেবেন।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুরে বিস্মিত হিতৈষীরা কহিলেন, আচ্ছা, পাকড়ে মশাই, আমরা তাহলে এখন যাই; তবে ভগবানের ব্যবস্থাটা যেন আমাদের জানাতে ভুলবেন না।

পাতিরাম হাসিয়া কহিল, জানাবার দরকার হবে না। নিজেরাই জানতে পারবেন। কথার পিঠে একটা কথা আপনাদের এখনই জানিয়ে দিচ্ছি শুনুন;—একবার ট্রামে আমার পকেট থেকে একটা মনিব্যাগ চুরি যায়; তাতে ছিল দশটাকার খানতিনেক নোট, আর আনাকতক পয়সা। ভগবানকে জানালুম। তার পর সাতটি দিনের ভেতরেই আমার হাতে এল একটা কম এক ডজন মনিব্যাগ, সেগুলোর পেটের ভেতরে ছিল নোটে টাকায় রেজকিতে প্রায় পাঁচ শ।

বলেন কি,— কি করে এল?

ভগবান দিয়ে গেলেন! ব্যাগটা পকেট থেকে খোয়া যেতেই জানিয়ে দিলুম শোধ এর নেবই। রোজ গোনা দশখানা হিঙের কচুরি ছিল আমার তখন জলখাবার, আর ভাতের সঙ্গে দু বেলায় পাঁচখানা করে দশখানা ইলিশ ভাজা; সেই দিন থেকেই সখের ঐ দুটো খাবারই ছেড়ে দিলুম, হারানো মনিব্যাগের টাকা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত। ভগবান কি আর থাকতে পারেন! পাঁচ-সাতটা ছোঁড়া আমার কাছে দিনরাত পড়ে থাকে, তাদের অসাধ্য কিছুই নেই; ভগবান তাদেরই লেলিয়ে দিলেন আর কি! তার ফলে, যে রাস্তা দিয়ে আমার ব্যাগটি উধাও হয়ে-

ছিলেন, সেই রাস্তা ধরেই আরও দশটিকে নিয়ে ফিরে এলেন! অবশ্য আমার সেই ব্যাগটিই যে হুবহু আসবে, এমন আবদার আমি ভগবানের কাছে করি নি,—ব্যাগ নিয়ে তো আর কথা নয়; ব্যাগের ভেতরে থাকে যে বস্তুটি, তাই নিয়েই মাথা-ব্যথা। তার ব্যবস্থা হলেই—ব্যাস্! আচ্ছা, নমস্কার!

এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে ক্ষণকাল অপলক নয়নে চাহিয়া মুখের কথা প্রয়োগ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ শুদ্ধ বিস্ময়েই স্থান ত্যাগ করিলেন।

॥ তেরো ॥

সীতানাথ মুরুব্বির মত মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, আশ্চর্য, আমার কাছেও কথাটা চেপে রেখেছিলেন! যদি খুলে সব বলতেন, তা হলে—

বাধা দিয়া পাতিরাম প্রশ্ন করিল, কি করতে?

—সব দিক দিয়ে মার্চ করতুম; হাতুবাবুদের সেরেস্তায় খবর নিতুম।

—ছুটোছুটিই সার হত তাতে। কাজ কিছুই হত না!

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, তাই। আটঘাট বেধেই ওরা কাজে নেমেছিল। তুমি কি ভেবেছ, হাতীবাবুদের সেরেস্তার সঙ্গে এদের যোগসাধন ছিল না? আসলে কি জান?

—কি?

—একটা চক্রান্ত হয়েছিল। এক বোকা বেকুব ব্যবসা খুলে বুদ্ধির জোরে টাকা উপায় করছে, সেই টাকাটা কোন রকমে বাগিয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করা চাই! তাই সবাই মিলে কোমর বেঁধেছিল।

—এখন তা হলে কি করতে চান?

—পেছনের কথা নিয়ে মাথা ধরাতে কিংবা সময় নষ্ট করতে চাই না; হাতে কলমে জানিয়ে দিতে চাই—আসলে বোকা কে, আর শেষ পর্যন্ত ঐ টাকাটা কোথায় গিয়ে ওঠে।

—আপনি কি আশা করেন, টাকাটা ফিরে পাবেন?

দৃঢ়স্বরে পাতিরাম কহিল, নিশ্চয়ই; জানো না, বানের জল ঢুকে গাঁয়ের পুকুর ডোবাগুলো পর্যন্ত ভরিয়ে দেয়, তার পর ফেরবার সময় পুকুর ডোবার জমানো জল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়! আমার টাকাটাও ঐ বেনো জল জেনো।

এই দিক দিয়েই এখন যা কিছু তদ্বির করতে হবে—বুঝেছ।

অতঃপর পাতিরামের খাস কামরায় দরজাটি বন্ধ করিয়া এই তদ্বির সম্পর্কে বৈঠক বসিল। বৈঠকের বক্তা পাতিরাম, শ্রোতা সীতানাথ।

ঘণ্টা দুই পরে রুদ্ধ ঘরের দরজা যখন উন্মুক্ত হইল, তখন দেখা গেল, দুইখানি মুখই দিব্য প্রসন্ন, কোন জটিল সমস্যার আলোচনা যেন বহু বিতর্কের পর এইমাত্র সুন্দর ভাবেই সমাধান হইয়াছে।

অফিসের পাণ্টা পাতিরাম বরাবর নিকিরিপাড়ার ভিতর ঢুকিয়া শীতলা মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। চক্রবর্তী মহাশয় তখন মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া একখানা পুঁথি পড়িতেছিলেন। ভক্তবৃন্দের সমাগম তখনও হয় নাই।

পুঁথির পাতায় চক্ষু দুটি নিবদ্ধ থাকায় চক্রবর্তী মহাশয় পাতিরামের উপস্থিতি জানিতে পারেন নাই। পাতিরামের কণ্ঠস্বর তাঁহাকে সহসা সচেতন করিয়া দিল।

—প্রণাম হই চক্রবর্তী মশাই।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি পাতিরামের মুখের উপর ফেলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, মন্দিরে মহামায়া রয়েছেন পাতিরাম, আগে তাঁকে প্রণাম কর।

পাতিরাম কহিল, আপনাকে প্রণাম করলেই তাঁকে প্রণাম করা হবে। আর সে প্রণাম তিনি নেবেন।

চক্রবর্তী মহাশয় ভাল করিয়াই পাতিরামকে চিনিয়াছিলেন। বুঝিলেন, ইহার সহিত তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই। মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিলেন, তার পর কি মনে করে?

পাতিরাম বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল, সেদিন আপনার কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলুম, আজ তাই মাপ চাইতে এসেছি চক্রবর্তী মশাই।

চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, যেটুকু জানি অবশ্যই বলব, তবে এটুকুও বলে রাখছি, এ ব্যাপারে আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষীসাবুদ দিতে পারব না।

পাতিরাম কহিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন চক্রবর্তী মশাই, এ ব্যাপার কিছুতেই আদালত পর্যন্ত গড়াবে না।

—কি তুমি জানতে চাও?

—ঐ সৃষ্টিধর দাস কেন আমার সঙ্গে এরকম ছল-চাতুরি করলে?

—অভাবের দায়ে। ঘর-বাড়ি, বিষয়-আশয়, নাম-ডাক, দশ-দশা সবই আছে। অভাব শুধু টাকার; দেনায় তলা পর্যন্ত চুঁয়ে আছে। দাঁও যদি পায় বোকার মাথায় কাঁটাল ভাঙবে না কেন?

—আচ্ছা, কৃত্তিবাস কোলেকে আপনি জানেন? ঐ সৃষ্টিধর দাসের ভাগনে?

—খুব জানি। ভয়ঙ্কর ছেলে। অথচ, এই ভাগনেটার ওপরেই বুড়োর টানটা বেশী।

—আর কোন ভাগনে আছে নাকি?

—আছে এক জন; তবে সে গরীব। তার বাবা জাতব্যবসা ছাড়ে নি বলে সৃষ্টিধর এদের সঙ্গে সম্পর্কই ছেঁটে ফেলে। তবে শুনেছি, ছেলেটা নাকি লায়েক হয়েছে, পাসটাও করেছে। বোধহয় এখনও পড়ছে।

—কোথায় তারা থাকে বলতে পারেন, আর নাম-টামগুলো—

—টালিগঞ্জে এদের বাড়ি, গেরস্ত ঘর। সৃষ্টিধরের এই ভগিনীপোতের নাম চিনিবাস, আর ছেলেটির নাম শ্রীবাস।

—আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করব চক্রবর্তী মশাই।

—বল?

ঐ হাটখোলার হাতীবাবুদের খবরটা—

—ওরা মস্ত লোক, তবে এদেরই জাতভাই, পালটি ঘর। বনেদী বড়লোক। জেলায় জেলায় তালুক, তা ছাড়া ফলাও কারবার। এদের পেছনে দেনাও নেই, আর কাউকে ঠকিয়ে নেবার মত মতলবও নেই।

—কিন্তু জাতভাই যখন, আর যোগাযোগও রয়েছে, সেক্ষেত্রে—

—যা ভাবছো তুমি তা নয়। ও যোগাযোগ বাজে; আর ওরা হচ্ছে লক্ষ্মীমন্ত মানুষ, বাড়ন্ত ঘর, ছেলেমেয়ে দু দিক দিয়েই। ওরা কখনও অন্যায় করতে পারে না। তবে সেরেস্তার আমলাদের যদি কিছু খাইয়ে থাকে সে কথা আলাদা।

পাতিরাম খবরগুলি বুঝি তাহার মনের ভিতরে স্মৃতির অক্ষরে লিখিয়া লইল। পাতিরামের স্মৃতিপটে এক বার যাহার রেখা পড়ত, কস্মিনকালেও তাহা মুছিত না। অতঃপর প্রসন্নভাবেই পাতিরাম কহিল, আচ্ছা, তা হলে এখন চললুম চক্রবর্তী মশাই, প্রণাম।

হাত তুলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, কল্যাণ হোক।

॥ চৌদ্দ ॥

যাহারা ভাবিয়াছিল, দেড় লক্ষ টাকার ঘা খাইয়া পাতিরাম ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহারাই এক দিন সবিস্ময়ে দেখিল, নিকিরিপাড়ার সম্মুখে সদর রাস্তাটির উপর পাশাপাশি একই রকমের দুইখানা ইমারত তৈয়ারীর কাজ পাতিরাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত অঞ্চলটা সরগরম করিয়া ইমারতের কাজ চলিয়াছে।

পাতিরামের সংসারে দ্রৌপদীই এখন সর্বেসর্বা। মায়ের উপর সংসারটির ভার ছাড়িয়া দিয়া পাতিরাম নিশ্চিন্ত। যদিও মা ও ছেলেকে লইয়া সংসার, কিন্তু দ্রৌপদীর দরাজ অন্তর তাহার আয়তনটি অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে; ছোট বাড়ি-খানিতে লোক এখন ধরে না। অসহায় নিরাশ্রয় নিরুপায় আত্মীয়-স্বজন এখন এই অতি সচ্ছল সংসারটির আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতেছে। এ বিষয়ে মায়ের সহিত ছেলের মনোবৃত্তির আশ্চর্যরকম ঐক্যই দেখা যাইত।

দ্রৌপদী যেদিন ছেলেকে বলে, পয়সা তো অনেকেই পয়দা করে বাবা। কিন্তু সত্যিকারের কাজে সে পয়সাকে খাটাতে সবাই কি পারে? ঈশ্বর তো তোমাকে আঁজলা পুরে দিলেন, আমার ইচ্ছে—তুমি তার সদ্ব্যয় কর।—পাতিরাম মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি চাও মা?॰ কিভাবে খরচ করতে তোমার মন চায় বল?

মা তখন জানাইয়া দেয়, আমার কি ইচ্ছে হয় জানো বাবা, চোখের ওপর যাদের কষ্ট দেখি, যতটুকু পারি তা মিটিয়ে দিই। যে সব আপনার জন দুঃখ-কষ্ট পায়, খাবার সংস্থান নেই, পরের বাড়িতে পড়ে লাথি-ঝাঁটা খায়, তাদের আশ্রয় দিই, কাছে এনে রাখি। পয়সার এর চেয়ে আর সদ্ব্যয় কি আছে বাবা?

পাতিরাম তখন মায়ের পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া বলে, এই তো আমার মায়ের কথা। তোমার মন যা চাইবে, তাই তুমি করবে মা। আমার ঠাকুর, দেবতা, ঈশ্বর, ধর্ম, যা কিছু সবই তুমি।

মা সেদিন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছেলেকে আশীর্বাদ করে,—আমি বলছি বাবা, টাকা-পয়সার কষ্ট তুমি কখনও পাবে না।

পাতিরামের মা প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইত। যে ঘাটে সে স্নান করিত,

বড় ঘরের মেয়েরাও সে ঘাটে নিত্য নিয়মিত ভাবেই স্নানে আসিত। ইদানীং পাতিরামের নামডাক হওয়ায় সবাই দ্রৌপদীকে চিনিত, আলাপ-পরিচয়ও ছিল। স্নানের ঘাটে উড়িষ্যা প্রদেশের যে সব ব্রাহ্মণ ধর্মানুষ্ঠানের বিপণি সাজাইয়া স্নানের ঘাটগুলি গুলজার করিয়া রাখিত, তাহাদের নিকট দ্রৌপদীর আদর-খাতিরের অন্ত ছিল না। দ্রৌপদীর এতটা সম্মান-প্রতিপত্তি নিত্য-স্নানার্থিনী অন্যান্য মহিলাদের ভাল লাগিত না। এই দলের চাঁই ছিল নন্দর মা। এই নামেই এই মহিলাটি স্নানের ঘাটে সুপরিচিতা। যে হেতু, তাহার ছেলেরা সকলেই কৃতবিদ্য, বড় বড় চাকুরে, মাস কাবারে অনেক টাকা উপায় করে। তবে বড় ছেলে নন্দর নাম-ডাকই বেশী, সে সরকারী অফিসের চার শ টাকা মাইনের চাকর। ছেলেদের গরবে নন্দর মা মেয়েমহলে যেন ফাটিয়া পড়ে। বিনাইয়া বিনাইয়া টাকা-পয়সার দেনার খরচের কথা অন্তত বাইশগুণ বাড়াইয়া কত প্রকারেই প্রকাশ করে। কেহ হয়তো বিশ্বাস করে, কেহ কেহ বা মুখ টিপিয়া হাসে, আবার কেহ বা পাল্টা জবাবে নিজের সংসারের খরচের কথা তুলিয়া টেক্কা দিবার প্রয়াস পায়। আসলে কিন্তু নন্দর-মার হাত দিয়া গরীব দুঃখীর হাতে এমন কিছু পড়ে না—যাহা দেখিয়া দশ জনে বলিতে পারে যে, দাতব্য-খাতেও তাহার উল্লেখযোগ্য খরচা কিছু আছে! এদিক দিয়া বরং সকলের উপরে জায়গা করিয়া লইয়াছে পাতিরামের মা দ্রৌপদী; অথচ এ সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া একটি দিনের জন্যও কোন কথা সে বলে নাই।

একদা ঘটনাচক্রে স্নানের ঘাটে পাতিরামের মায়ের সহিত নন্দর মার সংঘর্ষ বাধিল। দোষটা অবশ্য নন্দর মার। সেটা অগ্রহায়ণ মাস, শীতটা সবে পড়িয়াছে। কিন্তু সেই শীতেই পাতিরামের মা গায়ে আঁচলটি দিয়া ঘাটের পাণ্ডা ঠাকুরদের আশীর্বাদ কুড়াইতেছিল। নন্দর মার সেটা সহ্য হইল না। সে তখন কাপড় ছাড়িয়া সখী চাকরটার হাত হইতে আঁচলাদার শালখানা লইয়া গায়ে জড়াইতে-ছিল। সেই অবস্থায় সে ঘাটসুদ্ধ সবাই শুনিতে পায় এমনই স্বরে দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া বসিল, ওমা, এই শীতে তুমি আঁচল গায়ে দিয়ে চলেছ পাতিরামের মা! কেন, ছেলে তো যা হোক দু পয়সা উপায় করে শুনেছি; বুড়ো মাকে একখানি বিলিতী কম্বলও কিনে দিতে পারে না? কতই বা দাম! এক টাকার বেশী নয়। না দেয় বলো, নন্দকে বলে আমি আনিয়ে দেব, তুমি না হয় দু আনা চার আনা করে শোধ দিও।

অন্যান্য মেয়েরা কাঠ হইয়া এই ধনগর্বিতা বৃদ্ধাটির স্পর্ধিত কথাগুলি শুনিল। কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া

একটু হাসিয়া উত্তর দিল, দোষ তো ছেলের নয় দিদি ; দোষ আমারই, আমি তো তাকে বলি নি।

নন্দর মা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, বলবে আবার কি ? কাপড়-চোপড়ের কথা মাকে বলতে হয় নাকি ছেলেকে ? আমার তো আর গায়ের কাপড়ের দুঃখু নেই ; তোরঙ্গ-ঠাসা কত রকমের কত সব কাপড়ই রয়েছে, তা সত্ত্বেও শীত পড়তে না পড়তেই তিন ছেলে তিনখানা শাল কিনে এনে দিলে। আমি বললুম—কেন বাবা তোমরা ফের কিনলে,—এক বস্তা কাপড় তো পচছে। ছেলেরা বললে, তা পচুক। তুমি আশীর্বাদ কর, আর বছর বছর নতুন পরো। এই শালখানা নন্দ দিয়েছে ; কাশ্মীর থেকে নাকি আনিয়েছে, সে বলে এক শ টাকায় পেয়েছে, নইলে বাজারে এর দাম দেড় শর কম নয়।

এত কথা বলিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু পাতিরামের মাকে আজ খাটো করিবার জন্য নন্দর মা যেন মরীয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কথা শুনিতে পরিচিতা-অপরিচিতা অনেকগুলি মেয়ে তাহাকে ইতিমধ্যে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল।

এক অপরিচিতা রমণী নন্দর মার গায়ের শালখানির প্রান্তদেশ ধরিয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিল। সে সুযোগ পাইয়া সহসা বলিয়া ফেলিল, দেখুন, আপনার এই শালের দাম যদি এক শ টাকা হয়, আর কাশ্মিরী শাল বলেই আপনার ছেলে এটা কিনে থাকেন, তা হলে তিনি ঠকেছেন।

মেয়েটির এই কথা কয়টি যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ করিল। নন্দর মা তর্জন করিয়া কহিল, তুমি কে গা বাছা, চেনো আমি কে ? আমার ছেলে ঠকে আসবে ? বলে লাটসাহেব পর্যন্ত আমার ছেলেকে খাতির করে চলে, তাকে ঠকাবে শাল বেচে ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। শাল কখনও দেখেছ চোখে যে ব্যাখ্যানা করছ ?

মেয়েটি কিন্তু দমিল না ; বেশ সপ্রতিভভাবে কহিল, আপনি খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন কেন বলুন তো ? যা আপনি বলছেন, তাই ঠিক, আর আমাদের কথা মিছে ? সাত টাকা দামের জার্মানীর শাল আপনার ছেলে যদি কাশ্মিরী বলে কিনে আনে, আর সেকথা লাটসাহেব মানে, সকলকেই যে সেটা মানতে হবে তার মানে কি ?

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়িল ; নন্দর মার মুখখানা এ কথায় এক নিমেষে যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে এবার সুর একটু নরম করিয়া কহিল, তুমি বাছা থাম ; আমি তো তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসি নি এখানে। আমি তো

জানতুম না, তুমি শাল তৈরী কর—

মেয়েটি উত্তর দিল, তৈরী না করলেও ঘাঁটাঘাঁটি করি; আমার বাবা এই শালের এজেন্ট, এর মার্কা আমার চেনা। কদিন ধরেই আপনার মুখে লাখপঞ্চাশী শুনছিলুম কিনা, তাই আজ জোঁকের মুখে নুনটুকু দিতে হল। মিছে বড়াই এমন করে আর লোকের সামনে করবেন না, তাতে আড়ালে লোকে হাসে।

মেয়েটি আর দাঁড়াইল না; হন হন করিয়া ঘাটের উপরে মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

দ্রৌপদী এই সময় কহিল, কথা কি জান দিদি, নতুন ফলটা-আশটা যেমন দেবতা-ব্রাহ্মণকে দিয়ে তবে মুখে দিতে হয়, তেমনি নতুন কাপড়-চোপড়ও তাঁদের না পরিয়ে গায়ে জড়ানো ঠিক নয়। যাই হোক, তুমি আজ মনে করিয়ে দিলে দিদি, তোমার ভাল হোক, আমি আজই ছেলেকে বলব, কালকেই আমাকে যেন গায়ের কাপড় আনিয়ে দেয়।

নন্দর মা কথাটার কোন উত্তর দিল না, তাহার মুখখানা মেঘময় হইয়া উঠিয়াছিল।

মন্দিরে পূর্বোক্ত মেয়েটির সহিত দ্রৌপদীর পুনরায় সাক্ষাৎ হইল, দেবী-দর্শনের পর উভয়েই একসঙ্গে বাহিরে আসিল।

মেয়েটি দ্রৌপদীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে তো এখানে এসে অবধি দেখছি। দিতে-থুতে আপনি খুব ভালবাসেন, না?

দ্রৌপদী সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, নিজের মুখে কিছু দিতে যেমন ভাল লাগে, তেমনই পরের হাতে কিছু দিতেও মনে ইচ্ছে হয়, কিন্তু হলে কি হবে, আসলে কিছুই পারি নে যে মা।

মেয়েটি তাহার বড় বড় চোখ দুটি উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কিন্তু যা আপনি করেন, অন্যের পক্ষে তা পর্বত। ঐ আমাকে মাগীটার কথা শুনে অবধি আমার গা যেন জ্বালা দিত। কেবল বড়মানুষী কথা, ছেলেরা কত টাকা আনে, কতগুলো চাকর-বাকর রান্না করে, কি রকম রাজভোগ খায়, কত খরচ,—বিনিয়ে বিনিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কেবল এইসব দশ জনকে শোনাবে।

দ্রৌপদী হাসিয়া বলিল, তা শোনালই বা, কি হয়েছে মা তাতে?

মেয়েটি উত্তর দিল, ঐ যে বললুম না, তাতে হাড় অবধি জ্বলে যেত রাগে। পয়সা আছে তো নিজের বাড়িতেই রাখ না বাপু, বড়মানুষ আছিস তো জাঁক করে জানিয়ে কি লাভ শুনি? আবার এমনি তাজ্জব, মুখ বুজিয়ে এই জাঁকালো কথা-

গুলো শোনবার লোকও আছে। এদিকে তো দেখি, ঘাটের পাণ্ডার হাতে রোজ তারিখে একটি আধলার বেশী বরাদ্দ নেই! ভিখিরীগুলোর পাতা কাপড়ে হাত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যে কটা চাল দেয়, তার অর্ধেক খুদ, আর গুনতিতে পঞ্চাশটা দানার বেশী হবে না। ইনি আবার ঘাটে বসে বড়মানুষি ফলান—জানাতে চান উনি কেউকেটা নন! মরণ আর কি!

দ্রৌপদী বাধা দিয়া কহিল, থাক মা থাক, কি দরকার পরের কথায়; কারুর মুখে তো আমরা হাত চাপা দিয়ে রাখতে পারি না মা!

মেয়েটি উত্তেজিত ভাবে কহিল, অন্যায় কথা বললে মুখে হাত চাপা দিতে হবেই তো! ঐ তো দেখলেন, সাত টাকার একখানা শালকে এক শ টাকার কাশ্মিরী শাল বলে বড়াই করছিল! দিলুম থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। আবার লাটসাহেবের নাম ধরে কথা বলে! তবু যদি না অন্য গুণ সব জানতুম। ফের যদি কথা কইত, দিতুম হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে।

দ্রৌপদী এবার থ হইয়া মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি কহিল, তা হলে শুনুন, সেই গুণটির কথাও বলি। ঐ তো অত বড়-মানুষি করেন; লাটসাহেব ওর ছেলেদের মেনে চলে। এদিকে রাস্তার ঐ মেচ্‌ড়ে আনাজপত্তর কেনবার সময় মাগীর কি হাতসাফাই গো। দরদস্তুরি নিয়ে ঝগড়া তো আছেই, তার ওপর চুরি, যাকে বলে—দেখ তো তোর, না দেখ তো মোর—

দ্রৌপদী বিচলিতভাবে বলিয়া উঠিল, মহাভারত! মহাভারত! আমি সব জানি মা; আরও অনেকেই জানে। কিন্তু কি দরকার মা পরচর্চায়। তোমার কিন্তু মা খুব সাহস, এমন স্পষ্ট কথা তোমার বয়সী কোন মেয়ের মুখে এ পর্যন্ত শুনি নি। তোমাদের বাড়ি কোথায় মা? নতুন এসেছ বোধ হয়?

মেয়েটি কহিল, হ্যাঁ। আমরা আগে পাঞ্জাবে থাকতুম। এখন কলকাতায় এসেছি। ঐ যে চৌমাথার ওপর হলদে রঙের বাড়িটা—ঐখানেই আমরা থাকি।

দ্রৌপদী বিস্ময়ের স্বরে কহিল, ঐ বাড়ি? ও মা, রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছি, লোকজন তো হামেশাই গিস্‌ গিস্‌ করে। সবাই বলে এক বড় মহাজন এসেছে। তা হলে তোমার বাবাই বোধ হয়—

মেয়েটি দিব্য সহজকণ্ঠে বলিল, ওদেশে আমার বাবাকে সবাই বল তো শেঠজী। এদেশে বলে,—মহাজন। কলকাতায় যত সব শাল আলোয়ানের দোকান আছে, আমার বাবা তাদের মাল যোগান দেন। শহরের ভেতরটা বড্ড ঘিঞ্জি বলে বাবা ফাঁকা দেখে এইখানেই তাঁর গদি করেছেন।

দ্রৌপদী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাবার নামটি কি মা?

মেয়েটি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা মুখখানি তুলিয়া কহিল, বাবার নাম মনসারাম, আমার নাম পার্বতী, আর আমাদের কারবারটির নাম মনসারাম পর্বতরাম?

দ্রৌপদী স্তব্ধভাবে মেয়েটির কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই মেয়েটি হাসিয়া কহিল, বাবা আমাকে ছেলেবেলা থেকে পর্বত বলে ডাকেন কিনা; আর আমি যখন বছর তিনেকের, তখনই পাঞ্জাবী শালওলাদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই এই কারবারটি ফাঁদেন। ছেলে তো নেই, অংশীদারও নেন নি, অথচ ও দেশে দু নামে কারবার ফাঁদা একটা রেওয়াজ, তাই বাবা তাঁর মেয়ে পার্বতীকে পর্বতরাম করে কারবার ফেঁদেছেন। দেখতে দেখতে কারবারটার বয়স বারো বছরের ওপর হয়ে গেল; বাবা বলেন, আমার নামের নাকি পয় আছে। শেষের কথাগুলি বলিয়াই মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দ্রৌপদী অবাক হইয়া মেয়েটির কথা শুনিতেছিল। তাহার কথা বলিবার ধরন, কাপড় পরিবার কায়দা, পাথরে কোঁদা মূর্তির মত নিখুঁত নিটোল চেহারা, আর এক পিঠ চুল—তাহার দুই চক্ষুকেও বুঝি চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। পাঞ্জাবের নাম সে শুনিয়াছে, পাঞ্জাবী পুরুষদেরও দেখিয়াছে; কিন্তু সে দেশের মেয়ে বুঝি এই প্রথম তাহার নজরে পড়িল। শুধু নজরে পড়া কেন, আলাপ পর্যন্ত হইয়া গেল। সেই সঙ্গে মনে যে সন্দেহটুকু জাগিতেছিল, তাহা বলি বলি করিয়াও সে ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না। সেই সংশয়টুকু এই যে, ইহারা কি সত্যই খাস পাঞ্জাবী, কিংবা বাঙ্গালী? বাংলা মুল্লুক হইতেও তো 'অনেকে পাঞ্জাবে গিয়া কারবার করে চাকরি-বাকরি করে, ইহারাও কি তাই?

হঠাৎ পার্বতীর কথা দ্রৌপদীর চিন্তাজাল ছিন্ন করিয়া দিল, ঐ আমাদের বাড়ি। আসবেন দয়া করে? একটু জিরিয়ে যাবেন!

দ্রৌপদী কহিল, আজ নয় মা, আর এক দিন আসব। ছেলে বেরুবে কিনা, আমি না গেলে—

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়ি এখান থেকে কত দূর হবে?

দ্রৌপদী কহিল, আরও খানিকটা যেতে হবে মা। নিকিরিপাড়ায় আমরা থাকি।

কথায় কথায় ইহারা চৌরাস্তার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছিল। এখানটা খুব

গুলজার। রাস্তার উপরেই হরিদ্রাবর্ণের বাড়িখানা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। বাড়িখানার সম্মুখেই কয়েকখানা বাড়ির গাড়ি সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাস্তার উপরেই সামনের প্রকাণ্ড ঘরখানির ভিতর বহুলোকের ভিড়।

বাড়ির ভিতরে যাবার পথটি ছিল স্বতন্ত্র। বড় রাস্তার উপরে ফুটপাথটির ধার দিয়া ছোট গলিটি সেখানে গিয়া মিশিয়াছে।

পার্বতী গলির পথে পা বাড়াইয়া কহিল, কাল কিন্তু আসা চাই, ছেলেকে বলে আসবেন—যেতে একটু দেরি হবে।

দ্রৌপদী হাসিয়া কহিল, তাই হবে মা।

পাতিরাম বাড়িতে মায়েরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। মায়ের অনুমতি ও সেই সঙ্গে পদধূলি না লইয়া সে কদাপি বাড়ির বাহির হয় না। মাকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে এত দেরি হল মা?

দ্রৌপদী ঘাটের কথা সংক্ষেপে বলিয়া আবদারের সুরে ছেলেকে জানাইল, আমি নন্দর মাকে বলেছি বাবা, শীত যখন সত্যিই পড়েছে, ছেলেকে বলব কালই যেন আমাকে গায়ের কাপড় পরায়।

কথাটা বলিয়াই সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ উপলব্ধি করিতে ছেলের বিলম্ব হইল না। সেও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ঠিক জবাবই তুমি দিয়েছ মা, তুমি তো বড়লোকের মা নও, গরীব ছেলের মা, সেই হালেই কাল গায়ের কাপড় গায়ে দেবে, যাতে সত্যি সত্যিই শীত ভাঙে।

দ্রৌপদী প্রসন্ন দৃষ্টি ছেলের মুখের উপর ফেলিয়া কহিল, হ্যাঁ, ঐ যে মেয়েটির কথা বলছিলুম, যে নন্দর মার গায়ের শালখানার ভুল ভেঙে দিলে, তার বাবা নাকি খুব বড় কারবারী, শাল র‍্যাপার দোলাই সব তৈরী করায়। ঐ যে বাজারের চৌমাথায় হলদে রঙের বাড়ি, ঐখানেই ওরা নতুন এসেছে। বাড়ির সামনে বাবা কত যে গাড়ি, আর বাইরের ঘরে কত লোকজন, কি আর বলব—

পাতিরাম কহিল, আমি জানি মা, ওদের মস্ত বড় কারবার।

দ্রৌপদী আগ্রহের সুরে কহিল, তুমি জান তা হলে? আচ্ছা বাবা, ওরা বাঙালী না পাঞ্জাবী? মেয়েটির কথাবার্তা সবই বাঙালীর মত, কিন্তু কাপড় পরার কায়দা আর চেহারা দেখলে মনে হয় যেন পাঞ্জাবী।

পাতিরাম হাসিমুখে জানাইল, না মা, শুনেছি ওরা বাঙালী; তবে অনেক দিন পাঞ্জাবে থেকে, আদবকায়দা পাঞ্জাবীদের মতই হয়ে থাকবে। এখন পায়ের ধুলো দাও মা, বেলা হয়ে গেল—

পাতিরাম গড় হইয়া মায়ের দুই পায়ের ধূলি লইয়া মাথায় দিল, দেবতার দ্বারে ভক্ত যেভাবে মাথা ঠেকাইয়া ইষ্ট কামনা করে, সেইরূপ নিষ্ঠা সহকারেই পাতিরাম মায়ের নিকট আশীর্বাদ চাহিল।

মা ছেলের চিবুক স্পর্শ করিয়া কহিল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক বাবা! এসো।

পরদিন প্রত্যূষে নিত্যনিয়মিত স্নানার্থিনীরা সকলেই ঘাটে উপস্থিত। স্নানের সঙ্গে গল্প ও বিবিধ আলোচনার অন্ত নাই। পূর্বদিন পার্বতীর নিকট রীতিমত অপদস্থ হইয়াও নন্দর মার চৈতন্য হয় নাই। এই শ্রেণীর মেয়েদের অহমিকা বুদ্ধি-বৃত্তিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, নিজের তালপ্রমাণ দোষত্রুটি ইহারা উপলব্ধি করিতে পারে না, পরের তিলপ্রমাণ ত্রুটিকেই তালে পরিণত করিতে চাহে। সুতরাং এদিনেও নন্দর মা পাতিরামের মা ও পার্বতীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কথাই তাহার সঙ্গিনীদিগকে শুনাইতেছিল। কথাগুলি এপক্ষের কানে আসিয়া বাজিলেও পার্বতী শুধু এক-এক বার নিরুত্তরে সেদিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু এই হাসি বুঝি নন্দর মার গায়ে তীরের ফলার মত বিঁধিতেছিল।

ঘাটের সিঁড়ির উপরে সুপ্রশস্ত চৌতারাটির এক ধারে দুই ব্যক্তি কাপড়ে বাঁধা দুইটি গাঁটরি লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল। কাপড় ছাড়িয়া দ্রৌপদী ও পার্বতী চৌতারায় আসিয়া দাঁড়াইতেই, নন্দর মা মুখখানা মচ্‌কাইয়াই একটা অঙ্গুলি হেলাইয়া উভয়কে নির্দেশ করিয়া কহিল, দেখ্‌না চেয়ে—মানিকজোড়।

কথাটা পার্বতীর কানে গেল। সে তখন গলার স্বর একটু উঁচু করিয়া কহিল,—আপনারা সকলে দেখুন, পাতিরামবাবুর মা আজ শীতের কাপড় গায়ে দেবেন!

যদিও কথায় কথায় এই প্রসঙ্গ কাল উঠিয়াছিল, কিন্তু কথাটা বোধ হয় সকলের মনে ছিল না। কিংবা ইহাতে কোনরূপ গুরুত্ব আছে এমন কথাও কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পার্বতীর এই ঘোষণা সকলকেই যেন এক লহমায় এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিল। অনেকগুলি কৌতূহলী চক্ষু চঞ্চল হইয়া চাতালের দিকে পড়িল।

পার্বতীর কথায় দ্রৌপদীর মুখখানা লজ্জায় বিবর্ণ হইয়া গেল; লোক দেখাইয়া কোন কিছু সৎকর্ম করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে চাপা স্বরে পার্বতীর দিকে চাহিয়া কহিল, ছি, মা! ওকথা বললে দেমাক দেখানো হয়।—দাও তো মা দুখানা কাপড়, আগে মন্দিরে দিয়ে আসি।

কাপড়ের বস্তা আগলাইয়া যে দুইটি লোক বসিয়াছিল, দ্রৌপদী ও পার্বতীকে দেখিয়াই তাহারা প্রস্তুত হইতেছিল। পার্বতীর নির্দেশ মত দুইখানি শাল তাহার

হাতে দিল। সকলেই দেখিল, নন্দর মা যে শাল গায়ে জড়াইয়াছে, এই দুইখানি শালের পাড়, আঁচলা ও কারুকার্য অবিকল সেই রকম। শাল দুইখানি লইয়া দ্রৌপদী মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল।

পার্বতী ঘাটের সকলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ দুখানা আগাম নিয়ে গেলেন মন্দিরে—মন্দিরের ঠাকুর আর পুরুত ঠাকুরের জন্যে। আর এইগুলো এনেছেন ঘাটের পাণ্ডা ঠাকুরদের জন্যে। এদের গায়ে পরিয়ে দেবেন বলে। তার পর, ঘাটের ধারে যতগুলো ভিখিরী দেবতা উদম গায়ে বসে শীতে হি হি করে কাঁপছে, এগুলো উঠবে তাদের গায়ে।

ঘাটসুদ্ধ সকলেই পার্বতীর মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া কথাগুলি শুনিতেছিল। এমন অদ্ভুত কথা কেহ কি কখনও শুনিয়াছে? এমন করিয়া শীতের কাপড় গায়ে দেওয়া কেহ কি কখনও দেখিয়াছে? ইহা সত্য না স্বপ্ন!

দ্রৌপদী যখন মন্দির হইতে বাহিরে আসিল, মন্দিরের ভিতর হইতে তাহার উদ্দেশ্যে পুরোহিতের জয়ধ্বনি ঘাটেও ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই পার্বতী কহিল, এবার আপনি বাছা শীতের কাপড়গুলো ভাল করেই গায়ে দিন—

অর্ধ ঘণ্টার মধ্যেই যখন বস্তা দুইটি নিঃশেষ হইয়া গেল, একই পর্যায়ের কারুকার্যখচিত পশমীনা শালগুলি ঘাটের সকল পাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্নিহিত প্রায় পঞ্চাশটি ভিক্ষাজীবীর গায়ে উঠিল, তখন দ্রৌপদীর গায়ে দিতে একখানিও অবশিষ্ট ছিল না।

পার্বতী অপূর্ব ভঙ্গিতে পুরস্ত গণ্ডদেশে অঙ্গুষ্ঠটি ঠেকাইয়া কহিয়া উঠিল, অ-মা, সব শাল যে ফুরিয়ে গেল পান্তিরামের মা, আপনি কি গায়ে দেবেন বলুন তো? সেই আঁচলই আপনার সার হল বাছা!

দ্রৌপদী ভাব-গদগদ স্বরে উত্তর দিল, মেয়েদের শীত কাটাবার এই তো আসল কাপড় মা!

বহু কণ্ঠের ধ্বনি উঠিল, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা, জয়জয়কার হোক—ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করুন।

পার্বতী কহিল, বড়মানুষির দ্যামাক যারা করে, তারা আজ দেখে শিখুক সত্যিকারের বড়লোক কাকে বলে। নিজে খেলে আর পরলে বড়মানুষি করা হয় না; বড়মানুষি দেখালেন পান্তিরামের মা।

নন্দর মা মুখখানা কালো করিয়া চাকরকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার মুখে আর কথা নাই।

॥ পনেরো ॥

হেড অফিসে পাতিরামের খাস কামরায় সীতানাথ তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনেকগুলি খবর সে সংগ্রহ করিয়াছে এবং কতকগুলি খবর আপনা হইতেই আসিয়াছে। অবিলম্বে যথাবিহিত আলোচনা প্রয়োজন।

ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নির্দিষ্ট সময়েই প্রত্যহ পাতিরাম তাহার খাস কামরায় আসিয়া বসে। বিভিন্ন প্রয়োজন লইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উমেদার সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

এদিন প্রায় আধঘণ্টা দেরি করিয়া পাতিরাম অফিসে ঢুকিল। ঘরের সম্মুখে বৃহৎ বারান্দাটির উপর সারিবন্দী বেঞ্চিগুলির উপর বসিয়া প্রার্থীরা আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী পার হইয়া পাতিরামকে বারান্দায় আসিতে দেখিয়াই তাহারা ধড়মড় করিয়া এক সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই ত্রস্ত, সশ্রদ্ধ ও নতমস্তক।

মাথা একটু হেলাইয়া সকলের শ্রদ্ধা অভিবাদনের নীরব প্রত্যুত্তর দিয়া পাতিরাম তাহার খাস কামরায় ঢুকিয়াছে। সীতানাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, দেরি দেখে আমি ভারী ভাবছিলুম।

পাতিরাম তাহার চেয়ারে বসিয়া, গায়ের মোটা চাদরখানা পিঠের দিকে রাখিয়া বলিল, শীত পড়েছে কিনা, মা আজ গরম কাঁপড পরালেন, তাই দেরি হয়ে গেল। মার কাজের জন্য দেরি যদি হয়, তাতে আফসোস নেই। যাক, কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো ; অনেকগুলো লোক বসে আছে দেখলুম।

সীতানাথ বলিল, টালিগঞ্জে যে তীরটা তাগ্ করে ছুঁড়েছিলুম, লেগে গেছে!

পাতিরামের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, দরখাস্ত করেছে বুঝি?

সীতানাথ উত্তর দিল, দরখাস্ত নিয়ে নিজেই হাজির হয়েছে।

—কে, শ্রীবাস বিশ্বাস?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেই এসেছে। যেটুকু খবর ওদের সম্বন্ধে পেয়েছিলুম, সবই

সত্যি। সংসারটি ছোট হলেও কষ্টের অন্ত নেই; ছেলে পড়িয়ে যা পায়, তাই সম্বল; দু বেলার সংস্থানও হয় না।

পাতিরাম মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, আচ্ছা, কার্ডখানা রাখো, এর পর ভাবা যাবে।

অতঃপর পাতিরামের কাজ আরম্ভ হইল। আফিস, ব্যবসায় বা কার্য সম্পর্কে প্রত্যহ বহুলোকই হেড অফিসে আসিয়া থাকে। অফিসে লোকজন থাকা সত্ত্বেও পাতিরাম নিজে তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যথাযথ নির্দেশ প্রদান করে। ইহাই তাহার বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা। এক-এক জন সাক্ষাৎপ্রার্থীকে ডাকিয়া—অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার বক্তব্য শুনিয়া—সে সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা প্রদান সম্পর্কে পাতিরামের দক্ষতা অসাধারণ। এদিনও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অন্যান্য সকলের সহিত কথাবার্তার পর সর্বশেষে পাতিরামের খাস কামরায় যাহার ডাক পড়িল, তাহার নাম শ্রীবাস বিশ্বাস।

সুগঠিত উন্নত দেহ, শ্রীমান, তরুণ যুবা; মুখখানির উপর সহসা দৃষ্টি পড়িলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে এবং মনে হয় বুঝি এখনও তাহাতে কোনরূপ অনাচারের কালিমা পড়ে নাই। দুই চক্ষু আয়ত, মাথার চুলগুলি এমন ছোট করিয়া ছাঁটা যে, চিরুনি তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার সুযোগটুকুও পায় নাই। গায়ের কামিজ ও পরনের কাপড়খানি দেখিলেই মনে হয়, সেগুলি বহুদিন রজকের ভাঁটিতে ওঠে নাই, বাড়িতেই কাচিয়া সাফ করা হইয়াছে; অথচ ইহাতেই বেশ পরিচ্ছন্নতা ও ছেলেটির রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইহার আপাদমস্তক দেখিয়াই পাতিরাম মনে মনে এই সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিয়া লইল।

অতঃপর মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া পাতিরাম প্রথমেই প্রশ্ন করিল, তোমারই নাম শ্রীবাস বিশ্বাস?

বিনীত কণ্ঠে শ্রীবাস উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জাতি?

—পরামানিক।

—বাপের নাম?

—৺চিনিবাস পরামানিক।

—পেশা?

শ্রীবাস অসঙ্কোচেই উত্তর দিল, পৈতৃক পেশা ক্ষৌরকার্যই বলতে হয়। কিন্তু বাবার সঙ্গে সঙ্গে সে পাট উঠে গেছে। তিনি আমাকে কলেজে পড়ান, জাতিগত

পেশাটা শেখান নি। তাই না আজ একূল-ওকূল দুকূল হারিয়ে বেকার হয়ে বসে আছি স্যার।

—লেখাপড়া কতদূর করেছ?

—বি. এ. পর্যন্ত পড়েছি, কিন্তু পাশ করতে পারি নি।

—বিবাহ করেছ?

—আজ্ঞে না।

—সংসারে কে কে আছে?

—এক বিধবা পিসী, আর দুটি ছোট ছোট বোন। এদের নিয়েই সংসার।

—কি করে সংসার চলছে?

—ছেলে পড়িয়ে গুটি দশেক টাকা পাই, তাতেই কোনরকমে এক বেলা চলে যায়, বাড়িখানা নিজেদের, খোলার বাড়ি, তার দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে ট্যাক্সটা কোনরকমে ওঠে।

পাতিরামের মুখটা সহসা যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কোমল কণ্ঠে কহিল, তুমি যে কিছু ভাঁড়িয়ে বা রেখেঢেকে কথাগুলো বল নি, এতে আমি খুশী হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে আমার বনিবনাও হবে, তোমাকে দিয়ে কাজ আমার ঠিক চলবে, যাক, এখন কি পেলে তোমার পোষাবে শুনি?

শ্রীবাস কহিল, দেখুন স্যার, বড কষ্টেই মানুষ হয়েছি। বাবা যে কি করে আমাকে এত দূর লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সেটা যখন ভাবি চমকে উঠি, আর তখনই মনটা মুচড়ে যায়—লেখাপড়া শিখেও কিছু করতে পারি নি, বাবার কষ্ট ঘোচাবার সুযোগ পাই নি এই ভেবে। তিনি যখন চলে গেছেন, আর সংসারটা একরকম করে চলে যাচ্ছে, তখন খাঁই আমার বেশী নেই। আমার যতটুকু বিদ্যা আর ক্ষমতা—তাই দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার কাজ আমি করব! আমার কাজ-কর্ম ও যোগ্যতা দেখে আপনি হাত তুলে যা দেবেন, আমি তাই হাসি মুখেই নেব।

পাতিরাম কহিল, স্পষ্ট কথাই তুমি বলেছ শ্রীবাস, বেশ, আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি, যদি তুমি তোমার ঐ কথাগুলো ঠিক বজায় রাখতে পার—তা হলে তোমার সংসার সম্বন্ধে কিছুই তোমাকে ভাবতে হবে না। সমস্ত ভারই আমি নেব। শুধু তাই নয়, তোমার ভাগ্যোদয়ও যাতে হয়, সে চেষ্টাও আমি করব।

চাকুরির দরখাস্ত লইয়া কত জায়গাতেই শ্রীবাস গিয়াছে, কত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে, কত কথোপকথন হইয়াছে, কিন্তু এমন আন্তরিকতার সহিত কেহ তাহার সহিত কথা কহে নাই এবং এমন আশ্বাসও কেহ তাহাকে দেয় নাই। সে

অবাক হইয়াই এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পাতিরাম অতঃপর কহিল, আজ থেকেই তুমি কাজে বসে যাও, সীতানাথ পরে তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে। আর যাবার সময় ক্যাশ থেকে আগাম পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে যাবে। উপস্থিত যেসব খরচপত্র সেগুলো ওতে সেরে নেবে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শ্রীবাস কহিল, স্যার, এ যে আমার পক্ষে—

আনন্দের আবেগে তাহার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন ও কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল।

পাতিরাম সহজকণ্ঠে কহিল, তোমার প্রয়োজন বুঝেই এই ব্যবস্থা আমাকে করতে হল হে। পেছনে অভাব থাকলে কাজ করবে কেমন করে? তাতে যে আমারই ক্ষতি হবে।

সীতানাথ এই সময় প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, আসুন শ্রীবাস-বাবু। আপনার বসবার জায়গাটা দেখিয়ে দিই।

শ্রীবাস যুক্তকরে এই সম্মানভাজন সদাশয় ব্যক্তিটিকে শ্রদ্ধাভিবাদন জানাইয়া সীতানাথের অনুগমন করিল।

সেদিন একটু বেলাবেলি পাতিরাম অফিস হইতে ফিরিল এবং ফিরিবার পথে মনসারাম পর্বতরামের গদির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়িতে এক পশ্চিমা দারোয়ান বসিয়াছিল, পাতিরামকে দেখিয়াই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেলাম বাজাইল। এক সঙ্গে অনেকগুলি শাল খরিদ সম্পর্কে সে এই বড় দরের খরিদ্দার-টিকে চিনিতে পারিয়াছিল।

পাতিরাম প্রশ্ন করিল, মনসারামবাবু বাড়ি আছেন?

দারোয়ান জানাইল, তিনি বড়বাজারে গেছেন। আপনার কিছু কাজ আছে কি?

পাতিরাম কহিল, কিছু লেনদেনের ব্যাপার আছে।

দারোয়ান সসম্মানে কহিল, বাবু না থাকলেও কাজ আটকাবে না। আপনি বসুন।

দারোয়ান তাড়াতাড়ি গদিঘরের দরজা খুলিয়া তাহাকে বসিবার অনুরোধ জানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ঘরখানি ছোট হইলেও দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘর জোড়া একখানা পুরু ফরাস বিছানো, তাহার উপর মোটা মোটা তাকিয়া, একধারে সুদৃশ্য ডেস্ক, তাহার দক্ষিণে দেওয়াল সংলগ্ন একটি সুশ্রী আয়রন চেস্ট। ডেস্কটির সম্মুখে একখানি

কার্পেটের আসন আস্তৃত। সেটি যেন গদির মালিকের বসিবার স্থানটুকু নির্দেশ করিয়া দিতেছে। দেওয়ালে কয়েকখানি ছবি, প্রত্যেকটি ছবিতেই পুরাণ-বর্ণিত দেব-দেবীর লীলা রূপায়িত। ভিতরের দরজাটির উপর একখানা রঙিন পর্দা টাঙানো। ফরাসের উপর বসিয়া পাতিরাম এই ক্ষুদ্র গদি ঘরখানির রূপসজ্জা দেখিতে লাগিল। আগের দিন কিছুক্ষণের জন্য পাতিরাম এই ঘরে আসিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তখন একই ধরনের ও দামের অনেকগুলি শাল পছন্দ করিতে তাহার নিপুণ দৃষ্টি তাহাদের ব্যাপারীর দিকেই নিবদ্ধ ছিল।

শীতবস্ত্রের ব্যাপারে পাতিরামের কোন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, পাতিরাম সে সময় তাহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এই গদীর মালিক মনসারামের মুখখানার উপর নিবদ্ধ করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, লোকটির উপর অনায়াসেই নির্ভর করা চলে এবং ইহার সহিত ব্যাপারে সে ঠকিবে না। তাই সে সময় কোন দরদস্তুরি না করিয়াই শুধু নিজের অভিপ্রায়টুকু জানাইয়া মনসারামের হাতে এক শ টাকার পাঁচখানি নোট সে অগ্রিম প্রদান করে। মনসারাম তাহার রসিদ দিতে চাহিলে পাতিরাম ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, কোন দরকার নেই, সব টাকাই তো আমি চুকিয়ে দিচ্ছি না। কাল সকলেই আপনি বাটখানি কাপড় গঙ্গার ঘাটে আপনার লোক দিয়ে পাঠাবেন; রঙে বা ডিজাইনে এদিক ওদিক হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু দামটি আর কোয়ালিটি সমান হওয়া চাই। আপনি বিলটা করে রাখবেন, কাল বিকেলে আফিসের পান্টা বাকি টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে যাব।

শীতবস্ত্রের সেই হিসাবটি মিলাইতেই পাতিরাম মনসারামের গদিতে আসিয়াছে। অফিসে যাইবার সময় মায়ের মুখেই সে শুনিয়াছে যে, মনসারাম তাহার ফরমাস মত মাল ঠিক সময়েই সরবরাহ করিয়াছে। মনসারামের মেয়ে পার্বতী নিজেই দুই জন লোকের মাথায় চাপাইয়া শীতবস্ত্রের দুইটি গাঁটরি গঙ্গার ঘাটে লইয়া যায়। কাপড়গুলি দেখিয়া ঘাটসুদ্ধ সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছে। একবাক্যে সকলেই বলিয়াছে—এমনটি তাহারা কখনও দেখে নাই। কাপড়গুলির দাম লইয়াও ঘাটে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছে। কাহারও মতে এমন কাজ করা শাল বারো-চোদ্দ টাকার কমে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করে যে, যদিও সুবিধায় লাট কিনেছে, তা হলেও আট-দশ টাকার কমে এ জিনিস জন্মায় না। তার ওপর যারা বেচেছে—লাভ তো নিয়েছে ইত্যাদি।

পাতিরাম হাসিমুখে মাকে শুধু প্রশ্ন করে, লোকের কথা থাক, তুমি খুশী হয়েছ কিনা তাই বল?

মা গদগদ স্বরে উত্তর দিল, এর জবাব মুখে আমি কি দেব বল, যদি সে সময় গঙ্গার ঘাটে যেতিস বাবা, তা হলে নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারতিস্, কি রকম ঘটা করে তোর মা গরম কাপড় গায়ে দিয়েছে। তুই তো এক দিন শীতের কাপড় আমাকে পরালি পতা, কিন্তু এর দৌলতে সাত জন্ম আমাকে আর শীতের ভাবনা ভাবতে হবে না। আর এই আশীর্বাদ করি বাবা, ভগবান যেন জন্ম জন্ম এমনি করে বিলিয়ে দেবার দৌলত আর মন তোকে দেন।

অর্ডার লইবার সময় মনসারাম পাতিরামকে বলিয়াছিল, আপনার অভিপ্রায় আমি বুঝেছি, কাপড় আমি সেইভাবেই পছন্দ করে দেব, আপনি শুধু দামের একটা আভাস দিয়ে যান।

পাতিরাম তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, কাপড় বড়-চড়ে হবে, চার ধারে সমান কাজ থাকবে, আর শীত ভাঙবে। তার জন্য ফর্দ প্রতি দশ টাকা পর্যন্ত দিতেও আমার আপত্তি নেই।

মায়ের মুখে লোকের প্রশংসা শুনিয়া দাম সম্বন্ধে তাহাদের অনুমানের আভাস পাইয়া পাতিরাম বুঝিয়াছিল যে, মায়ের শীতের কাপড় পরিবার এই উৎসবে তাহাকে অন্তত আরও শত মুদ্রা মনসারামের গদিতে দাখিল করিতে হইবে। হিসাবটি পরিষ্কার করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছিল। কলিকাতা মহানগরীর বুকের উপর বসিয়া বরাবরই পাতিরাম পাওনাদারের মর্যাদা ভোগ করিয়া আসিতেছে, অপর কেহ তাহার পাওনাদার হইবার স্পর্ধা রাখে—এ চিন্তাও পাতি-রামের পক্ষে অসহ্য। সুতরাং কাপড়ের হিসাবটি মিটাইবার পক্ষে তাহার এই তৎপরতা স্বাভাবিক।

ভিতরের দিকের পর্দাটি হঠাৎ দুলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই তাহার ভিতর হইতে এক অপরিচিত তরুণীকে ফরাসের উপর উঠিতে দেখিয়া পাতিরাম একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। তরুণী কিন্তু দিব্যি সপ্রতিভভাবে কোমল করপল্লব দুটি যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইয়া হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, আপনিই বোধ হয় পাতিরামবাবু?

পাতিরাম অবাক! কক্ষমধ্যে সহসা যে এভাবে অপরিচিতা তরুণীর আবির্ভাব হইবে ও তাহার উদ্দেশ্যে এরূপ প্রশ্ন উঠিবে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া যে লোক কোনদিন চিত্তগত সঙ্কোচকে বা শরমকে প্রশ্রয় দেয় নাই এবং নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া কখনও যাহার পদস্খলন হয় নাই, কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কে অধিকক্ষণ অভিভূত

থাকাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং প্রাথমিক সঙ্কোচ টুকু লেসব কাটাইয়া পাতিরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রতি-নমস্কার জানাইয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম পাতিরাম পাকড়ে।

মৃদু হাসিয়া তরুণী কহিল, আপনি উঠলেন কেন, বসুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ডেস্কের সম্মুখে আস্তৃত কার্পেটের আসনখানির উপর বসিয়া পড়িল; অগত্যা পাতিরামকেও নিরুত্তরে আসন গ্রহণ করিতে হইল।

অতঃপর তরুণীর সপ্রশ্ন দৃষ্টি পাতিরামের উপর পড়িতেই সে মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, মনসারামবাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যই আমি এসেছিলাম।

তরুণী কহিল, বাবা আপনাকে আসতে বলেছিলেন আমি তা জানি। আপনার আসবার একটু আগেই একটা জরুরী বরাত পেয়ে বড়বাজারে তাঁকে যেতে হয়েছে। কিন্তু তিনি না থাকলেও আপনার কাজ আটকাবে না।

পাতিরাম বুঝিল তরুণী মনসারামের কন্যা। ইহার নিকটেই সে হিসাব রাখিয়া গিয়াছে। কতকটা আশ্বস্ত হইয়া পাতিরাম কহিল, বেশ, তা হলে আমার কাজটি আপনি মিটিয়ে দিন। সকালের কাপড়ের হিসেবে আমাকে আর কত টাকা দিতে হবে বলুন তো?

পার্বতী মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, দু শ টাকা।

পাতিরাম তৎক্ষণাৎ মণিব্যাগ হইতে এক শত টাকার দুই কেতা নোট বাহির করিয়া পার্বতীর দিকে আগাইয়া দিল।

পার্বতী এবার ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, দেবার পালা এবার আমাদের, আপনার নয়। দু শ টাকা আপনিই ফেরত পাবেন আমাদের কাছ থেকে।

আঁচলে বাঁধা দীর্ঘ চাবিটি দিয়া ক্ষিপ্র হস্তে পার্বতী লোহার সিন্দুকটি খুলিয়া খামে মোড়া একটা পুলিন্দা বাহির করিল ও উপরে লেখা নামটি পড়িয়া পাতিরাম যে স্থানে তাহার নোট দুইখানি রাখিয়া বিস্ময়াভিভূতভাবে চাহিয়াছিল—একটু ঝুঁকিয়া সেইখানেই নিক্ষেপ করিল।

পাতিরাম খামখানি তুলিয়া দেখিল, উপরে বাংলা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—পাতিরামবাবুর হিসাব।

খামখানি খুলিতেই একশত টাকার দুইখানি নোট ও তৎসহ এক টুকরা বাদামী কাগজে লিখা ফর্দ বাহির হইয়া পড়িল। ফর্দে পাতিরাম পাকড়ের নামে পাঁচ শত টাকা জমা এবং ষাট ফর্দী শালের মূল্য পাঁচ টাকা হিসাবে তিন শত টাকা খরচ লিখিয়া বক্রী দুই শত টাকা ফেরত দিবার নির্দেশ আছে।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরাম পার্বতীর দিকে চাহিল। কত লোকের সহিত সে লেনদেন করিয়াছে, কত বিভিন্ন প্রকারের ক্রয়বিক্রয়ও হইয়াছে, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা তাহার কর্মজীবনে কদাচ ঘটে নাই! হিসাবের এতটা তারতম্য কি কখনও সম্ভব, অথবা, মেয়েটি তাহার সহিত রহস্য করিতেছে?

বিস্ময়ের স্বরে পাতিরাম কহিল, অদ্ভুত ব্যাপার তো। আমাকে আরও অন্তত শ খানেক টাকা দিতে হবে ভেবে আমি তৈরী হয়েই এসেছিলুম, এখন আপনারাই দু শো টাকা ফেরত দিচ্ছেন আমাকে? ফর্দে ভুল নেই তো? এতটা ফারাক কি করে হতে পারে তা তো ভেবে পাচ্ছি নে।

পার্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, কাকের মাংস কাকে খায় না—একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আপনিও ব্যবসাদার, আমরাও ব্যবসা করে খাই। তা ছাড়া আপনার মাকে যেরকম ঘটা করে শীতের কাপড় আপনি পরিয়েছেন, আমরা সেটা সরবরাহ করতে পঞ্চাশ পার্সেণ্ট লাভের লোভটুকু যদি ছেড়ে দিয়ে থাকি, তাতে বিস্ময়ের কি থাকতে পারে পাতিরামবাবু?

পাতিরাম স্তব্ধভাবে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা কহিল, বুঝেছি, এ কাণ্ড আপনার। এখন মনে হচ্ছে, আমার মা আপনারই প্রশংসায় শতমুখ হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করতে বসে আর আমার মায়ের সংস্পর্শে এসে আপনারা এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এটা আমার আদৌ ইচ্ছা নয়।

পার্বতী কহিল, ক্ষতি আমাদের হয় নি পাতিরামবাবু! কেন আপনি এত উতলা হচ্ছেন? আসলে আমাদের হাত মোটেই পড়ে নি এ আপনি স্থির জানবেন।

পাতিরাম কহিল, মায়ের মুখে শুনেছি, যে কাপড় আপনারা দিয়েছেন, ঘাটের লোকজন তা দেখে বলেছে,—কোনটিই বারো টাকার কম নয়।

পার্বতী কহিল, এই জন্যেই তো পাঞ্জাবীরা এসে বাংলার পয়সা এত সহজে লুটে নিয়ে যাচ্ছে পাতিরামবাবু! এসব কাপড় ঠিক পাঞ্জাবে জন্মায় না, জার্মানী থেকে আসে। কিন্তু পাঞ্জাবীরা এমন কায়দা করে এর ব্যাপার চালিয়ে আসছে যে এর আসল শাঁসটুকু শুষে পাঞ্জাবের লোক, আর ছোবড়াগুলো চিবোয় কলকাতার কারবারীরা।

পাতিরাম প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল, কেন, কলকাতার দোকানদারদের ভেতর অনেকেই তো আজকাল জানাচ্ছেন, পাঞ্জাবে তাদের যে ফ্যাক্টরী আছে, সেই ফ্যাক্টরীর তৈরী মাল তারা বেচেন, তবে?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া পার্বতী উত্তর দিল, তারা দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছেন।

ফ্যাকটরীর কথা মিছে ; তবে কেউ কেউ এক-আধখানা কামরা ভাড়া করে তাতে এক এক সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছেন। কালে-ভদ্রে কখনও আসেন, সেখানে থেকে মালপত্র গস্ত করেন এই পর্যন্ত ! তাতে তাদেরও পেট ভরে না, আর বাংলার লোকের অভাবও ঘোচে না। অথচ বছরে যে কোটি কোটি টাকার শীতের কাপড় বিক্রি হয়, তার পৌনে-ষোল আনা গ্রাহক এই বাংলার লোক। কিন্তু এখন লাভের ব্যবসায়টির হাড়হদ্দ জানবার জন্য কজন বাঙালীর ঝোঁক আছে বলতে পারেন ?

পাতিরাম স্তব্ধভাবেই এই অদ্ভুত মেয়েটির মুখের কথা শুনিতেছিল। ব্যবসায় সম্পর্কে যে সকল কথা তাহার মত ঝানু ব্যবসায়ীর পক্ষেও অভিনব, কথা-প্রসঙ্গে এই মেয়েটিকে তাহারই রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে দেখিয়া সে একেবারে অভি-ভূত হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, এখনও তাহার শিখিবার ও আয়ত্ত করিবার অনেক কিছু আছে। সে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিল, বাঙালী এখনও ব্যবসার ক্ষেত্রে কতটা পিছাইয়া রহিয়াছে। সত্যিই তো, প্রতি বৎসর বাঙালী কোটি কোটি টাকার শীতের কাপড় কিনিয়া শীত নিবারণ করে। কিন্তু এই কাপড়ের ব্যাপারে তাহারা একেবারে অনভিজ্ঞ। বালিকার প্রত্যেক কথাটি কি কঠোর সত্যে অনুরঞ্জিত !

পাতিরাম এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, আপনার কথাগুলি খুবই সত্য। আমরা না পড়েই পণ্ডিত হতে চাই, সব বিষয়েই আমরা ওস্তাদ হয়েছি বলে গর্ব করি। এতে ভিন্ন দেশের লোক আমাদের আহাম্মুকি দেখে হাসে, আর আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে কাজ গুছোয়। তার দৃষ্টান্ত তো আপনি হাতে হাতেই দেখিয়ে দিলেন। তবুও আমার বুকখানা এই ভেবে গর্বে ফুলে উঠছে যে, অন্তত একজন বাঙালীও পাঞ্জাবে গিয়ে এই ব্যবসাটির কলকাঠি বুঝে নিতে পেরেছেন।

পার্বতী কহিল, কিন্তু এই কলকাঠিটি হাতাবার জন্য আমার বাবাকে যে কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে—কত বাধাবিঘ্ন উপদ্রবের ভেতর দিয়ে যে তিনি মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন, সে সব বলতে গেলে এমন কত ঘণ্টাই কেটে যাবে। আজ তো বাবার এই কারবার দেখছেন, কিন্তু তাঁর ব্যবসার হাতেখড়ি—মাছ-বিক্রি।

—মাছ-বিক্রি ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাড়ি ছিল বসিরহাটে। বাবা আমার বরাবরই এক-গুঁয়ে, জ্ঞাতিদের সঙ্গে তাঁর বন তো না ; শেষে তারা একজোট হয়ে বাবাকে এক-

ঘরে করে। বাবা তখন রাগ করে আমার মাকে নিয়ে বরাবর অমৃতসরে চলে যান ভাগ্য ফেরাতে। মার গায়ে কিছু গয়না ছিল, সেগুলো বেচে তিনি সেখানে মাছের দোকান করেন। পোনা মাছ সস্তায় কিনে তাই কেটে ব্যাসম মাখিয়ে বেচতেন। মা অবশ্য সব যোগান দিতেন। ব্যাসমে ভাজা মাছ চড়া দামে পাঞ্জাবীরা কিনে খেত, রোজ এত কাটতি হত যে শেষ পর্যন্ত অনেকে ফিরে যেতো। যখন এই মাছভাজার ব্যবসা চলছিল, তখনও আমি জন্মাই নি। শুনেছি, বাবার ব্যবসার উন্নতি দেখে পাঞ্জাবীরা দল পাকাতে শুরু করে। এক জন পাঞ্জাবীকে দিয়ে তারাও ঠিক ঐ ধরনের এক দোকান খুলে ফেলে। তার দোকান খুলতেই বাবার দোকান বন্ধ হয়ে গেল। বাবার মাথায়ও রোখ চেপে বসল,—লোকসানের পথে না গিয়ে অন্য রাস্তায় নেমে এর পাল্টা জবাব দিতে কোমর বাঁধলেন। পাঞ্জাবে থাকতেই বাবা ওদের ভাষাটা শিখেছিলেন। দোকানপাট তুলে দিয়ে পেটের দায় জানিয়ে এক শালওয়ালার দোকানে চাকরি নিলেন। এই শালওয়ালা এক সময়ে বাবার মাছের দোকানের এক জন বড় রকমের গ্রাহক ছিলেন, আর ইনিই দল পাকিয়ে নিজের লোককে মাছের দোকান খুলে দিয়ে বাবার দোকানটি তুলে দেবার উপলক্ষ হন। বাবাও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন—এর প্রতিশোধ তিনি নেবেন। সাতটি বছর চাকরি করেই বাবা এই ব্যবসার যা কিছু সুলুক সন্ধান সবই জেনে নেন। শুধু তাই নয়। অদৃষ্টের চাকা এমনভাবে ঘুরে যায় যে, বাবা যেখানে চাকরি করতেন, সেইখানেই মালিক হয়ে বসেন, আর মালিককে বাবার দয়ার ওপর নির্ভর করে দোকান ছেড়ে দিতে হয়। আজও সে লোক বেঁচে আছে, আর বাবার দেওয়া মাসোহারায় তার দিন চলছে।

নিবিষ্টমনে পার্বতিরাম এই কাহিনী শুনিতেছিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া একটি প্রশ্ন আগ্রহের সুরে বাহির হইল, আপনার মা এখনও বেঁচে আছেন?

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া পার্বতী উত্তর দিল, বাবার এই ব্যবসার পূর্ণ জোয়ার চলেছে, এক দিনের অসুখে মা তখন হঠাৎ মারা যান। সাত বৎসর হতে চলল—আমরা তাঁকে হারিয়েছি।

—আপনার ভাই আছেন?

—না, আমিই বাবার একমাত্র সন্তান। তবে বাবা আমাকে ছেলের মতই শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। আমার নাম পার্বতী বলে তাঁর ফার্মের নাম রেখেছেন মনসারাম পর্বতরাম।

—আপনারা তা হলে—

—জাতে কি জানতে চাইছেন? আমরা জেলে—তাঁতি জেলে।

সবেগে পাত্তিরাম সোজা হইয়া বসিল, তাহার চক্ষুর উপর হইতে ব্যবধানের একটা আবরণ কে যেন অদৃশ্য হস্তে সরাইয়া দিল।

॥ ষোলো ॥

দমদম রোডের উপর ছোট একখানি বাগানবাড়ি। জনৈক ধনাঢ্য আহীর বাড়িখানি সুবিধায় ক্রয় করিয়া ভাল রকমের ভাডাটিয়া খুঁজিতে থাকে। কৃত্তিবাস কোলেও এই সময় এই অঞ্চলে ছোটখাটো একখানি বাগানবাড়ি খুঁজিতেছিল। উদ্দেশ্য দীর্ঘকালের লীজ লইয়া সেই বাড়িতে তাহার প্রিয়তমা রক্ষিতা মেনকা বাইয়ের সহিত আত্মীয়স্বজনের অগোচরে প্রেমলীলা চালাইবে। বাড়িখানি দেখিয়াই প্রেমিক যুগলের অত্যন্ত পছন্দ হইল। অবিলম্বে কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল এবং আমূল সংস্কৃত ও সজ্জিত হইয়া বাড়িখানি 'মেনকা-মঞ্জিল' নামে প্রতিষ্ঠা পাইল।

মেনকা নবযুবতী ও রূপবতী। তাহার রূপলাবণ্য- ও স্বাস্থ্য-পুষ্ট সুগঠিত দেহখানির একটা আকর্ষণও আছে। বহু পুরুষ-পতঙ্গ মেনকার রূপবহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উন্মত্ত। বিডন স্ট্রীটের কোন একটা নামজাদা থিয়েটারের সে নৃত্যগীত-পটিয়সী অভিনেত্রী। নৃত্যগীতবহুল চটুল ভূমিকায় তাহার প্রতিষ্ঠাও প্রচুর। কৃত্তিবাস কোলে দমদমের ভাড়া করা এই সুসজ্জিত বাগানবাড়ির সহিত মাসিক শতাধিক টাকার দক্ষিণার ব্যবস্থা করিয়া বহু বুভুক্ষুর গ্রাস হইতে ছিনাইয়া মেনকাকে তাহার আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছে। এজন্য সে মনে মনে গর্ব অনুভব করে এবং প্রায়ই মেনকা-মঞ্জিলে গান-বাজনার আসর বসাইয়া ও সেই আসরে তাহার বন্ধুবর্গকে আনাইয়া—সে যে কত বড় ভাগ্যবান তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়া থাকে। এইভাবে আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি ভিন্নও কোন গুরুতর কাজ গুছাইবার প্রয়োজন হইলে সে মেনকা-মঞ্জিলে বিশেষ জলসার আয়োজন করিত এবং সেই আসরে সুকণ্ঠী ও সুদর্শনা মেনকাবাইকে নাচাইয়া গাওয়াইয়া অভ্যাগত ব্যক্তিবিশেষের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া, কার্যোদ্ধার করিতেও লজ্জা অনুভব করিত না।

ইদানীং পাত্তিরামের শ্রীবৃদ্ধি কৃত্তিবাসের চক্ষুতে যেন শূল ফুটাইতেছিল। নারী

সম্পর্কে সে যে কত বড় ভাগ্যবান—এ পরিচয় তাহার অন্যান্য বন্ধুরা পাইলেও পাতিরাম এ সম্বন্ধে অন্ধকারেই পড়িয়া ছিল। এ পর্যন্ত কত উৎসবই এ মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার সুপরিচিত প্রায় সকল বন্ধুই তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া ও যোগদান করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে, কিন্তু কোনও উৎসবেই পাতিরামকে নিমন্ত্রিত করা হয় নাই। সেই ত্রুটিটুকু সংশোধন করিতেই এদিনের উৎসবে সে সর্বাগ্রে পাতিরামের অফিসে নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠাইয়াছিল।

পাতিরাম যখন আস্তে আস্তে মেনকা-মঞ্জিলের সঙ্গীত-আসরে উপস্থিত হইল, উৎসব তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। অভ্যাগতগণ ক্রমশ বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

পাতিরামকে দেখিয়াই কৃত্তিবাস ছুটিয়া আসিল; হাতখানা ধরিয়া সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া কহিল, এত দেরি করে এলে ভাই, মজলিস তো এখন ভাঙবার যো—

নিকটেই একটা প্রকাণ্ড তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রাধানাথবাবু গড়গড়ার সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তাতে কি, তোমার মেনকা তো রয়েছে, ও যে একাই এক শ—

কৃত্তিবাস হাসিয়া কহিল, যা বলেছ! একশ্চন্দ্র তমোহন্তি, ন চ তারাগণৈরপি—

পাতিরাম সহজ কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল, চাঁদটি এখানে কে? আর তারাই বা কারা?

কৃত্তিবাস ইতিমধ্যে আসরের মধ্যস্থলে উপবিষ্টা উজ্জ্বলবসনা সালঙ্কারা মেনকার কাছে গিয়া কানে কানে কি বলিতেছিল, সে সহসা উঠিয়া একেবারে পাতিরামের ঠিক পার্শ্বে আসিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে কহিল, চাঁদ হচ্ছেন আপনি পাতিরামবাবু, আপনার উদয় হতেই তারার দল ম্রিয়মাণ হয়ে সরে পড়তে চান আর কি। আসুন —আমরাই এবার আসর গুলজার করি। কথাগুলি বলিয়াই মেনকা খপ্ করিয়া পাতিরামের একখানি হাত ধরিয়া টান দিল।

পাতিরাম সজোরে হাতখানা ছাড়াইয়া দিয়া কহিল, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এসেছি যখন, আসর গুলজার তো করবই; টানাটানিটা কি এত লোকের সামনে ভাল?

যে কয়জন তখনও আশেপাশে বসিয়াছিল, তাহাদের চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিক দেখা দিল।

কৃত্তিবাস পাতিরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মেনকার নাম তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, স্টেজে দেখেও থাকবে। যাকে বলে অলরাউণ্ড অ্যাকট্রেস! নাচগান, অ্যাক্টিং সব বিষয়েই ওস্তাদ, সাক্ষাৎ জিনিয়াস, বর্‌ন্ অ্যাকট্রেস! তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না থাকলেও তোমাকে মেনকা বিলক্ষণ জানে।

মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটাইয়া মেনকার দিকে চাহিয়া পাতিরাম কহিল, বলেন কি? আমার মত নগণ্য লোককেও আপনি জানেন?

মেনকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া উত্তর দিল, নইলে প্রথম দর্শনেই আপনার হাতখানা পাকড়ে ধরি?

পরক্ষণেই মুখখানা ঈষৎ ভাব করিয়া কহিল, কিন্তু আপনি তো খপ্ করে হাত ছাড়িয়ে নিলেন—ধরা দিলেন না। আমার অদৃষ্ট!

পাতিরাম কহিল, আপনার কষ্ট লাঘব করবার জন্যই আমি অমন করে হাতখানা টেনে নিয়েছিলুম।

মেনকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তার মানে?

পাতিরাম অসঙ্কোচেই উত্তর দিল, মানে এই, আমি জেলের ছেলে। আমার মা মাথায় মাছের বোঝা নিয়ে তাই বেচে আমাকে মানুষ করেছে। আমিও মাছ বেচে খাই। আপনার গায়ের চড়া এসেন্সের গন্ধ আমার হাতের মাছের গন্ধ ঘোচাতে পারে নি, আঁশটে গন্ধে পাছে আপনি কষ্ট পান, তাই অমন করে হাতখানা টেনে নিয়েছি, বুঝেছেন?

কথাটা যেন তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়া সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিল। এমন করিয়া নিজের সুস্পষ্ট পরিচয় অকপট ভাষায় প্রকাশ্য সভায় সর্বসমক্ষে কেহ যে প্রকাশ করিতে পারে—এ অভিজ্ঞতা সমাগতদের মধ্যে কাহারও ছিল না। 'সাধারণ রঙ্গালয়ের এই অভিনেত্রীটি পর্যন্ত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া পাতিরামের দিকে চাহিয়া রহিল।

সহসা কৃত্তিবাস উঠিয়া কহিল, তুমি যখন দেরি করে এসেছ পাতিরাম, তোমাকে একটু বেশীক্ষণ থাকতে হবে। আমাদের আর একটা নিমন্ত্রণ আছে কাছেই, সেটা সেরে এখুনি ফিরছি। তুমি ততক্ষণ মেনকার দু-একখানা গান শোন, আলাপ কর। ওঠো হে রাধু—

রাধানাথবাবুও প্রস্তুত ছিল। পাতিরামকে কথা বলিবার আর অবসর না দিয়াই মেনকা ও পাতিরামকে আসরে রাখিয়া আর সকলেই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতৃ-সুলভ ভঙ্গিতে চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাতিরামের মুখে কোন কথা নাই; তাহার আচরণে চাঞ্চল্যের কোন লক্ষণও নাই। কত পুরুষের সংস্রবে মেনকাকে আসিতে হইয়াছে। তাহাদের স্তবস্তুতি প্রণয়নিবেদন শুনিয়া তাহার কান দুটি কতবারই ঝালাপালা হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য! এই লোকটির মুখে কোন প্রার্থনা নাই, চক্ষুর দৃষ্টিতে কোনরূপ লালসার আভাসও নাই,—বার বার তাহার পানে অপলক চাহিয়াও মেনকা এই রহস্যময় মানুষটির চিত্তে কিছু মাত্র শিহরণ তুলিতে পারে নাই। সে অতি বিস্ময়ে ভাবিতে লাগিল, মানুষের চর্মাবৃত কোন প্রাণহীন মূর্তি কি তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছে?

মেনকাই সর্বপ্রথম পরাজয় স্বীকার করিল। তাহার মুখ দিয়াই প্রথম কথা বাহির হইল, আপনি যে চুপ করেই রইলেন, হাত ধরতেও আমার ভরসা হচ্ছে না, কি জানি যদি রাগ করেন – হাতখানা জোর করে আবার ছাড়িয়ে নেন!

পাতিরাম কহিল, বললুম তো, আমার গায়ে গন্ধ, আপনিই কষ্ট পাবেন।

—আপনি নিজেকে অত ছোট কেন ভাবছেন বলুন তো? কে বলে আপনার কাজ ছোট?

—আমি বরাবরই নিজেকে ছোট মনে করি।

—ওটা আপনার মনের কথা নিশ্চয়ই নয়। বাইরে দশ জনের সামনে আপনি নিজেকে ছোট বলে প্রচার করতে চান, কিন্তু মনে মনে আপনি নিজেকে সবার বড় বলেই ভাবেন। মানুষ আমরা চিনি। আপনি বড়—এত বড় যে, আপনার মত মানুষ আমি আর দেখি নি বললেই হয়।

—সেইজন্যেই বুঝি আমার হাতখানা ধরে জাহান্নমের পথে নামিয়ে নিয়ে যেতে অত ব্যস্ত হয়েছেন?

—জাহান্নমের পথে!

—তা নয়তো কি বলতে চাও? যদি আপনি মনে মনে ভেবেই থাকেন, মনে মনে আমি নিজেকে সবার বড় বলেই ভাবি, তাহলে আমি যে ছোট হতে পারি না, কিংবা শত চেষ্টা করলেও আপনি আমাকে ছোট করতে পারবেন না একথা ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—দেখুন কোন মেয়ে কোন পুরুষের সঙ্গে যেচে কথা কইলে সেই পুরুষ মেয়েটির সম্বন্ধে অমনি একটা কদর্য ধারণা করে বসে। ভাবে, মেয়েটা তাকে ফ্লার্ট করছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আমি এমন কয়েকটা গুণের কথা জানতে পেরেছি, যাতে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে। এই শ্রদ্ধাটুকু জানাবার চেষ্টাটাকেই আপনি কি জাহান্নমের পথে আপনাকে নামিয়ে দেওয়া বলতে চান?

—আপনি এখনও রেখে-ঢেকে কথা বলছেন। আসল উদ্দেশ্যটি আপনার বলছেন না বা বলতে সাহস করছেন না।

—আপনি ঠিক ধরেছেন। দেখছি, আপনি মনের কথাও পড়তে পারেন। বেশ, তা হলে আসল কথাটাই বলি শুনুন। আপনার মনের জোর দেখে আমি বুঝেছি—মানুষ চরিয়ে কাজ চালাতে আপনার জোড়া নেই। দেখুন, অনেক দিন থেকেই আমার সাধ যে আপনার মত কোন শক্ত মানুষ একটা থিয়েটার খোলেন, আর আমরা তাঁকে আশ্রয় করে ফাঁপিয়ে তুলি। বেশী নয়, লাখখানেক টাকা হলেই একটা থিয়েটার খোলা যায়—

—কথাটা আপনার নয়, কৃত্তিবাসের, তা আমি বুঝেছি। যখনই তার নেমন্তন্নের কার্ড পেয়েছি, তখনই আমি ধরে নিয়েছিলুম যে, আমাকে ঘাল করবার জন্য সে একটা ফাঁদ পাতবার মতলব করেছে। কিন্তু নেড়া দু বার বেলতলায় যায় না।

মেনকা এবার স্তব্ধ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। এই অদ্ভুত লোকটির মুখের পানে তাকাইতেও যেন সে সংকোচ বোধ করিতেছিল।

পাতিরাম বক্রদৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিয়া কণ্ঠে একটু জোর দিয়া কহিল, আমার মনে এতটা জোর কে দিয়েছে শুনবেন? আমার মা! আঠারো বছর বয়সে মাছের ব্যাপারে আমাকে আপনাদেরই মত কতকগুলো মেয়ের সংস্রবে যেতে হয়। পাড়ার লোক তখন আমার মাকে বলেছিল, তোমার ছেলে পতা পা পিছলে পড়ল বলে! কথাটা শুনে মা আমার জোর গলায় জবাব দেন, কখ্খনও নয়, তা হতে পারে না। আমি তার মা, মাথায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে দোর দোর ঘুরে যে পয়সা পয়দা করি, পতা তা ওড়াতে পারবে না, পতা আমার মানুষ হবে। বড় হবে। মায়ের দুঃখ ঘোচাবে। কথাগুলো যেই আমার কানে উঠল, আমি অমনি সেগুলো আমার বুকের ভেতর দেগে নিলুম, সারা জীবনে তা মুছবে না। আপনি তো থিয়েটারের একটা অর্ডিনারী অ্যাক্‌ট্রেস, স্বর্গের কোন অপ্সরী নেমে এলেও সে দাগ মোছাতে পারবে না—এ মন টলবে না, বুঝেছেন?

সর্পদষ্টের মত শিহরিয়া উঠিয়া মেনকা পাতিরামের মুখের দিকে যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—তাহা অপূর্ব। কোন প্রকার আকর্ষণ বা আবিলতার চিহ্নও তাহাতে নাই।

পাতিরাম কহিল, কাল একটি মেয়ের সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে যায়। বয়সে সে আপনার চাইতেও ছোট হবে, বাইরের রূপের দিক দিয়েও সে আপনার অনেক নীচে। কিন্তু তার দৃষ্টি এত বড়, বাংলার দৈন্যে তার এত দরদ, যার পরিচয়

পেয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। লোকে আমাকে ঝানু ব্যবসায়ী বলে, কিন্তু ষোল বছরের সেই মেয়েটির কাছ থেকে আমারও শিক্ষা করবার যথেষ্ট আছে। আর, আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি জানতে পারছি, যে-জুয়াচোর বার বার আমাকে ঠকিয়েছে—সে আমাকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে আপনার মত একটা মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে আমাকে জাহান্নমের পথে ঠেলে দেবার ফাঁদ পেতেছে। এতে তার ওপর আমার যত না রাগ হচ্ছে, আপনার অবস্থা ভেবে তার চেয়েও বেশী কষ্ট হচ্ছে। আর, এ সম্বন্ধে আমার একটা ভবিষ্যদ্বাণী আপনি লিখে রাখতে পারেন, এই লোকের সংস্রব আপনি যদি ছাড়তে না পারেন আপনারও দুর্গতির একশেষ হবে।

মেনকা এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া পান্তিরামের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কাপড়ের অঞ্চলটি গলায় দিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, তা হলে আপনিই আমাকে মুক্তির রাস্তা দেখিয়ে দিন বাবা! এই পাষণ্ডের পাল্লায় পড়ে সত্যিই আমি মরণের পথে ছুটেছি, আপনি আমাকে বাঁচান।

পান্তিরাম কহিল, বেশ, তাহলে আজ থেকে আপনি আমার মা হলেন আমি আপনার ছেলে। মায়ে-ছেলে মিলে দুজনেই মুক্তির পথ খুঁজে নেব, ভয় কি!

॥ সতেরো ॥

শ্রীবাস পান্তিরামের অফিসে কেরানীর কাজে নিযুক্ত হইয়াছে। ইংরাজী চিঠিপত্রগুলি তাহাকে মুসাবিদা করিতে হয়। চিঠির বয়ান অবশ্য পান্তিরাম বাতলাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া শ্রীবাসকে আর একটি কাজ করিতে হয়। ঠিক তিনটা বাজিলেই পান্তিরামের খাস কামরায় তাহার ডাক পড়ে। কাগজপত্র টেবিলের ভিতর রাখিয়া তখনই তাহাকে কর্তার ঘরে ছুটিতে হয়। কর্তা তখন তাহাকে কাছে বসাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যে সব পরামর্শ বা নির্দেশ দেয়, অফিসের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। আলোচনাসূত্রে শ্রীবাস বুঝিল যে, তাহার প্রভু সর্বজ্ঞের মত তাহার আত্মীয়বর্গের সম্বন্ধেও এত খবর রাখেন, যাহাদের বিষয়ে সে স্বয়ং অজ্ঞ বলিলেই হয়।

প্রথম প্রথম শ্রীবাস ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। পরচর্চায় তাহার প্রভুর এত অনুরাগ কেন এবং তাহাতে তাহার কি লাভ? কিন্তু একদা তাহার

প্রভুই কথাটা প্রকাশ করিয়া তাহার সকল সংশয়ের অবসান করিয়া দিল।

শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিয়া পাতিরাম একদা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা শ্রীবাস, বলতে পার তুমি, জিনিয়াস আর ইনটেলিজেন্টে কি তফাৎ ?

শ্রীবাস উত্তর দিল, আজ্ঞে কলেজে এক বার এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। আমাদের এক প্রফেসর বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, জিনিয়াস ভারে কাটে। সে যখন যায়—তার রাস্তা সবাই তৈরী করে দেয়, কোথাও তাকে হোঁচট খেতে হয় না, কেউ তাকে বাধা দেয় না, সবাই তাকে মানে। কিন্তু ইনটেলিজেন্টকে ধারে কাটতে হয়। সদা সর্বদাই তার চিন্তাশক্তিতে শান দিতে হয়, রাস্তা তাকে তৈরী করে নিতে হয়, অবস্থা বুঝে তাকে চলতে হয়। তাকে সবাই বাধা দেয়, কিন্তু সেই বাধা বুদ্ধি খেলিয়ে তাকে কাটাতে হয়।

পাতিরাম কহিল, ঠিক। দেখ, পৃথিবীতে জিনিয়াস খুব কম দেখা যায়; এত কম যে অঙ্গুলের পর্বগুলোও পুরে না। কিন্তু ইনটেলিজেন্ট এর তুলনায় অনেক বেশী। এই ইনটেলিজেন্টের দলই বাহাদুর, এরাই পৃথিবীর বুকে বসে রাজত্ব করছে। কাজেই, আমরা যখন জিনিয়াস নই, জিনিয়াস হবার মত কোন যোগ্যতাও আমাদের নেই, তখন আমরা চেষ্টা করলে অন্ততঃ ইনটেলিজেন্টও হতে পারি। তাই বলছিলুম, তোমার চিন্তাটাকে আরও সাফ করতে হবে, আর বুদ্ধিশক্তিটাকে শানে চড়িয়ে ধারালো করে নিতে হবে।

শ্রীবাস সবিনয়ে কহিল, আপনি শুধু আমার অন্নদাতা প্রভু নন, আপনি আমার গুরু। আপনি যা বলবেন, তাই আমার শিরোধার্য।

পাতিরাম গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল, গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকের অভিনয় তুমি দেখেছ শ্রীবাস ?

শ্রীবাস কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি।

—মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়ার পার্ট তোমার মনে পড়ে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চমৎকার। আমি যেবার প্রফুল্ল দেখি, অমর দত্ত ঐ পার্টে নেমেছিলেন। এখনও যেন সে চেহারা চোখের ওপর ভাসছে।

—ব্যস্! আমার কথা তা হলে হয়ে গেছে।

শ্রীবাস সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে পাতিরামের মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন উত্তর তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না।

পাতিরাম একটু হাসিয়া কহিল, ইনটেলিজেন্ট হতে হলে সব বিষয়েই কিছু কিছু জ্ঞান থাকা চাই। বিশেষ করে অভিনয়ের ব্যাপারটা।

শুষ্ককণ্ঠে শ্রীবাস কহিল, কিন্তু আমি তো কোনদিন স্টেজে নেমে অভিনয় করি নি স্যার! এ বিষয়ে আমি একেবারে আনাড়ী।

পাত্তিরাম কহিল, অভিনয়ের ছাপ যখন তোমার মনের ওপর পড়েছে, অভিনয় করতে তোমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। তার তালিম আমি তোমাকে দেব। তবে তুমি বুদ্ধিমান, বুঝতেই তো পারছ, অভিনয়টা আসলে কিছু নয়—ঝুটো। কিন্তু এতে লোক মুগ্ধ হয়ে যায়। তোমাকেও এমনি একটা ঝুটো ব্যাপারকে আসল বলে চালাতে হবে। পারবে তো?

শ্রীবাস কহিল, বলুন, কি করতে হবে?

পাত্তিরাম গম্ভীর ভাবেই কহিল, তোমার মামা সৃষ্টিধর দাসের সঙ্গে মুলাকাৎ করতে হবে।

দুই হাত জোড় করিয়া শ্রীবাস কহিল, ঐ আজ্ঞাটি আমাকে করবেন না স্যার! আমি আর সব পারব, কিন্তু তার বাড়ির দেউড়িতে মাথা গলাতে পারব না। সেখানে গেলেই আমার বাবার চরম লাঞ্ছনা, দারুণ অভাবের মধ্যে তাঁর মৃত্যুশীর্ণ মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠবে।

পাত্তিরাম দৃঢ়স্বরে কহিল, তোমার বাবার ওপর তাঁর ঐসব অবহেলার প্রতিশোধ নিতেই তোমাকে যেতে হবে।

শ্রীবাস নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে পাত্তিরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু ক্রমশঃ বাষ্পাচ্ছন্ন হইতেছিল।

পাত্তিরাম কহিল, শোন শ্রীবাস, তোমার ভালর জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টিধরের কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু এও স্থির যে, তুমি আমার অফিসের এক জন কেরানী হয়ে সেখানে যাবে না! তুমি আইরিশ লটারীতে সাত লাখ টাকা পেয়ে আমার ফার্মের অংশীদার হয়েছ, বড় বড় মার্গে ক্যাপিট্যাল যোগাচ্ছ, জমিদারি কেনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ, এই হবে তোমার বর্তমানের পরিচয়। তোমার থাকবার বাড়ি, জুড়ি গাড়ি, চাপরাসী-দারোয়ান, ঝি-চাকর এ সবের বন্দোবস্তও আমি করে রেখেছি। কাল থেকে এ ব্যাপারের রিহার্সাল সুরু হবে। তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুটি ঘণ্টা তোমাকে এর তালিম আমি দেব। এমন কি, আমার অফিসের লোকজনরাও দু-চারদিনের ভেতরই জানাব যে কথাটা সত্যি, তুমি আমার অফিসের পার্টনার, তুমি মিলিওনিয়ার।

পাত্তিরামের যে কথা সেই কাজ। এই পরামর্শের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই অফিস শুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ হইয়া শুনিল যে, শ্রীবাস রাতারাতি বড়লোক হইয়া

গিয়াছে। সে প্রকাণ্ড বাড়ি কিনিয়াছে। বাড়িতে লোকজন গিস্‌গিস্‌ করিতেছে। পাতিরামের বিশাল কারবারের সে এখন অংশীদার। প্রকাণ্ড জুড়ি চড়িয়া আসে, কর্তার ঘরে বসে ও জুড়ি চড়িয়া বাড়ি যায়।

একদা শ্রীবাসের জুড়ি সৃষ্টিধরের বাড়ির দেউড়িতে লাগিল। সৃষ্টিধর তখন বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল। দেউড়ির সম্মুখে জুড়ি থামিতেই সে ফরাসের উপর সোজা হইয়া বসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া তাকাইয়া দেখিল, পাটকিলে রংয়ের একটি অতিকায় ওয়েলার বাহিত অতিশয় সুশ্রী গাড়ি। কোচোয়ান ও সহিসের সাজসজ্জা এবং তকমা জুড়ির মতই জমকালো। সৃষ্টিধর গড়গড়ার নল টানিতে টানিতে ভাবিতেছিল, তাই তো কে এল!

কিন্তু অনতিবিলম্বে যে লোক আসিল, তাহার আসিবার ভঙ্গী ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য একনিমেষে তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি সে এই অভিজাত অভ্যাগতের সংবর্ধনার জন্য উঠিতেছিল, কিন্তু শ্রীবাস ততোধিক তৎপরতার সহিত সৃষ্টিধরের পদতলে শির নত করিয়া কহিল, মামা আমি শ্রীবাস, পায়ের ধুলো দিন।

শ্রীবাস! নাম অবশ্যই পরিচিত। ভগ্নিপতি চিনিবাস পরিত্যক্ত হইলেও তাহার প্রিয়দর্শন পুত্র শ্রীবাস শৈশবাবস্থায় তাহার কোলে পিঠে উঠিয়া সে কালের স্মৃতি আজও টানিয়া রাখিয়াছে। শ্রীবাস যখন দশ বৎসর বয়সের বালক সেই সময় সৃষ্টিধরের ভগ্নিবিয়োগ হয়। শ্রীবাসের পিতা জাতিগত ব্যবসায় পরিত্যাগ না করায় সৃষ্টিধর কোনদিনই তাহার উপর প্রসন্ন ছিল না, তথাপি ভগ্নি বিদ্যমানে উভয় পরিবারের মধ্যে যে সম্বন্ধটুকু ছিল, বিয়োগের পর তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আজ সেই শ্রীবাস তাহার সম্মুখে উপস্থিত।

সৃষ্টিধরের স্নেহসিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিল। দুই হাতে শ্রীবাসকে টানিয়া কোলের কাছে বসাইল, ভাবগদগদ স্বরে বলিল, ওরে তুই! কিন্তু মামাকে একেবারে ভুলেছিলি তো?

শ্রীবাস কহিল, ভুলে গেলে কি আসতে পারতুম মামা? মন তোমার কাছেই পড়ে থাকত। তবে বড়লোক মামার কাছে আসবার মত সৌভাগ্য পাই নি এতদিন, তাই আসতে পারি নি।

সৃষ্টিধর কহিল, সৌভাগ্য এবার এসেছে, না? তোকে দেখেই তা বুঝেছি। মধ্যে কে যেন খবর দিয়েছিল, লটারীর টাকা পেয়ে শ্রীবাস বড়লোক হয়েছে। আমি তখন বিশ্বাস করি নি। এখন দেখছি, খবরটা সত্যি। কত টাকা পেয়েছিলি শুনি?

শ্রীবাস কহিল, পুরো সাত লাখ পাবার কথা, তার ভেতর থেকে হাজার ত্রিশ দিতে-থুতে গেছে।

স্বষ্টিধর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শ্রীবাসের দিকে চাহিয়া কহিল, টাকাটার গতি কি করলি?

শ্রীবাস কহিল, বাড়ি কতকগুলো কিনেছি, কয়েকটা প্রোফিটেবল কারবারের অংশীদার হয়েছি। এ ছাড়া দু-একটা তালুক কেনবার বাসনা আছে। সেই পরামর্শ নিতেই আপনার কাছে আসা।

স্বষ্টিধর কহিল, খাসা আইডিয়া! দেখে শুনে ভাল তালুক কেনাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তোকে সব স্লুক সন্ধান দেব, তবে তুই তাড়াতাড়ি কিছু করতে যাস্ নি। রয়ে বসে এসব কাজ করতে হয়।

স্বষ্টিধরের নির্দেশে অন্তঃপুরে শ্রীবাসের ডাক পড়িল। বৃদ্ধ তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেল। শ্রীবাস আজ লক্ষপতি বড়লোক, আজ তার আদর-আপ্যায়নের অন্ত নাই।

॥ আঠারো ॥

এদিকে মেনকা-মঞ্জিলেও পাতিরামের নির্দেশে রীতিমত অভিনয় চলিতেছিল। মেনকা পাকা অভিনেত্রী হইলেও তাহাকে পাতিরাম কালোপযোগী তালিম দিতেছিল। কৃত্তিবাস মেনকার মুখে শুনিল যে পাতিরামকে সে ফাঁদে ফেলিয়াছে। মেনকার রূপ দেখিয়া আর বাছা বাছা খানকতক গান শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। থিয়েটারের কথা পাড়িতেই সে সানন্দে সায় দিয়াছে। এ সংবাদে কৃত্তিবাসের আনন্দ আর ধরে না। মেনকা-মঞ্জিলে পাতিরামের আনাগোনায় যাহাতে কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, সেজন্য সে নানাবিধ উপায় অনুষ্ঠান করিতে লাগিল।

পাতিরাম এখন প্রায়ই মেনকা-মঞ্জিলে আসে ও ঘণ্টা ব্যাপিয়া মেনকার সহিত তাহার পরামর্শ চলে। পাতিরাম চলিয়া গেলেই কৃত্তিবাস আসিয়া থিয়েটারের ব্যাপার কত দূর অগ্রসর হইল তাহার হিসাব লয়। মেনকা সুকৌশলে পরিকল্পিত নাট্যশালার ফিরিস্তি তাহাকে শুনাইয়া দিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এক দিন কথায় কথায় মেনকা কৃত্তিবাসকে জিজ্ঞাসা করিল, হাটখোলার হাতী-

বাবুদের বাড়িতে তোমার নাকি বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ?

প্রশ্নটা শুনিয়াই কৃত্তিবাস যেন আকাশ হইতে পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, খবরটা কোথা থেকে পেলে ?

মেনকা কহিল, নায়েববাগানে আমার এক সই থাকে, তার কাছেই খবরটা পেয়েছি। কথাটা কি বাজে ?

কৃত্তিবাস কহিল, যা রটে তা বটে, বাজে কি করে বলি ? তবে তোমার তাতে দুঃখ কি বল ?

মেনকা কহিল, বালাই, দুঃখ হবে কেন, এ তো আনন্দের কথাই গো। অত বড় লোকের বাড়িতে তোমার যদি বিয়ে হয়, তোমার বরাত যেমন ফিরে যাবে, আমার বাক্সেও কোন্ দু-পাঁচ হাজার না উঠবে।

কৃত্তিবাস উল্লাসে মেনকার কোমল গণ্ডে একটা টোকা দিয়া কহিল, ব্রাভো, এই জন্যেই তো তোমাকে এত পেয়ার করি। খবরটা পেয়েই তুমি প্যানপ্যানানির বদলে পাওনার কথা বললে, এতে আমি ভারি খুশী হয়েছি।

মেনকা কহিল, তুমি যেমন খুশী হয়েছ, আমাকেও তেমনি তোমার খুশী করা উচিত।

স্থির দৃষ্টিতে মেনকার দিকে চাহিয়া কৃত্তিবাস জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে খুশী করবার জন্যে আমি দৃকপাত করি নি—এ কথা বলবার মানে ?

মেনকা মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, মানে এই যে, এতদিন একতরফাই তোমাকে পেয়েছি, এবার ভাগীদার আসছে। কাজেই আখের ভেবে আমাকেও নিজের কোলে ঝোল টানতে হচ্ছে। তবে ভয় নেই, আমাকে খুশী করতে তোমাকে কোন জমিদারি বা তালুক লিখে দিতে হবে না।

কৃত্তিবাস কহিল, কি দিতে হবে, তুমি কি চাও, সেইটিই কেন খুলে বল না ?

মেনকা কহিল, আমি একনিষ্ঠ হয়ে তোমার কাছে আছি বলে তুমি যে এই বাগানবাড়ি আমাকে ভাড়া করে দিয়েছ, আর খোরপোষের জন্য মাসে আশীটি করে টাকা দিচ্ছ এটা আমি কত কাল পাব ?

কৃত্তিবাস কহিল, কেন, বরাবর পাবে, যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে।

কণ্ঠের স্বর একটু মৃদু ও কোমল করিয়া মেনকা জিজ্ঞাসা করিল, ধর, কালে যদি আমার রূপে ভাঁটা পড়ে আর বয়স বাড়ে তবুও পাব ?

কৃত্তিবাস কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া উত্তর দিল, নিশ্চয়।

মেনকা এবার সহজ কণ্ঠেই কহিল, বেশ, তা হলে এই কথাটা তুমি আমাকে

একখানা কাগজে এখনই লিখে দাও।

কৃত্তিবাসের মুখখানা এক মুহূর্তে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, হঠাৎ আমার ওপর তোমার এই সন্দেহের কারণ? লেখাপড়ার কথা তো কোন দিন হয় নি।

মেনকা কহিল, তুমি যে বিয়ে করবে একথা তো তখন ভাবি নি, তাই তখন লেখাপড়ারও প্রয়োজন হয় নি।

কৃত্তিবাস রুক্ষস্বরে কহিল, লেখাপড়া হয় নি বলে আমি কি এ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কোনরকম অসদ্ব্যবহার করেছি? যা বলেছি তার নড়চড় হয়েছে কোনদিন?

মেনকা কহিল, এর পর তো হতে পারে। যাতে না হয়, সেইজন্যেই আমাকে সাবধান হতে হচ্ছে। নিজের কথার ওপর তোমার যদি বিশ্বাস থাকে, লেখাপড়া করতে কি দোষ?

কৃত্তিবাস এবার বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, লেখাপড়া আমি কিছুতেই করব না।

মেনকা কহিল, লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে। না করে কিছুতেই রেহাই পাবে না।

কৃত্তিবাস এবার তর্জনের স্বরে কহিল, কি! আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা? বুঝেছি, পাতিরামের পাল্লায় পড়ে মাথা তোর বিগড়ে গেছে। লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছিস্! তাকে নিয়ে থিয়েটারে মাতবি আর আমাকে রম্ভা! কিন্তু তা হব না। আমিও কৃত্তিবাস কোলে, দরকার বুঝলে তোকে খুন করতেও পেছপাও হব না।

মেনকাও উচ্চকণ্ঠে কহিল, মুখ সামলে কথা বল, যা তা বলে আমাকে অপমান কর না বলছি; ভাল হবে না।

মেনকার কথাগুলি এবার কৃত্তিবাস বরদাস্ত করিতে পারিল না, হুকার দিয়া মেনকার উপর লাফাইয়া পড়িল, দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, হারামজাদী—কসবী! আমি তোকে খুন না করে ছাড়ব না।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ পিছন হইতে দুইটি সবল হাতের বেষ্টনী সাঁড়াশির মত কৃত্তিবাসের গলাখানি এমন জোরে চাপিয়া ধরিল যে, তাহার হাতের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল এবং মেনকা নিষ্কৃতি পাইয়া বারান্দার দিকে ছুটিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, পুলিস, পুলিস।

যে লোক পিছন হইতে কৃত্তিবাসের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি হাত দুখানি ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, কোন দরকার নেই মা পুলিস ডাকবার,

পুলিস তো আমরাই। আপনিই দাঁড়িয়ে হুকুম দিন, যা কতক রদ্দা দিয়ে বাছা-ধনকে বিদেয় দিই। আপনি ভেতরে আসুন, ভয় নেই।

গুণ্ডাকৃতি জোয়ানটির শক্তির পরিচয় পাইয়া কৃত্তিবাসের ক্রোধ জল হইয়া গিয়াছিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটির পানে চাহিয়া কহিল, তুই কে? কার হুকুমে এখানে এসেছিস?

উত্তর আসিল, উনি আমার মা, আমি ওনার চাকর। এর বেশী জবাব পাবে না, জিজ্ঞাসাও করো না। তবে বলে রাখছি, ফের বেলেল্লাগিরি করেছ কি মরেছ। এমন টিপুনি গলায় দেব যে নলিটা পুট করে ভেঙ্গে যাবে।

কৃত্তিবাস আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

এমনই একটা দুর্ঘটনার অনুমান করিয়া পাতিরাম মেনকাকে কৃত্তিবাসের নির্বাচিত দারোয়ানকে বিদায় দিবার পরামর্শ দিয়াছিল। তদনুসারে মেনকার কৌশলে পুরাতন দারোয়ান পদচ্যুত হয় ও তাহার স্থলে এই লোকটি চাকুরি পায়। দমদমা অঞ্চলে পাতিরামের পুষ্করিণীর সংখ্যা অল্প নহে। বাগ্‌দী জাতীয় অনেকগুলি বলিষ্ঠ যুবা পুকুরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। পাতিরাম তাহাদের ভিতর হইতেই বাছিয়া বাছিয়া এই বলবান লোকটিকে মেনকার রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়াছিল।

॥ উনিশ ॥

মেনকার সহিত কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠতার কথা তাহার মাতুল স্বষ্টিধরের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই ছিল। ইদানীং স্বষ্টিধর কৃত্তিবাসের হাতেই তাহার জমিদারি ও টাকা-কড়ির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস মামাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, জমিদারি বা কারবার থাকলেই দেনা হয়; কিন্তু তার জন্য ভাবনা কি? সম্বৎসরের ভেতরেই দেনা আমি শোধ করে ফেলব।

স্বষ্টিধর কিন্তু কৃত্তিবাসকে ভাল করিয়াই চিনিত। সেইজন্য সে দেনা পরিশোধের জন্য কৃত্তিবাসের কথার উপর নির্ভর না করিয়া, কৃত্তিবাসকে অবলম্বন করিয়া একটা মোটা রকমের দাঁও মারিবার ফিকিরে ঘুরিতেছিল। ঘটনাচক্রে তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা সূচিত হইল।

হিজলীর হাতীবাবুরা ইহাদের পালটি ঘর। হাটখোলা অঞ্চলে ইহাদের

প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড বাড়ি, ফলাও কারবার, বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ও পরগণায় ইহাদের বহু জমিদারি। সৃষ্টিধর সংবাদ পাইয়াছিল যে, এই বংশের এক কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে ও তাহার বিবাহের সম্বন্ধ চলিতেছে। বিবাহের যৌতুকে তাহারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবে এবং জামাতাকে নাকি একখানা তালুক লিখিয়া দিবে। সংবাদ পাইয়াই সৃষ্টিধর ভাগিনেয় কৃত্তিবাসের জন্য এ সম্বন্ধে যত কিছু তদ্বির সম্ভব, কিছুরই ত্রুটি করে নাই। তাহার ফলে হাতীবাবুদের কন্যার সহিত কৃত্তিবাসের বিবাহের কথা পাকা হইয়া গেল।

কথাটা পাতিরামের কানেও গেল। সে স্তব্ধ হইয়া একদা শুনিল যে, এ বিবাহে কৃত্তিবাস হাতীবাবুদের নিকিরিপাড়ার এস্টেটটি যৌতুক স্বরূপ স্বতন্ত্র ভাবেই পাইবে।

তীরের মত এ সংবাদ যেন পাতিরামের বুকে বিঁধিল। নিকিরিপাড়ার সম্পত্তি—তাহার বহুবাঞ্ছিত নিকিরিপাড়া—যাহার জন্য সে অতি কষ্টে উপার্জিত লক্ষাধিক টাকা কৃত্তিবাস-সৃষ্টিধরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে এবং তাহারা সেই টাকা অম্লানবদনে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে বেকুব সাব্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে, সেই নিকিরিপাড়ার মালিক হইয়া বসিবে পরম অধর্মচারী পরস্বাপহারী প্রতারক কৃত্তিবাস কোলে? না—এ অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না। যেমন করিয়া হউক—এ কার্যে বাধা দিতে হইবে। নিকিরিপাড়া তাহার চাই-ই। ইহার জন্য সর্বস্ব পণ করিতেও তাহার দ্বিধা নাই।

কথাবার্তা সব পাকা হইয়া গিয়াছে, বিবাহের দিনও নির্ধারিত হইয়াছে; চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; উভয়পক্ষই যখন উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময় পাত্র সম্বন্ধে এক অপ্রীতিকর ও অতিশয় কেলেঙ্কারির কথা সংবাদপত্র-সমূহে প্রচারিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিল।

প্রচারিত সংবাদটির মর্ম এইরূপ—

মেনকা বাই নামে এক অভিনেত্রীর সহিত বাবু সৃষ্টিধর দাসের ভাগিনেয় কৃত্তিবাস কোলের বহু দিন ধরিয়াই ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছিল। মেনকা তরুণী, রূপবতী ও নৃত্যগীতপটিয়সী বিধায় তাহার প্রতি কলিকাতা শহরের বহু ধনী যুবার লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু কৃত্তিবাস মেনকার সহিত রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে দমদমার স্বতন্ত্র একখানি বাড়িতে লইয়া গিয়া রাখে ও স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় সদ্ভাবে বাস করিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে শর্ত থাকে যে, মেনকা অপর কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিবে না এবং কৃত্তিবাস মেনকাকে

যাবজ্জীবন প্রতিপালন ও ভরণ-পোষণ করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার কোন বিশিষ্ট ধনীগৃহে কৃত্তিবাসের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হওয়ায়, কৃত্তিবাস মেনকার প্রতি নিরতিশয় দুর্ব্যবহার করিতে থাকে। পাছে মেনকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মেনকাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়। একদা সুযোগ বুঝিয়া দমদমার ওদিকে জনহীন এক উদ্যান-ভবনে সে হত্যার অভিপ্রায়ে মেনকার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরে। কিন্তু কোনক্রমে মেনকা বাই আর্তনাদ করিবার সুযোগ পায় এবং তাহার আর্তনাদ শুনিয়া সন্নিহিত পুষ্করিণীর কতিপয় রক্ষক অকুস্থলে ছুটিয়া আসে ও তাহাকে রক্ষা করে। কৃত্তিবাস অতঃপর পলাইয়া যায়। মেনকা এখন আলিপুর পুলিস কোর্টে আসামীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে সমন জারি করিয়াছেন।

পুলিস কোর্টে কৃত্তিবাস কোলের বিরুদ্ধে মেনকা যে অভিযোগ দায়ের করে, তাহারই মোটামুটি মর্ম সংবাদপত্রে এইভাবে প্রকাশিত হয় এবং এমন কৌশলে সৃষ্টিধর দাস ও হাতীবাবুদের সেরেস্তায় বিতরণ করিয়া দেওয়া হয় যে, সংবাদপত্র পড়িবার কোনরূপ সুযোগ যাহাদের পক্ষে কোন দিন সম্ভবপর ছিল না, তাহারাও এই কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাটির রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় নাই।

ইতিমধ্যে শ্রীবাসের সহিত সৃষ্টিধরের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সৃষ্টিধর শ্রীবাসের ঐশ্বর্য ও গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন কৃত্তিবাসের সহিত হাতীবাবুদের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। তথাপি সৃষ্টিধরের মনের কোণে স্বভাবতই এমন চিন্তারও সঞ্চার হইয়াছিল যে, পাত্র হিসাবে শ্রীবাস কৃত্তিবাসের অনেক উপরে।

রূপ, গুণ, বিদ্যা, সব দিক দিয়াই সে শ্রেষ্ঠ। কৃত্তিবাস ইহার তুলনায় কত নিকৃষ্ট। কন্যাপক্ষ শ্রীবাসের পরিচয় পাইলে সাধিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিত, সৃষ্টিধরকে তজ্জন্য তদ্বির করিতে হইত না। কিন্তু আর উপায় নাই। কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য শ্রীবাস! যদি সে আরও কিছু পূর্বে আসিত।

খবরের কাগজের বিবরণটি পড়িয়া সৃষ্টিধর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাকে লইয়া ঘরখানা বুঝি বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। একটু সামলাইয়াই চাকরকে কহিল, কৃত্তিবাসকে ডেকে আন্ শিগগির।

একটু পরেই কৃত্তিবাস মাতুলের নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিয়া ফরাসের এক ধারে বসিল। আড় নয়নে তাহার পানে চাহিয়া সৃষ্টিধর খবরের কাগজখানা তাহার

দিকে বাড়াইয়া ধরিল।

কৃত্তিবাস বুঝিল, আদালতে যে হাঁড়ি ভাঙিয়াছে, তাহার ভিতরের কদর্য পদার্থটুকু সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে মনে মনে নিজেকে শক্ত করিয়া কহিল, ও আমি দেখেছি, সব বাজে; কতকগুলো পাজী লোকের পেজোমি।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া কৃত্তিবাসের মুখের উপর ফেলিয়া সৃষ্টিধর কহিল, কোন্‌টা বাজে, তোমার কথা না কাগজের এই ছাপাটা?

—আপনি যেটা পড়েছেন, আর আমাকে পড়তে দিচ্ছেন—ঐ খবরটা।

—আদালতে নালিশ করেছে, কাগজে বেরিয়েছে, পরশু মামলার দিন পড়েছে —এগুলো সবই বাজে? এ রকম বাজে খবর কাগজওয়ালারা ছাপতে পারে?

—তারা ছাপবে না কেন? কেউ যদি আজই আপনার নামে যা তা একটা মিথ্যে কিছু বানিয়ে আদালতে নালিশ করে দেয়, সে নালিশের ব্যাপারটা কাগজ-ওয়ালারা তো ছাপবেই।

—আমার নামেই বা কেউ যা তা বলে নালিশ জুড়ে দেবে কেন? এই এত বয়স হল, কত লেনদেন কাণ্ডকারখানাই তো করা গেল, কিন্তু কই যা তা বলে মিছিমিছি নালিশ তো কেউ কোনদিন করে নি। তোমার নামেই বা করবে কেন?

—আমার পেছনে কতকগুলো পাজী লোক লেগেছে তাই। ও বাড়িতে আমার বিয়ে হয়, এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না, তাই একটা চক্রান্ত করে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবার জন্যে এই মিছে মামলা সাজিয়েছে। কিন্তু আমি এদের দফারফা করে তবে ছাড়ব, তাও বলে রাখছি।

ধমক দিয়া এবার সৃষ্টিধর বলিল, থামো, ওসব বাহাদুরি পরে করো, এখন আমি যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দাও। এই মেনকা বাইটা কে?

কৃত্তিবাস কহিল, আমি কি করে জানব? বললুম না—মিছিমিছি একটা মামলা সাজিয়েছে।

—আদালতের সমন তুমি পেয়েছ?

—হ্যাঁ। রাস্তার মোড়ে পেয়াদার সঙ্গে দেখা। সমন পড়েই আমি অবাক। পুলিস কোর্টের সমন, কি করি, সই দিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু আসলে এসব মিছে।

সৃষ্টিধর গম্ভীর মুখে কহিল, কিন্তু তোমার নামে নালিশ যখন হয়েছে, কেস উঠেছে, তুমি মিছে বললে লোকে তা বিশ্বাস করবে কেন? হ্যাঁ, তবে যদি বেকসুর খালাস পাও, সে কথা আলাদা। কিন্তু এই নিয়ে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবে, কথাটা চাপা থাকবে না। হাতীবাবুরা এসব ব্যাপারে ভারি শক্ত। তাদের

কানে যদি এ খবর ওঠে, ওরা কখনই তোমাকে মেয়ে দেবে না ; সম্বন্ধ পাকা হলে কি হবে, তখুনি ভেঙ্গে দেবে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কৃত্তিবাস কহিল, আমার বরাত।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। কৃত্তিবাস উঠি উঠি করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মুখখানা শক্ত করিয়া সৃষ্টিধর কহিল, ওঠবার জন্য উস্‌খুস্‌ করছ যে !

কৃত্তিবাস কহিল, কোর্টের দিকেই যাব মনে করছি। কেসটার তো তদ্বির করতে হবে।

সৃষ্টিধর কহিল, কেস যখন মিছে, কোর্টে গিয়ে তদ্বির করবার কোন দরকার নেই। আমার উকিলকেই এখানে ডেকে পাঠাচ্ছি। এখন তোমার সঙ্গে আমার অন্য কাজ আছে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মাতুলের দিকে চাহিতেই বৃদ্ধ কহিল, আমার সঙ্গে সেরেস্তায় চল। খাতাপত্রগুলো আমি দেখব।

কৃত্তিবাসের মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমতা আমতা করিয়া কহিল, কদিন কিছুই দেখতে পারি নি, কাজ কতকগুলো পড়ে আছে ; এ হপ্তাটা যাক, তার পর আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

দৃঢ়স্বরে সৃষ্টিধর জানাইল, আমি এখুনি বুঝে নিতে চাই, যে কাজ পড়ে আছে থাকুক, তার জন্যে আমার মাথা ব্যথা নেই। তার আগের তারিখ পর্যন্ত আমি সমস্ত দেখব এখনই।

কৃত্তিবাসের আর আপত্তি করিবার সাহস হইল না, সৃষ্টিধর তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়াই সেরেস্তায় লইয়া চলিল।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরীক্ষার পরেই সৃষ্টিধর বুঝিল যে, হিসাবে পুকুর-চুরি হইয়াছে ; আগাগোড়াই নানাবিধ গোলমাল। এমন অসতর্কতার সহিত বহু অর্থ তছরূপ করা হইয়াছে যে, অন্য কেহ হইলে সৃষ্টিধর তাহাকে পুলিসে না দিয়া স্থির হইতে পারিত না।

দুই চক্ষু পাকাইয়া কৃত্তিবাসের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ তর্জনের সুরে কহিল, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি, কাগজে তোমার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা মিছে নয়। আমার সঙ্গেই যে ব্যবহার তুমি করেছ, যে ভাবে টাকা তছরূপ করেছ, এও একটা আলাদা পুলিস কেস। এসব টাকা তুমি কি করেছ শুনি ?

কৃত্তিবাস কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বৃদ্ধের ক্রোধ এবার চরমে উঠিল। চীৎকার করিয়া কহিল, শ্রীবাসকে ছেঁটে ফেলে যে ভুল আমি

করেছি, তার শাস্তি আমাকে ভগবান দিয়েছেন। সোনার চাঁদ ভাগনেকে আমি পর করে বাঁদরকে আমার টাটে বসিয়েছিলাম—তার ফল এখন হাতে হাতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি এসব সহ্য করব না, যদি ভাল চাও, যে টাকা ভেঙেছ, কড়ায় গণ্ডায় আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া চাই, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধাব তা বলে রাখছি।

চক্ষু পাকাইয়া ও মুখখানা বিকৃত করিয়া কৃত্তিবাস এবার মামার কথার উত্তর দিল, বরাবরই দেখছি নিজের কোলেই আপনি ঝোল টেনে চলেছেন। সব ব্যাপারেই যেন আমি দোষী। টাকার তছরূপই দেখবেন কিন্তু ত্রিশ হাজার টাকা যেদিন সেরেস্তায় তুলে দিয়েছিলুম, তখন আমার সুখ্যাতি আর মুখে ধরে নি।

তর্জনের সুরে সৃষ্টিধর কহিল, থাক, সে টাকা নিয়ে আর বড়াই করে কাজ নেই। একে তো জোচ্চুরির টাকা, তার পর সেটা তবিলে ঢুকিয়ে বেনোজল এনে ঘরের জলটুকু পর্যন্ত বের করে নিয়ে গেছিস্! তোর সেই চালাকিটুকু দেখেই ভেবেছিলুম—বিলেত ঘুরে এসে না জানি কত বড় কেলেভার হয়েছিস্—তাই না বিশ্বাস করে চাবিকাটিটা ছেড়ে দিয়ে—ডাইনের হাতে পো সমর্থন করেছিলুম।

বিদ্রূপের সুরে কৃত্তিবাস কহিল, হ্যাঁ, তখন আচমকা ত্রিশ হাজার টাকার পাওনাটা আপনার বুদ্ধিটাকেই গুলিয়ে দিয়েছিল,—ন্যাকা সেজেছিলেন সেদিন, কিছু জানতেন না! আর ডাইনের হাতে পো সমর্পণ করেছিলেন কিসের লোভে, সেটাও এখন মনে নেই! পাওয়ার অফ্ অ্যাটর্নী দিয়ে নিকিরিপাড়ার ইজারাদারি বিক্রি করালেন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই কৃত্তিবাসকে দিয়েই! যদি শান্তিরাম পাকড়ে নালিশ করত—তার ঝক্কি পোয়াত কে?

সৃষ্টিধর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, কে সেধেছিল তোকে ওসব ঝক্কির ভেতর যেতে? তুইই তো নিজের রিস্কেই ঐ নোংরা কাজে নেমেছিলি। ত্রিশ হাজার টাকা তো আমার তবিলে দিয়েছিলি, কিন্তু ওর তিন গুণ টাকা নিজেরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছিলি। হাতীবাবুদের সেরেস্তার ম্যানেজারের নাম করেছিলি, এখন বুঝছি সব বাজে—সমস্ত টাকাটাই ঐ মাগীটার খপ্পরে গিয়েছে;—এর পর আমার যথাসর্বস্বও ওপথে যাবার দাখিল হয়েছে।

কৃত্তিবাসও তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল, আপনার যথাসর্বস্ব তো এখন নামেই, তাল-পুকুর অথচ ঘটি ডোবে না। এই যে তিন লাখ টাকার ওপরে দেনা, তার জন্যে দায়ী কে! আর এই দেনা শোধবার রাস্তা দেখালেই বা কে?

—তুই? তোর ঐ ট্যারা চোখ আর কটা চামড়া দেখে রাধাশ্যাম হাতী ধর্না দিয়ে পড়েছিল আর কি! এর গোড়া হচ্ছে এই সৃষ্টিধর দাসের বুদ্ধি আর চাল,

তা জানিস ?—

—আপনার চেয়ে আমি বেশী জানি। এর গোড়া হচ্ছে ওদের স্টেটের জেনারেল ম্যানেজার। গোড়া থেকেই এই প্যাক্ট হয়েছিল। টাকাগুলো দিয়েই তাকে বেঁধেছিল এই কৃত্তিবাস কোলে ; যার ফলে বিয়ের সম্বন্ধটা পাকা হয়েছে। আপনি যা করেছেন তার কোন দাম নেই। ঐ ম্যানেজার আপনার হাল সব জানে। সে যদি সব ফাঁস করে দেয়—এক দিনেই আপনার নাম-ডাক সব ভুস্ করে ডুবে যাবে। আর এতে দাঁও মারবে কে ? নিকিরিপাড়ার ইজারাদারি বেচবার সময় যেমন আমাকে শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া রেখেছিলেন, এই বিয়ের ব্যাপারও তো সেই জন্যই করেছেন ! আমাকে বিক্রি করে নিজে নির্দায় হবেন ; অথচ সামান্য হাজার বত্রিশ টাকা গরমিল হয়েছে, বলে আপনি আমাকে একেবারে যাচ্ছেতাই করলেন সবার সামনে ! এই কটা টাকার জন্যে আপনি কিনা কুরুক্ষেত্র বাধাতে চান ! আচ্ছা, তাই হবে। আমি টাকার সন্ধানে চললাম, যোগাড় করে না আনতে পারি আমাকে না হয় জেলেই দেবেন।

কথাটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি দশটার পর বাড়িতে ফিরিয়া কৃত্তিবাস নিজের ঘরে ঢুকিল। বাবুর পরিচর্যায় চাকর ছুটিয়া আসিল, পাচক যথাযথ ভাবেই তাহার আহার্য রাখিয়া গেল। কৃত্তিবাস দেখিল, তাহার সেবার বা পরিচর্যার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই।

বেলা আটটার সময় সৃষ্টিধরের ঘরে কৃত্তিবাসের পুনরায় ডাক পড়িল। কম্পিতবক্ষে কৃত্তিবাস কর্ম্মমধ্যে প্রবেশ করিতেই সৃষ্টিধর কহিল, গুহ সাহেবকে খবর দিয়েছি। তিনি বাড়িতে তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কাগজপত্র যা আছে নিয়ে যাও, কেস্‌টা তাঁকে বুঝিয়ে দেবে। আমার কথা হচ্ছে এই—সত্য মিথ্যা কিছু বুঝি না, বেকসুর খালাস পাওয়া চাই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, শিগগির বেরিয়ে পড়।

কৃত্তিবাস বুঝিল, পূর্বদিনের তাহার ঝাঁঝালো কথাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। মামার মর্মদ্বারে রীতিমত খোঁচা দিয়াছে। মামা এই বুঝিয়াছে যে তাহাকে এখন হাতে না রাখিলে এবং উপস্থিত মামলার ব্যূহ হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে বিবাহ সম্পর্কে তাহার যত কিছু আশা ও কল্পনা সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

বিবাহের পূর্বেই এইরূপ একটা কেলেঙ্কারির কথা কাগজপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টিধর একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে। পাছে খবরটা পল্লবিত হইয়া ভাবী বৈবাহিকপক্ষকে সন্দিগ্ধ করিয়া তুলে, তজ্জন্য তিনি মনে মনে ইহার প্রতিবিধানের

নানারূপ ফন্দি আঁটিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না। এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি সেই ঘরে ঢুকিয়া কহিল, নমস্কার, আপনিই কি সৃষ্টিধরবাবু ?

চমকিত হইয়া গৃহস্বামী আগন্তুকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, দেখিলেন, কালো চেহারা, সাধারণ ধরনের কাপড়-জামা-পরা এক যুবা, দুইটি অসাধারণ চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ করিয়া পাথরে খোদা একটা মূর্তির মত দাঁড়াইয়া আছে।

সৃষ্টিধর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার প্রতিভাদীপ্ত-মুখখানার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে আপনি আসছেন, কি দরকার ?

যুবা গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, আমি আসছি নিকিরিপাড়া থেকে, আমার দরকার আপনাকে। কাজের কথা আছে।

নিকিরিপাড়ার নাম শুনিয়াই সৃষ্টিধরের বুকের ভিতরটা যেন ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। নিকিরিপাড়ার সম্বন্ধ তো তাহার চুকিয়া গিয়াছে, তবে পুনরায় প্রকারান্তরে তাহার সহিত নূতন সম্বন্ধ ঘটিবার আয়োজন চলিয়াছে বটে! তবে নিকিরি-পাড়ার নাম উঠিলে এখনও সৃষ্টিধরের বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে এবং সেই পাড়ারই আর একটা নাম যেন তাহাকে শাসাইতে থাকে।

আগন্তুকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সৃষ্টিধর এবার প্রশ্ন করিল, আপনার নাম ?

আগন্তুক উত্তর দিল, পাতিরাম পাকড়ে।

সৃষ্টিধরের মনে হইল কে যেন তাহার যুগল কর্ণবিবরে যুগপৎ দুইটি লৌহ-শলাকা ফুটাইয়া দিল। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে নীরবে থাকিয়া সে হাতখানা তুলিয়া আহ্বানের স্বরে কহিল, আসুন, বসুন এখানে।

পাতিরাম ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ফরাসের এক প্রান্তে জাঁকিয়া বসিল।

সৃষ্টিধর কহিল, আপনার নামটা যেন শোনা শোনা মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আপনার যেন মাছের কারবার ছিল, আর কি একটা হার্ডওয়ারী ফার্মও আছে।—

পাতিরাম কহিল, সেটা বাজে। আসল কাজ হচ্ছে আমার মাছ বেচা, আর এইটিই হচ্ছে পেশা, যাতে দিন চলে। যাক আপনার কাছে যেজন্য এসেছি শুনুন,—রণছোড়লাল ঝুনঝুনওয়ালা আর শিউরতন খৈতানের গদিতে আজ-

শুদ্ধ আপনার সুদে আসলে মোট তিন লাখ একুশ হাজার তিপ্পান্ন টাকা দেনা আছে—একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ?

সৃষ্টিধর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া হইয়া কহিল, আমার বাড়ি বয়ে এসে একথা বলবার মানে ?

পাতিরাম দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, মানে এই, ঐ দুটো গদির দেনা-পাওনা সমস্ত আমি কিনে নিয়েছি।

—বলেন কি ! দেনা-পাওনা—সমস্ত ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ! এর জন্যে আমাকে অনেকগুলো টাকা ঢালতে হয়েছে ; কাজেই তাড়াতাড়ি টাকাগুলো না তুললেই নয়। এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সৃষ্টিধর কহিল, বুঝেছি। কিন্তু পাওনা টাকাগুলো তো জলের মাছ নয় পাতিরামবাবু, যে মনে করলেই টাকা জলে দিয়ে এক দিনেই তুলে নেবেন !

পাতিরাম মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল, আমি কিন্তু তাই মনে করি। আমার কাছে জলের মাছ, খেতের ফসল আর খাতকের টাকা সব সমান, ইচ্ছা করলেই তুলতে পারা যায়।

বিরক্তকুটিল মুখে সৃষ্টিধর কহিল, ইচ্ছা করলেই তুলতে পারা যায় ! বলছেন কি আপনি ? তা হলে ঐ ঝুনঝুনওলা আর খৈতান এ কদিন চুপ করে থাকত ? তারা তুলতে পারে নি কেন ?

পাতিরাম কহিল, তাঁরা পারে নি কেন, সে খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না দাস মশাই। কিন্তু আমি তুলতে চাই। তাই লোক না পাঠিয়ে আর চিঠিবাজি না করে আমি নিজেই এসে আপনাকে বলতে এসেছি—আজ থেকে তিন দিনের ভেতর ঐ টাকাগুলো আপনি মিটিয়ে না দেন, চৌঠা দিন আমি হাইকোর্টে এই বলে আপনার নামে এফিডেবিট করব যে, আপনাকে যেন দেউলে সাব্যস্ত করা হয় -কেননা আপনার মেলা দেনা, য়্যাসেট্‌সের চেয়ে লায়াবিলিটিজ্ বেশী, দেউলে খাতায় আপনার নাম লেখানো উচিত।

সৃষ্টিধরের মনে হইল, এই অদ্ভুত লোকটা যেন তাহাকে তুলিয়া ফরাসের উপর হইতে ঝুপ করিয়া রাস্তার উপরে ফেলিয়া দিয়াছে। এমন সাংঘাতিক কথা মানুষের চামড়া-পরা কাহারও মুখ দিয়া এভাবে বাহির হইতে পারে—চোখের পরদা ছিঁড়িয়া দিয়া এমন করিয়া মুখের উপর স্পষ্ট কথা কেহ বলিতে সাহস করে—এ ধারণা তাহার ছিল না। মুখ দিয়া তাহার একটি কথাও বাহির হইল না।

পাত্তিরাম কহিল, তা হলে এই কথাই রইল। পরন্তু আমার লোক ঠিক এই সময় আপনার কাছে আসবে। আপনি তার সঙ্গে আমার য়্যাটর্নীর অফিসে যাবেন—সেইখানেই লেনদেন হবে। আর যদি আপত্তি থাকে, সেটাও বলে দেবেন।

সৃষ্টিধর কহিল, আপনি আমার ওপর এত নিষ্ঠুর কেন হচ্ছেন পাত্তিরামবাবু? বেশ তো, ওদের পাওনা কিনে নিয়েছেন, এ তো ভাল কথা! এখন আমার সঙ্গে একটা রফা করে—

ফরাস হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া পাত্তিরাম কহিল, রফা আমার কোষ্ঠীতে লেখে না, বোক-শোধ হচ্ছে আমার কারবারের মটো। আচ্ছা—নমস্কার।

আর কোন কথা না বলিয়া অথবা সৃষ্টিধরকে এ প্রসঙ্গে অন্য কথা কহিবার অবসর না দিয়া পাত্তিরাম ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সৃষ্টিধর স্তব্ধভাবে ফরাসের উপর বসিয়া এই অদ্ভুত মানুষটির সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। যে লোক এতটা কঠিন হইতে পারে তাহার হুমকি যে মিথ্যা হইতে পারে না—সে যে মনে করিলে এক দিনেই তাহাকে রাস্তায় নামাইয়া দিতে পারে—এই চিন্তা তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যদি সত্যই সে তাহা করে? তখন?—কি সর্বনাশ। একথা তো চাপা থাকিবে না; তাহার দেনার কথাও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। তখন কি নিকিরিপাড়া সম্পর্কে তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে? না—যেমন করিয়া হউক, পাত্তিরামের মুখ তাহাকে বন্ধ করিতেই হইবে। এখন একমাত্র উপায় শ্রীবাস, সে-ই তাহাকে এ বিপদে রক্ষা করিতে পারিবে।

॥ কুড়ি ॥

যেমন এক দিন শ্রীবাসের জুড়ি তাহার মামার বাড়ির দেউড়ির সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায় এবং জুড়ি হইতে নামিয়া সে মামাকে ডাক লাগাইয়া দেয়, তেমনই এক দিন সৃষ্টিধরের বাড়ির গাড়ি শ্রীবাসের সুবৃহৎ বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রকাণ্ড বাড়ি। বাহির মহলে বিরাট কর্মশালা; চারিদিকে লোকজন গিস্‌গিস্ করিতেছে। এক একটি ঘরে এক-একটি বিভাগ, ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন,

আদায়-উশুল, বন্ধকী ব্যাপার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর কারবারের বিরাট প্রতিষ্ঠান। দেউড়িতে লোহার শিকলে প্রকাণ্ড এক পেটা ঘড়ি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সশব্দে সময় নির্দেশ করিতেছে। দরজার ধারেই উর্দিপরা দারোয়ান সদাসর্বদা মোতায়েন। ভিতরে ঢুকিলেই শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মধারা হইতে প্রতিষ্ঠানটির আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবাসকে তাহার মাতুল স্বষ্টিধরের উপরে তুলিতে এবং সেই সঙ্গে স্বীয় আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধ করিতে পাতিরাম যদিও প্রথমে দুই-একটি ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই কি ভাবিয়া সেই আওয়াজটি যে একেবারে ফাঁকা নয়—তাহা প্রতিপন্ন করিতে এক বিরাট কাণ্ড বাধাইয়া বসে!

এই বিশাল বাড়িখানি তাহার কাছেই দায়বদ্ধ অবস্থায় ছিল। সুতরাং এখানে শ্রীবাসকে মালিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা পাতিরামের পক্ষে কঠিন হয় নাই, কিন্তু পাছে সংঘর্ষকালে গোড়ায় এই গলদটুকুর সুযোগ লইয়া প্রতিপক্ষ শ্রীবাসকে জাল ধনী সাব্যস্ত করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় পাতিরাম শ্রীবাসকে সম-অংশীদার করিয়া বিশ্বাস কোম্পানি নামে এক বিরাট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে এবং নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের মূলধন হইতেই বাড়িখানি কিনিয়া লয়। বাহিরে পাতিরামের প্রচার কৌশলে ইহাও প্রচারিত হয় যে, শ্রীবাস বিশ্বাসই এই প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক।

কিন্তু পাতিরামের কাণ্ড দেখিয়া শ্রীবাস বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। সে কম্পিতকণ্ঠে তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করে, স্যার, আপনার মতলব তো কিছু বুঝতে পারছি না। মুলুকচাঁদ ধুধুরিয়ার মত ফাঁকা আওয়াজ দিতে আমাকে তো জাহির করলেন, কিন্তু এখন দেখছি, সবই যে উল্টে গেল; জাল আসল হয়ে দাঁড়াল!

পাতিরাম তখন হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, আমার স্বভাবটাই এই রকম শ্রীবাস। প্রথমটা আমি লোকটাকে ধরে খুব কষে নাড়াচাড়া দিই, তাতেও যদি সে খাড়া থাকে টিকে যায়, তখন তাকে আমার ওপরেও তুলে দিতে চাই। তাতে সে লোক যত আশ্চর্য হয়, আমিও তত আনন্দ পাই। হ্যাঁ, এখন আমার কথা শোন, কাজের খাতিরে আমি যেমন মিছে কথা বলি, তেমনি সুযোগ পেলে আর আবশ্যক বুঝলে মিছে কথাটাকেও সাংঘাতিক খাঁটী করে তুলি। আমার লোকজনের কাছে বলেছি তুমি আমার কারবারের অংশীদার। যোগ্যতার পরীক্ষায় ভালরকম পাশ করে তুমি বেরিয়ে এসেছ বলেই আমি সত্যি সত্যি তোমাকে অংশী

দার করে নিচ্ছি। তুমিও জান, এই বিশ্বাস কোম্পানির ক্যাপিট্যাল হচ্ছে পুরো-পুরি ছ'লাখ টাকা। বাড়িখানা কিনতে এক লাখ বেরিয়ে গেছে। বাকিটা এর ক্যাপিটাল খাতে আছে। সমস্ত ক্যাপিটালটা আমি যদিও বের করেছি, কিন্তু এর অর্ধেক তিন লাখ টাকা তোমাকে দিতে হবে।

শ্রীবাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুধু বলিয়াছিল, কিন্তু আমি ঐ তিন লাখ কোথা থেকে দেব স্যার। আমার কাছে এ সবই স্বপ্নের মত—

পাতিরাম তখন এই বলিয়া শ্রীবাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল, আগেকার খোলস তুমি ছেড়ে এসেছ শ্রীবাস ; এ কথা ভুলে যেও না, তুমি এখন এমন একটা কোম্পানির সমান অংশীদার ও মালিক, যার বাড়িখানা নিজেদের, আর মূলধন পাঁচলাখ টাকা। এ থেকে তিন লাখ টাকা শোধ করতে কতক্ষণ ? শোধ করবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দেব, তার জন্য এখন থেকে ভাবনার কি দরকার। তবে একটা কথা হচ্ছে এই, এসব কথা ভেতরের, বাইরে প্রকাশ থাকবে—তুমিই এই কারবার ফেঁদেছ, বাড়ি কিনেছ, মালিক হয়ে একে চালাচ্ছ। আরও অনেক কথা আছে, সে সব ক্রমশ শুনতে পাবে।

সৃষ্টিধর এই প্রথম বিশ্বাস কোম্পানি তথা তাহার মালিক শ্রীবাস বিশ্বাসের বিরাট প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিল। শ্রীবাস তখন তাহার খাস কামরায় বসিয়া কতিপয় মাড়োয়ারী দালালের সহিত তিসির কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল।

বেহারা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সৃষ্টিধরের নাম ও ঠিকানা লেখা এক টুকরা কাগজ তাহার টেবিলে দাখিল করিল। নাম পড়িয়াই শ্রীবাস সোজা হইয়া দাঁড়াইল। কক্ষে সমবেত মাড়োয়ারীরাও তাড়াতাড়ি উঠিতেছিল, কিন্তু শ্রীবাস বাধা দিয়া কহিল, আপনারা বসুন, আমি এখুনি আসছি। কক্ষের বাহিরেই সৃষ্টিধরকে দেখিয়া শ্রীবাস ছুটিয়া গিয়া তাহার পদতলে মাথা নত করিয়া দিল এবং তাহাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া হাত ধরিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিল।

সৃষ্টিধরকে সম্মুখের আসনে বসাইয়া শ্রীবাস মাড়োয়াড়ীদিগের সহিত তাহাকে পরিচিত করিয়া দিল। তাহারা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত তাহাকে অভিবাদন করিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই কথাবার্তা শেষ করিয়া শ্রীবাস মাড়োয়ারীদিগকে বিদায় দিল। তাহার পর মামার দিকে চাহিয়া কহিল, আজ যখন এসেছেন, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করতে হবে কিন্তু—

সৃষ্টিধর কহিল, খাওয়া দাওয়া আর একদিন এসে ধীরেসুস্থে করব। এখন

মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়েছে বাবা, এমন মুস্কিলে কখনও পড়ি নি, সেই জন্তই তোমার কাছে এসেছি।

শ্রীবাস কহিল, আপনার চেহারা দেখেই সেটা মনে হচ্ছে বটে। আমিও এটা খুব বুঝি মামা, মনে দুশ্চিন্তা থাকলে তার ছায়া মুখেও ফুটে ওঠে। কিছুতেই সোয়াস্তি আসে না। ক্ষুধা তখন মাথায় ওঠে। আচ্ছা বলুন তো, ব্যাপারখানা কি?

সৃষ্টিধর তখন কহিল, আমার কিছু দেনা আছে বাবা, কিছু মানে লাখ তিনেকের ধাক্কা; দেনাটা শোধ করবার আমি একটা উপায়ও পেয়েছি, তবে কিছু দেরি হবে, কিন্তু তার আগেই একটা মহা ফ্যাসাদ বাধিয়েছে এক ব্যাটা ভুঁই-ফোঁড় ধড়িবাজ। সে করেছে কি জান—যে দুটো মহাজনের কাছে আমার দেনা, তাদের কাছ থেকে সেটা কিনে নিয়ে আমাকে হুমকি দিয়েছে। তিন দিনের ভেতর সমস্ত পাওনা যদি পরিষ্কার করে না দিই—সে আমাকে দেউলে খাতায় নাম লিখিয়ে তবে ছাড়বে।

বিস্ময়ের সুরে শ্রীবাস কহিল, বলেন কি মামা। কিন্তু এতে তার লাভ?

সৃষ্টিধর কহিল, আমিও ভেবে ঠিক করতে পারি নি—নিজের নাক-কান কেটে অন্যের যাত্রাভঙ্গ করে কি লাভ! তবে এমন হতে পারে—ভেবেছে মানের দায়ে যেমন করে হোক টাকাটা আমি ফেলে দেব। কিন্তু তিন দিনের ভেতর এতগুলো টাকা যোগাড় করা কি সোজা কথা বাবা? অথচ, সে লোকটার যেমন মেজাজ দেখলুম, তাতে মনে হচ্ছে সে সব পারে। টাকা না দিলে আমাকে মুস্কিলেই ফেলবে।

শ্রীবাস কহিল, কিন্তু মনে করলেই তো আর এক জন নামী লোককে এমন করে বেইজ্জত করা যায় না মামা! দেনা আপনার যেমন আছে, তেমনি বিষয়-সম্পত্তিও তো আপনার কম নয়।

সৃষ্টিধর কহিল, সেটাই সবাই জানে, লুকোবার নয়। লুকিয়ে আছে শুধু ঐ দেনাটা—সবাই যা জানে না। এখন আমার মস্ত ভাবনা কি জান? যদি ও লোকটা ঐ পাওনাটা তুলে এফিডেভিট করে তা হলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। আর আমার যে উপায়টা সামনে ঝুলছে, দিনকতক পরেই হাতে এসে পড়বার কথা, আমার দেনার ব্যাপারটা রাষ্ট্র হলেই সেটা উপে যাবে, বুঝেছ?

শ্রীবাস মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, তা হলে এখন উপায়? কি করবেন বলুন তো, টাকাও তো কম নয়।

সৃষ্টিধর কহিল, সেইজন্তেই তো তোমার কাছে এসেছি বাবা, এখন তুমি যদি

টাকাটা যোগাড় করে দিতে পার—

কথাটা এইখানে শেষ করিয়া সৃষ্টিধর দুই চক্ষুর সাগ্রহদৃষ্টি শ্রীবাসের মুখের উপর নিবদ্ধ করিল।

শ্রীবাস একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমার টাকাগুলো সবই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, হাতে থাকলে কোন কথাই ছিল না, তবে হাতে এখন না থাকলেও লোক আছে।—আপনার আপত্তি না থাকলে এখুনি আপনাকে নিয়ে তার কাছে যেতে পারি।

সৃষ্টিধর কহিল, আমার যেতে আপত্তি নেই, যদি বোঝ যে সেখানে কাজ উদ্ধার হবেই আর ব্যাপারটা চাপাই থাকবে।

শ্রীবাস কহিল, সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আমি যে লোকের কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি মামা, তার ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে।

কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে মামাকে লইয়া সেই লোকের খাস কামরায় প্রবেশ করিতেই লোকটিকে দেখিয়া মামার মুখখানি একেবারে ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সে দেখিল,—যাহার দুর্বার আর্থিক বুভুক্ষা মিটাইবার আশঙ্কা লইয়াই তাহারা এখানে আসিয়াছে, সেই সাংঘাতিক মানুষটিই তাহাদের সম্মুখে বসিয়া আছে। সে মানুষ আর কেহই নহে, নগদবিদায় এজেন্সীর মালিক, নিকিরিপাড়ার মাথা—স্বয়ং পাতিরাম পাকড়ে।

পাতিরাম সহাস্যে কহিল, আসুন শ্রীবাসবাবু, আসুন। এ কি, সৃষ্টিধরবাবু যে! কি ভাগ্য! বসুন আপনারা, বসুন।

উভয়ে পাশাপাশি দুইখানা কেদারায় বসিলে পাতিরাম কহিল, আপনাদের চেনা-শোনা আছে নাকি?

শ্রীবাস কহিল, বিলক্ষণ! ইনি যে আমার মামা হন, তা বুঝি জানেন না?

হাস্যস্ফুরিত মুখে বিস্ময়ের ঈষৎ রেখা ফুটাইয়া পাতিরাম কহিল, বটে। আপনি তা হলে সৃষ্টিধরবাবুর ভাগনে? আপনার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ, কিন্তু এ কথাটা কোন দিন শুনি নি তো। যাক্, হঠাৎ কি মনে করে গরীবের কুটিরে আসা হয়েছে সৃষ্টিধরবাবু! শ্রীবাসের কথা ছেড়ে দিন, আসা-যাওয়া প্রায়ই আছে; কিন্তু আপনার মত দিকপালের পায়ের ধুলো যে এখানে পড়বে, সেটা তো কল্পনাও করি নি।

সৃষ্টিধর শুষ্ক কণ্ঠে কহিল, কি যে বলছেন, তার ঠিক নেই। আপনি তো সবই জানেন, সুতরাং মিছিমিছি বাড়িয়ে কি লাভ বলুন না! তবে আমার কথা যেটা

বলছেন, সেটার ভেতর একটা ভারি গলদ হয়ে গেছে।

মুখে কৌতুকের ভঙ্গী ফুটাইয়া পাত্তিরাম কহিল, কি বলুন তো?

স্বষ্টিধর কহিল, ভূতের ভয়ে রোজার সন্ধানে বেরিয়েছিলুম। শ্রীবাসকে বলতে সে জানালে—তার সন্ধানে ভাল রোজা আছে। কিন্তু ওর সঙ্গে এসে এখন দেখছি—

পাত্তিরাম কহিল, সেই ভূতটাই রোজা হয়ে বসে আছে, কেমন? যাক্, ব্যাপারখানা আমি বুঝে নিয়েছি। শ্রীবাসকে ধরেছেন লাখ তিনেক টাকার জন্য, ওর হাতে টাকা না থাকায় উনি আমার কাছে আপনাকে এনে হাজির করেছেন। কিন্তু, এতে আপনার হতাশ হবার কিছু নেই স্বষ্টিধরবাবু। সেদিন আপনার বাড়িতে যে লোক গিয়ে টাকার হুমকি দিয়ে এসেছিল, সে চায় পাওনা টাকা আদায় করতে, আর এখানে যে লোক বসে আছে দেখছেন, এ চায় আঁটঘাট বেধে টাকা খাটাতে।

স্বষ্টিধর অভিভূতের মত পাত্তিরামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পাত্তিরাম বলিয়া চলিল, শ্রীবাসবাবু যেমন আপনার সব জানেন, আমিও তেমনি আপনার সব খবরই রাখি। আপনাকে লাখ তিনেক টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই, কেননা শ্রীবাসবাবু আপনাকে যখন এনেছেন, ওর মান আমাকে রাখতেই হবে। তবে কি জানেন, ভদ্রলোকের দায়ে-অদায়ে টাকাকড়ি দিতে আমি যেমন পোক্ত, সেটা আদায় করবার রাস্তাগুলোও জেনেশুনে নিতে তেমনি আমাকে শক্ত হতে হয়।

স্বষ্টিধর কহিল, টাকা দিতে শক্ত হবেন, এতে আর কথা কি। কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি না, এর জন্য আলাদা লেখাপড়ার কি দরকার; আমার যে দেনা আপনি কিনেছেন, তারই মেয়াদ মাস তিনেক বাড়িয়ে দিলেই তো গোল মিটে যায়।

পাত্তিরাম কহিল, তা যায়, কিন্তু আমি সে রাস্তায় যেতে রাজী নই। গোড়াতেই আপনাকে বললুম না, যে লোক আপনার বাড়িতে গিয়ে তাগাদা দিয়েছে আর যে লোক ঐ দেনা শোধ করবার জন্য টাকা দিতে বসেছে—আপনাকে ভাবতে হবে এরা আলাদা। আপনি রীতিমত দলিল লেখাপড়া করে তিন লাখ টাকা এক হাতে নেবেন আর এক হাতে ঐ টাকাটা দিয়ে পুরনো দলিলগুলো ফিরিয়ে নেবেন।

স্বষ্টিধর কহিল, লেখাপড়া কিভাবে হবে?

পাত্তিরাম কহিল, টাকা-পয়সা শোধ না হওয়া পর্যন্ত আপনার এস্টেট আমাদের

হাতে থাকবে। যে টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তা থেকেই আমরা আস্তে আস্তে আমাদের দেওয়া টাকাটা উসুল করে নেব।

সৃষ্টিধর কহিল, না। এ প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না। এতে আমার প্রেস্টিজে ঘা পড়বে। যেজন্য আমি দেনার ব্যাপারটা লুকোতে চাইছি, সেটা সবাই জানতে পারবে।

পাত্তিরাম কহিল, আমরা কি এমনি আহাম্মুকের মত কাজ করব ভেবেছেন? আমরা মানীর মান রাখতে জানি। আপনার এস্টেটের উপর খবরদারি করতে আমি যাব না। আমার লোকজনও যাবে না। সেসব দেখা-শোনা করবে আমার তরফ থেকে আপনার এই ভাগনে শ্রীবাসবাবু, কেন না, এ ব্যাপারে ওঁকেই সমস্ত রিস্ক্ নিয়ে কাজ করতে হবে—যখন আপনাকে উনি এনেছেন! ওঁর ওপর আমার বিশ্বাস এত বেশী যে টাকাটা যদিও আমি দেব, কিন্তু দলিলটা হবে ওঁরই নামে, তাতে আপনার আরও সুবিধা, লোকে জানবে—আপনার ভাগনের উপরই আপনি সব ভার দিয়েছেন, তিনিই আপনার এস্টেট দেখা-শোনা করছেন।

সৃষ্টিধর কহিল, বেশ, এতে আমার আপত্তি নেই। আপনি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করুন।

সেইদিনই দলিল লেখা ও যথারীতি রেজেস্টারী হইয়া গেল। শ্রীবাসই যেন সৃষ্টিধরকে তিন লক্ষ টাকা এই শর্তে ধার দিল যে, সৃষ্টিধরের তাবৎ সম্পত্তি সে তত্ত্বাবধান করিবে এবং সৃষ্টিধরের সেরেস্তার লোকজনের বেতন ও সংসার খরচাদি নির্বাহ করিয়া অবশিষ্ট টাকা হইতে দেনার টাকা উসুল করিতে থাকিবে।

॥ একুশ ॥

ইহার পর খুব তোড়জোড় করিয়াই মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। কৃত্তিবাসের পক্ষ হইতে গুহ সাহেব সওয়াল করিলেন, কেসটা সম্পূর্ণ সাজানো, মে. কা বাইয়ের সহিত কস্মিনকালেও কৃত্তিবাসের আলাপ-পরিচয় নাই। শহরে একশ্রেণীর রূপোপ-জীবিনী আছে, ইহারা বড়লোকের ছেলেদের পিছনে লোক লাগায় ও তাহার বিষয় অনেক কিছু জানিয়া লইয়া শেষে তাহাকে এইভাবে জব্দ করিয়া থাকে। কৃত্তিবাস শিক্ষিত যুবা, তাহার স্বভাব-চরিত্র গঙ্গাজলের মত নির্মল।

কিন্তু মেনকা বাইয়ের পক্ষ হইতে এমন কতকগুলি মারাত্মক প্রমাণ দাখিল

করা হইল যে, তাহার প্রত্যেকটি কৃত্তিবাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতার দর্পণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাড়িওয়ালার সাক্ষ্য, দোকানদারের হিসাব, চাকরদের সাক্ষ্য, সাপ্তাহিক জলসার ফিরিস্তি প্রভৃতি ম্যাজিস্ট্রেটের একজিবিট লিস্টের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গুহ সাহেবকে পর্যন্ত স্তব্ধ করিয়া দিল। ইহার উপর তরুণী রূপসী মেনকা আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সুস্পষ্টভাবে জানাইল, কৃত্তিবাস এমন কোন তালেবর লোক নয় যে, তাহাকে জব্দ করিবার জন্য আমি এইভাবে একটা মিথ্যা মামলা রুজু করিব। নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া আমি যাহা উপার্জন করি, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কৃত্তিবাসের আর্থিক অবস্থা যে সচ্ছল নয় এবং তাহাকে যে নানাবিধ অবৈধ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও আমি জানি। সে যদি আমার ক্ষতিপূরণে অসমর্থ হয়, আমি আমার আর্থিক দাবি ত্যাগ করিতেও পারি। কিন্তু আমার সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই এবং সে নিজেকে সত্যবাদী সচ্চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে যাহা বলিয়াছে তাহা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা– তাহারই হস্তলিখিত কতিপয় পত্র ও আমাদের যুগ্ম ফটোচিত্র হইতে প্রকাশ পাইবে। এই পত্র ও ফটোগুলি যে আসল, জাল নহে, অপর পক্ষ তাহা যে কোন উপায়ে পরীক্ষা করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, মামলায় কৃত্তিবাসকে হারিতে হইল। সে যে মিথ্যাবাদী ও চরিত্র-হীন আদালতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া গেল। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে এ যাত্রা সাবধান করিয়া অব্যাহতি দিলেন।

যে ধনীকন্যার সহিত কৃত্তিবাসের বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার নাম রাধাশ্যাম হাতী। অতিশয় স্থূল দেহখানি অতিকায় এক তাকিয়ার উপর ন্যস্ত করিয়া অনেকগুলি পারিষদ ও আত্মীয়গণের সহিত হাতী মহাশয় বাহিরের বৈঠক-খানায় তাঁহার ভাবী জামাতার প্রসঙ্গেই আলোচনা করিতেছিলেন।

কৃত্তিবাসের মকদ্দমার আজ রায় বাহির হইবার কথা। হিতৈষীবর্গ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, আগে রায়টা দেখুন, কেসটা ধোপে টেঁকে কিনা, ব্যাপারখানা আসল কি নকল, সে সব না জেনে কোন কিছু করা ঠিক হবে না।

রাধাশ্যামবাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, চরিত্রবান এবং হিসাবী লোক। কৃত্তিবাস ছেলেটি চালাক-চতুর, শিক্ষিত এবং অপুত্রক মাতুলের সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জানিয়া খুব খুশী মনেই তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। বনেদী বংশের দিকেও ইহার একটা ঝোঁক ছিল, সেদিক দিয়াও কৃত্তিবাস যোগ্যতাসম্পন্ন। আশীর্বাদ

যেখানে হইয়া গিয়াছে এবং বিপুল ঘটা করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিয়াছে, নিয়তির কঠোর পরিহাসের মতই সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে পাত্র সম্বন্ধে এই সাংঘাতিক সংবাদ। খবরের কাগজের ছাপা বিবরণটুকুর প্রত্যেক কথাটি যেন তীরের ফলার মত তাঁহার মর্মে বিদ্ধ হইল। উৎসবমুখর বহুজনপূর্ণ ভবনে একটা নিরানন্দের ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সুপরামর্শের সভাও বসিয়া গেল। অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু কেহই কোন প্রকারে কৃত্তিবাসের স্থলে তাহার অনুরূপ একটি পাত্রের সন্ধান দিতে পারিল না। শেষে ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেট কি রায় দেন, তাহা দেখিয়া পরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

সপারিষদ রাধাশ্যামবাবু সাগ্রহে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেরেস্তার দুই জন কর্মচারী খবর আনিবার জন্য পূর্বাহ্নেই আদালতে ছুটিয়াছিল।

অপরাহ্ণের দিকে তাহারা যখন আদালত হইতে ফিরিয়া প্রভুর বৈঠকখানায় ঢুকিল, তাহাদের মুখভঙ্গী দেখিয়াই সকলে বুঝিল, খবর ভাল নহে।

অতঃপর তাহারা যে মর্মন্তুদ খবর শুনাইয়া দিল, বৈঠকখানায় সমবেত সকলেই তাহাতে স্তব্ধ হইয়া গেল। রাধাশ্যামবাবু কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, এখন আমি কি করব? উপায় কি! মেয়েকে তো হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিতে পারি নে!

এ সম্পর্কে নানারূপ আলোচনা ও বিতর্কে বিশাল বৈঠকঘরখানা যখন মুখর হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় ছাতাটি বগলে লইয়া সীতানাথ শীল ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

রাধাশ্যামবাবু তাহাকে দেখিয়া যেন অকূলে কূল পাইলেন। মাত্র কয়েকদিন হইল, ইঁহাদের বংশের একটা কাহিনী লিখিবার প্রসঙ্গ লইয়া এই লোকটি এখানে আসিয়াছিল এবং কথাপ্রসঙ্গে ভাগ্যগণনায় তাহার অসামান্য কৃতিত্বে গৃহস্বামীকে চমৎকৃত করিয়া কাজ গুছাইয়া গিয়াছিল।

রাধাশ্যামবাবু দুই হাত তুলিয়া কহিলেন, আসুন, সীতানাথবাবু আসুন। আপনাকে এ সময় পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি। মনের টানেই যেন আপনি এসে পড়েছেন।

সীতানাথ কহিল, ভারি একটা মুস্কিলে পড়েই আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে স্যার! সেদিন আপনি বললেন না, কলকাতার ভেতর আপনাদের জাতের দুটো পুরনো ঘর আছে; একটা ঘরের কর্তা হচ্ছেন আপনি আর একটি ঘরের কর্তা

হচ্ছেন আপনার হবু বেহাইমশাই সৃষ্টিধর দাস। কিন্তু আমি আর একটি বড ঘরের সন্ধান পেয়েছি, তিনি হচ্ছেন বিশ্বাস কোম্পানির মালিক শ্রীবাস বিশ্বাস! তাঁদের বংশের কথা লেখবার জন্য ধরেছিলাম কিনা? তিনিও আপনার মত সদয় হয়ে তাঁর বংশপরিচয় লিখতে দিয়েছেন। তাতেই জানলুম কিনা, তিনিও আপনাদের—হয়তো জানা-শোনাও থাকতে পারে।

রাধাশ্যামবাবু বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিলেন, আমাদের ঘরে বিশ্বাস? হ্যাঁ, বিশ্বাস কোম্পানির নাম আমরা জানি, খুব ফলাও কারবার ফেঁদেছে শুনেছি, কিন্তু এই বিশ্বাস যে—

তাড়াতাড়ি একখানি ছক ও সেই সঙ্গে সুন্দর একখানি ফটোচিত্র বাহির করিয়া সীতানাথ কহিল, এই দেখুন না, আমাকে সব নোট দিয়েছেন লিখে। জাতি, গাঁই, গোত্র সব। তবে আপনাদের সঙ্গে আর সব দিক দিয়েই মিলছে, খালি বয়সের দিক দিয়ে মিলছে না। আপনারা দুই বৈবাহিক বুড়িয়ে এসেছেন, আর ইনি দিব্য জোয়ান আছেন—এই দেখুন না, কেমন খাসা চেহারা, আর বয়স কতই বা হবে; বড জোর ছাব্বিশ। কিন্তু এই বয়সেই এতবড একটা কারবার চালাচ্ছে। এখনও বিয়ে পর্যন্ত করে নি, খাসা ছেলে। আপনাদের ঘরে এরকম ছেলে যে থাকতে পারে তা ভাবি নি।

ফটোখানির উপর দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাধাশ্যাম কহিলেন, কি নাম বললেন?

সীতানাথ কহিল, নাম এর শ্রীবাস বিশ্বাস। আমি ঠিক করেছি, বংশপরিচয়ে আপনাদের দুই বৈবাহিকের পরেই এঁর বিষয় ছাপাব। আপনাদের ফটোগুলো কিন্তু আজ দিতে হবে স্যার! ব্লক তৈরী করতে হবে তো।

রাধাশ্যাম কহিল, সে সব আর এক দিন হবে। আজ আমরা একটা ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত আছি। আচ্ছা সীতানাথবাবু, আমার ভাবী জামাইয়ের রাশিচক্রটা এক বার দেখে দেবেন?

সীতানাথ কহিল, নিশ্চয়ই দেখব, কাছে আছে?

রাধাশ্যামবাবু তাঁহার মেরজাইয়ের পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া সীতানাথের হাতে দিয়া কহিলেন, দেখুন তো!

সীতানাথ কহিল, ভালই হল, আর একটা পরিচয় বাড়ল। আপনার জামাতা ও কন্যার একটা আলাদা চ্যাপটার ছাপব। আপনার জামাইয়ের একখানা আর মেয়ের একখানা ছবি দেবেন।

রাধাশ্যাম কহিলেন, সে সব পরে হবে। আগে এই রাশিচক্রটা তো দেখুন।

প্রায় পনেরো মিনিট ধরিয়া নানারূপ মুখভঙ্গী করিতে করিতে সীতানাথ একখানি কাগজের পৃষ্ঠা বিবিধ অঙ্কপাতে ভরাইয়া ফেলিল। তাহার পর মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল, দেখুন স্যার! আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন; এ রাশিচক্র আপনার জামাতার হতে পারে না।

রাধাশ্যাম কহিলেন, এর মানে?

সীতানাথ কহিল, মানে হচ্ছে, এই জাতকের বিবাহযোগ মোটেই নেই। অবিদ্যার সংযোগ বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। জাতক খুব চতুর বটে, কিন্তু রাজদ্বারে নিগ্রহের যোগ প্রবল রয়েছে, তা ছাড়া এ জাতক কস্মিন কালেও বিত্তবান হবে না, বরং এঁকে বিত্তনাশক বলা যেতে পারে। এর হাতে সময় সময় প্রচুর বিত্ত আসতে পারে, কিন্তু সেটা অধর্ম পথ দিয়েই আসবে, আর তাতে বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্ট, এ জাতক কেমন করে আপনার জামাতা হতে পারে?

রাধাশ্যামবাবু কহিলেন, শহরের বড বড় জ্যোতিষী দিয়ে আমি এই রাশিচক্র গণিয়েছি, কিন্তু আপনি যেসব কথা বললেন, আর কেউ বলেন নি।

সীতানাথ কহিলেন, আমার তো এই দোষ স্যার, রেখে-ঢেকে বলতে পারি না। তা ছাড়া ভৃগুর মতে আমি গণনা করি, আমার গণনার ধারা আলাদা, কারুর সঙ্গে মেলে না। তবে জোর করে আমি বলতে পারি স্যার—এ রাশিচক্র কখনই আপনার জামাতার নয়, হতে পারে না।

রাধাশ্যামবাবু একথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া সজোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হুঁ!

এমন সময় প্রৌঢ়বয়স্ক এক ব্যক্তি সেখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে গৃহস্বামীকে নমস্কার করিল। রাধাশ্যামবাবু প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক কহিল, আপনার কাছেই এসেছি। গোপনে একটু কথা আছে।

গোপন কথা শুনিবার জন্য বিপুল দেহখানি তুলিবার চেষ্টা না করিয়া রাধাশ্যামবাবু আগন্তুককে পার্শ্বে ডাকিয়া কর্ণ দুইটি তাহার দিকে হেলাইয়া দিলেন।

আগন্তুক অন্যের অশ্রুত স্বরে কহিল, দেখুন স্যার, এক সময় দালালি করে অনেক পয়সাই আপনাদের খেয়েছি। কিন্তু আজ এমন একটা খবর আপনাদের পেয়েছি, যা শুনলে আপনি চমকে উঠবেন। আপনাদের অনেক খবর রাখি বলে, এ খবরটা জানাতে ছুটে এসেছি। যদি আজ্ঞা করেন তো বলি।

রাধাশ্যামবাবু কহিলেন, যখন বলতে এসেছেন, বলেই ফেলুন।

আগন্তুক কহিল, আপনার হবু বেয়াই আপনাকে ভারি ঠকিয়েছেন। তাঁর সমস্ত এস্টেট একরকম বেহাত করে ফেলেছেন।

—বলেন কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিন লাখ টাকা দিয়ে এক জন তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই হাতিয়ে নিয়েছে।

—কথাটা বুঝতে পারলুম না। টাকা ফেলে হাতিয়ে নিলে, এর মানে ?

—টাকাটা দেনায় গেছে। তিন লাখ টাকায় এস্টেটটা বন্ধক ছিল। ঐ লোকটা সেটা খালাস করে এস্টেটটা হাতে নিয়েছে। এতে তার বরাত খুলে গেল, কিন্তু আপনার জামাইকে যে পথে বসতে হল।

—আপনার কথা যে সত্য, তার প্রমাণ কি ?

আগন্তুক কহিল, প্রমাণ রেজেস্টারি অফিস, সেখানে সার্চ করলেই সব জানতে পারবেন।

রাধাশ্যামবাবু প্রশ্ন করিলেন, যে লোক এস্টেট হাতে নিচ্ছে বললেন, তার নামটা জেনেছেন ?

আগন্তুক কহিল, নিশ্চয়। তার নাম হচ্ছে—শ্রীবাস বিশ্বাস; বিশ্বাস কোম্পানির প্রোপ্রাইটার।

তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া রাধাশ্যামবাবু সীতানাথের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। একটু আগে তাহার মুখ দিয়া এই নামটিই নির্গত হইয়াছিল।

আগন্তুক সংবাদদাতাকে চুপি চুপি রাধাশ্যামবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নামটি—

আগন্তুক উত্তর দিল, সহদেব সাঁতরা। আমি রেজিস্টারি অফিসে চাকরি করি স্যার! আপনার সেরেস্তার অনেকেই আমাকে জানেন।

রাধাশ্যামবাবু কহিলেন, আচ্ছা, কাল আমার লোক বেলা দশটার পর রেজিস্টারি অফিসে সার্চ করতে যাবে। আপনার প্রাপ্য গণ্ডা সেখানেই পাবেন।

সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া লোকটি উঠিয়া গেল।

রাধাশ্যামবাবু তখন সীতানাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, আপনার এখন অবসর আছে সীতানাথবাবু ?

সীতানাথ কহিল, কেন বলুন তো ?

রাধাশ্যামবাবু কহিলেন, আমি একটু বাইরে বেরুব। আপনি সঙ্গে যদি থাকেন বড় ভাল হয়। আপনার বাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

সীতানাথ সানন্দে কহিল, বেশ তো, তাতে কি হয়েছে,—আমার এখন যথেষ্ট অবসরই আছে।

রাধাশ্যামবাবু তখনই গাড়ি বাহির করিবার আদেশ দিলেন।

॥ বাইশ ॥

সকল দিক দিয়াই রাধানাথবাবুর অদৃষ্ট ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শেষ ভাগ্যপরীক্ষার জন্য যে টাকাটা সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং লোহালক্কড় আনাইবার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা সাগরপথে বিলাতে পাড়ি না দিয়া কলিকাতার ময়দানেই নিঃশেষ হইয়া গেল। ইহার মূলেও পাতিরামের কৌশলচালিত চক্রান্ত ওতঃপ্রোতভাবে জড়াইয়া ছিল।

রাধানাথের সমস্ত খবর পাতিরাম অতি সন্তর্পণে সংগ্রহ করিয়া তাহার আসল পতনের সাংঘাতিক দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছিল। যে দিন সে শুনিল, রাধানাথ তাহার পৈতৃক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে এবং এই সাংঘাতিক মনস্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন তাহার মুখের ভীষণ হাসি দেখিয়া তাহার কর্মসচিব সীতানাথ পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়াছিল।

অফিসের পাট তুলিয়া দিয়া রাধানাথ পৈতৃক বাড়িতেই ফিরিয়া গেল। কলিকাতার বাড়ি বিক্রয় করিয়া পরিবারবর্গকে টালার বাড়িতে পাঠাইয়া দিয়া রাধানাথ একাই কলিকাতায় স্বতন্ত্র বাসা করিয়া থাকিত। কিন্তু এখন কলিকাতার বাসা চালাইবার সামর্থ্যের অভাব বশতঃ তাহাকে টালায় ফিরিতে হইল। বিশেষতঃ কলিকাতায় থাকিয়া মুখ দেখাইবার উপায়ও তাহার ছিল না। চারিদিকে দেনা, অসংখ্য পাওনাদার, কারবার বন্ধ, আয়ের আর কোন পথই নাই, অথচ ব্যয়ের সকল পথই মুক্ত।

একটা বিষয়ে রাধানাথবাবু ছিল অতিশয় ভাগ্যবান। তাহার সহধর্মিণী শ্রীমতী নিভা দেবীর মত চৌকশ মহিলা খুব অল্পই দেখা যাইত। অপূর্ব রূপ, প্রচুর স্বাস্থ্য, অসামান্য প্রতিভা, প্রখর বুদ্ধি এবং আশ্চর্য রকমের অনুমান-শক্তি এই মেয়েটিকে সদাসর্বদাই এমনই সতর্ক ও সপ্রতিভ করিয়া রাখিত যে, সংসার ও তাহার পারিপার্শ্বিক খুঁটিনাটি কোনও বিষয় তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে

পারিত না। কিন্তু রাধানাথ কদাচ এমন গুণবতী সাধ্বীপত্নীর সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। নিভা বুঝিত, স্বামী বংশগৌরবের অভিমানে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতে চাহে না। তাহার আভিজাত্যের অহংকার এত বেশী যে, নিভা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা বলিয়া সে তাহাকে অবহেলার চক্ষে দেখিত। কৃপার পাত্রী বলিয়া মনে করিত। স্বামীর এই উপেক্ষা নিভার অন্তরে যেন তীরের মত বিঁধিত, বেদনাহত দেহমন লইয়া সে তাহার ক্ষুদ্র সংসারটির মধ্যেই নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছিল। একান্ত প্রয়োজন না থাকিলে কিংবা স্বামীর নিকট হইতে আহ্বান না আসিলে সে সহজে সাড়া দিতে চাহিত না। অভিমানক্ষুব্ধ মনের এই বিদ্রোহস্পৃহাকে সে কোন দিন মূর্ত হইতে দেয় নাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকিলেও, কোনরূপ বিরোধ আছে, বাহিরের কেহ, এমন কি বাড়ির চাকর-দাসীরাও তাহা জানিবার সুযোগ পাইত না।

তথাপি স্বামী-স্ত্রীর এই মনোমালিন্যের সংবাদটুকু সুচারুরূপেই পাতিরামের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর উঠিতেছে, এ সংবাদটুকু সংগ্রহ করিয়া পাতিরাম যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। রাধানাথের খবর তাহাকে সরবরাহ করিত তাহারই এক অনুচর। রাধানাথবাবুর নিকট চাকুরি করিয়া সে যে মাহিনা পাইত, রাধানাথবাবু-সংক্রান্ত দিবারাত্রির যাবতীয় খবর পাতিরামের নিকট দাখিল করিত বলিয়া পাতিরামও তাহাকে সেই বেতন দিত। টালার বাড়িতেও ঠিক এইভাবে একটা বালক-চাকরকে হাত করিয়া পাতিরাম তাহার দ্বারা রাধানাথবাবুর স্ত্রীর সংক্রান্ত সকল খবর সংগ্রহ করিত।

নিভাকে রাধানাথ বৈষয়িক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত রাখিয়াছিল। কিন্তু নিভা প্রত্যক্ষভাবে এ সম্বন্ধে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেও, গোপনে গোপনে স্বামীর সকল কার্যের সংবাদ লইত, স্বামীর পিছনে সময় সময় তাহারও গুপ্তচর ঘুরিত এবং এমন অনেক সংবাদ তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিত যে, শুনিয়া সে অবাক হইয়া থাকিত।

এই অনুসন্ধিৎসা সূত্রেই পাতিরাম ও সীতানাথ তাহার সন্দেহভাজন হইয়া পড়ে। ক্রমে নিজের দাস দাসীদের উপরও তাহার সংশয় নিবিড় হইতে থাকে। ইহার ফলে পাতিরামের নিয়োজিত বালক-চর নিভার কৌশলে ধরা পড়িয়া যায়।

ঝি-চাকরকে চালনা করিতে বা তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া কাজ গুছাইতে নিভার একটা অসামান্য ক্ষমতা দেখা যাইত। পাতিরামের নিয়োজিত বালক-ভৃত্য

সকল কথাই নিভার নিকট ব্যক্ত করিয়া দিল। নিভা তাহাকে ধমকাইল না, পীড়ন করিল না, কিন্তু এমন কৌশলে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে যেন জাদুমন্ত্রে বশীভূত হইয়া নিভার কথামত কার্য আরম্ভ করিয়া দিল; নিভা তাহার দ্বারা পাত্তিরাম সম্বন্ধে এমন অনেক খবর সংগ্রহ করিল, যেগুলি তাহার স্বামীর পক্ষে সাংঘাতিক, রাধানাথ না বুঝিলেও নিভা বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের এত বড় সাংঘাতিক শত্রু আর দুটি নাই। কিন্তু এই শত্রু তখন সকল দিক দিয়া এত প্রবল ও দুর্বার যে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত কোন শক্তিই তাহাদের নাই। ঠিক এই সময় সর্বস্ব খোয়াইয়া এবং বিরাট বাণিজ্যশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া রাধানাথ ভগ্ন দেহমন লইয়া টালার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করিল।

স্বামীর অনিন্দ্যসুন্দর দেহের শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া নিভার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিল। মনের অভিমান এবার দুই হাতে সরাইয়া দিয়া নিভা স্বামীর কাছে ছুটিয়া গেল। আয়ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া শুধু ছোট একটি প্রশ্ন করিল, আর কিছু আছে ?

রাধানাথ সে দৃষ্টির সংঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে কহিল, না; সব শেষ হয়েছে।

বিদ্যুতের মত ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটু ঝিলিক তুলিয়া নিভা কহিল, তা হলে এবার আমার পালা এসেছে বল।

রাধানাথ অভিভূতের মত নিভার দিকে চাহিয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কথাটার অর্থ বোধ হয় সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া নিভা কহিল, চুপ করে রইলে যে, কথাটা কি বুঝতে পার নি ?

রাধানাথ উত্তর দিল, না।

নিভা কহিল, কথাটার মানে হচ্ছে, তোমার দলের বড় বড় রথীরা সবাই তো দেখছি সরে পড়েছেন তোমাকে ফেলে। এখন আমাকেই না হয় সেনাপতির পদে বরণ করলে। পালার কথাটা এই জন্যই বলেছি।

রাধানাথের মুখে হাসির একটু ক্ষীণ আভা ফুটিল। কহিল, ও এই কথা! কিন্তু কি নিয়ে এখন লড়বে তুমি বল ? আমার যে কিছু নেই আর।

নিভা কহিল, আমি তো আছি! তবে আমার কথা হচ্ছে; বড় বংশের বড় মেজাজের বড়মানুষীর যত কিছু বিষ ছিল, সমস্তই শেষ করে ফেলেছ। এখন

তুমি বিষহীন ঢোঁড়া। তোমার এই অবস্থাতেই আমি তোমার ভার নিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দেহটাকে শুধু রক্ষা কর। কিন্তু তোমাকে শপথ করতে হবে, আমার অমতে কিছু করতে পারবে না। যদি রাজী থাকো তবে আমি ভার নেব।

রাধানাথ বিস্ফারিত নয়নে নিভার পানে তাকাইয়া কহিল, আমি তোমার মত—সব কিছু বুঝতে পারছি না। আর বোঝবার শক্তিও এখন নেই। যাই হোক, আমি বরাবরই তোমাকে অবহেলা করে এসেছি। আজ সর্বহারা হয়ে তোমারই ওপর আমার ভারটুকু পর্যন্ত সঁপে দিচ্ছি। কিন্তু আমার কিছু নেই নিভা, আমি রিক্ত আজ।

নিভা কহিল, আমি তো শুধু তোমার ভারটুকু নিই নি, ভাবনাটুকুও যখন নিচ্ছি; কেন তুমি রিক্ত হতে যাবে? বিয়ের রাতে, তারপর কুশণ্ডিকায় কি মন্ত্র পড়ে আমাকে পত্নীর মর্যাদা দিয়েছিলে মশাই? স্বামী কখনও রিক্ত হতে পারে? আমরা পূর্ণ। তুমি কেন ভাবছ?

দশ বৎসরের উপর হইতে চলিল ইহাদের বিবাহ হইয়াছে, তিন-চারিটি সন্তানও জন্মিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এমন প্রাণ খুলিয়া আলাপ কোন দিন হয় নাই। রাধানাথের সর্বাঙ্গে আজ যেন আনন্দের শিহরণ উঠিল। এমন পার্শ্বচারিণী সহধর্মিণীর সাহায্য সে কোন দিন প্রার্থনা করে নাই।

অতঃপর নিভা সুকৌশলে স্বামীর বিগত কয়েক বৎসর ব্যাপী কর্মজীবনের সকল কথাই একটি একটি করিয়া জানিয়া লইল।

যেদিন মেনকার মামলার নিষ্পত্তি হইল, তাহার পরদিন প্রত্যূষে রাধাশ্যাম হাতীর স্বাক্ষরযুক্ত এই মর্মে একখানি পত্র সৃষ্টিধর দাসের হস্তগত হইল;—

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আপনার ভাগিনেয় শ্রীমান কৃত্তিবাস কোলের সহিত আমার কন্যার বিবাহের যে কথাবার্তা স্থির হইয়াছিল, এই পত্রের দ্বারা তাহা রহিত করা যাইতেছে। কিরূপ অপ্রীতিকর কারণ-পরম্পরা আমাদিগকে এ কার্যে বাধ্য করিয়াছে, তাহা আপনি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। নিবেদন ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীরাধাশ্যাম হাতী

সৃষ্টিধরও এইরূপ কিছু প্রত্যাশা করিতেছিল। চিঠিখানা পড়িয়াই সে কক্ষমধ্যে

অস্থিরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। কৃত্তির উপর তাহার ক্রোধ আজ বুঝি ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। কৃত্তির দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় সেও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল এবং মামা সৃষ্টিধরের দিকে চাহিয়া সহজ কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, হাটখোলা থেকে লোক এসেছিল, না ?

বোমা যেন এবার ফাটিয়া গেল। গলার স্বর সপ্তমে তুলিয়া সৃষ্টিধর কহিল, হ্যাঁ এসেছিল, দড়ি আর কলসী দিয়ে গেছে, তাই নিয়ে নিজের পথ দেখ। বেরোও এখান থেকে বলছি।

কৃত্তিবাস এ অপমান পরিপাক করিতে পারিল না, সেও জোর গলায় কহিল, মুখ সামলে কথা কও বলছি—বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরেছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তোমাকে এবার পিঁজরাপোলে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হব।

তবে রে হারামজাদা—বলিয়া বৃদ্ধ কৃত্তির দিকে ছুটিয়া গেল।

কৃত্তিও ঘুষি পাকাইয়া উত্তর দিল, এগিয়ে আয় বুড়ো জাম্বুবান !

লোকজন চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উভয়কেই নিরস্ত করিল। একটু পরে কৃত্তিবাস বৃদ্ধকে শাসাইতে শাসাইতে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। সৃষ্টিধর দারোয়ানকে হুকুম দিল, খবরদার ও হারামজাদা যেন দেউড়ির ভেতরে না ঢোকে।

ইহার দুইদিন পরেই হাটখোলার রাধাশ্যাম হাতীর জুড়ি গাড়ি সৃষ্টিধর দাসের বাড়ির ফটকে আসিয়া থামিল। হাতী মহাশয়কে হঠাৎ এভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দাস মহাশয় চমৎকৃত হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি উঠিয়া এই অতি সম্মান-ভাজন ধনী ব্যক্তিটিকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আগমনের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেও তাহার মনে কুণ্ঠা জাগিতেছিল।

রাধাশ্যামবাবু নিজেই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, শ্রীমান শ্রীবাস বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কন্যার বিয়ের সম্বন্ধ চলছিল। পাত্রের অবস্থা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সব জেনে আমাদের খুবই পছন্দ হয়। কথা যখন অনেকটা এগিয়ে পড়ে, তখন ছেলেটি জানায় যে সে আপনারই ভাগিনেয়। কিন্তু আমরা জানতাম কৃত্তিবাসই আপনার একমাত্র ভাগিনেয়—যার সঙ্গে আমার কন্যার সম্বন্ধ আগে হয়েও ঘটনাচক্রে ভেঙে যায়। শ্রীবাস কিন্তু বলছে, সেও আপনার ভাগিনেয় এবং আপনিই তার অভি-ভাবক। আপনার সম্মতি ভিন্ন এ বিবাহ হতে পারে না। এই জন্যই আপনার কাছে আসা।

অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাসটুকু সযত্নে চাপিয়া সৃষ্টিধর কহিল, শ্রীবাস ঠিকই বলেছে, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয়। সে হচ্ছে আমাদের জাতির গৌরব, যাকে বলে খাঁটী সোনা। শ্রীবাসের বাবার সঙ্গে আমার বনিবনাও ছিল না। সে আমার কাছে কিছু পায় নি, শ্রীবাসও কখনও আমার কাছে কিছু চায় নি। নিজের চেষ্টাতেই সে বড় হয়েছে। কৃত্তিবাসের কীর্তি প্রকাশ হলে আমি তাকে ত্যাগ করেছি। আমার সমস্ত সম্পত্তি এখন শ্রীবাসের তত্ত্বাবধানেই আছে।

রাধাশ্যাম কহিলেন, কিন্তু শ্রীবাস এসব কথা আমাকে কিছু বলে নি তো।

সৃষ্টিধর কহিল, যেটুকু আপনাকে বলবার, সে শুধু তাই বলেছে। এই তার স্বভাব। এমন ছেলে আমাদের সমাজে মেলে না।

রাধাশ্যাম করজোড়ে কহিলেন, আমার আগেকার ধৃষ্টতা মার্জনা করে এখন শ্রীবাসকে ভিক্ষা দিন। অর্থাৎ আমার কন্যাটিকে দয়া করে নিন—

সৃষ্টিধর কহিলেন, আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? শ্রীবাস ভাগ্যবান, তার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে! ভগবান যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

অতঃপর এই অপ্রত্যাশিত যোগাযোগের কথাবার্তা পাকা হইয়া গেল। কিন্তু এইসব যোগাযোগের উপর পাতিরামের কিরূপ প্রভাব ছিল ও তাহার স্থির মস্তিষ্ক-প্রসূত বুদ্ধি কিভাবে এই অঘটন ঘটাইয়াছিল—বৃদ্ধ সৃষ্টিধর বা তাহার ভাগিনেয় কৃত্তিবাস তাহার সন্ধান পাইয়াছিল কি?

এদিকে শহর ছাড়িয়া শহরোপকণ্ঠে টালার বাড়িতে আশ্রয় লইয়া এবং সহধর্মিণীর সাহায্য পাইয়াও রাধানাথ তাহার পাওনাদারদের স্নেহদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া যে কতিপয় হৃদয়বান মহাজন রাধানাথবাবুকে অব্যাহতি দিবার সংকল্প করিয়াছিল, পাতিরাম আধাকড়িতে তাহাদের নিকট হইতে রাধানাথের দেনাপত্র কিনিয়া লইল। কথাটা রাধানাথ ও তাহার স্ত্রী নিভা উভয়েই শুনিল।

রাধানাথ কহিল, এই পাজীটাই হচ্ছে আমার অদৃষ্ট-পথের শনি—ওর জন্যই আমি আজ পথে বসেছি।

নিভা কহিল, পথে বসেছ তুমি নিজের দোষে। ও লোকটি নিজের বুদ্ধি চালিয়ে কাজ গুছিয়েছে, কিন্তু তুমি চলেছ পরের বুদ্ধিতে। তোমার বাবার সঙ্গে ওর ব্যবহার সব জেনেও তুমি শক্ত হও নি, এইটুকুই আশ্চর্য। আমার মনে হয়—তুমি ওকে চিনতে পার নি, কিন্তু তোমার বাবা ওকে চিনেছিলেন।

রাধানাথ কহিল, ঐ লোকটাকে আমি আবার চিনি নি!

নিভা কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল, না। যদি চিনতে, তা হলে তোমার দোকানের একটা পেরেক পর্যন্ত ওকে বেচতে না। তুমি তো জোর করেই তোমার ঘরের লক্ষ্মীকে ওর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছ!

রাধানাথ কহিল, আমি সেটা বুঝতে পারি নি।

নিভা কহিল, তোমার পার্শ্বচররা তোমাকে বুঝিয়েছিল, পচো মালগুলো বেচে বোকাকে খুব ঠকাচ্ছ। ঠকাবার এই প্রবৃত্তিটুকু তোমার মনে জেগেছিল বলেই ঠকেছ তুমি, সে ঠকে নি।

রাধানাথ কহিল, কিন্তু আশ্চর্য এই, আমার সর্বস্ব নিয়েও নিশ্চিন্ত নয়। আমি ডুবতে বসেছি দেখেও সে কিনা তার ওপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরছে। আমার দেনাগুলো কিনে নিয়ে আমাকে জব্দ করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

নিভা কহিল, কেন এসব করছে তা জান? ধরতে পেরেছ কিছু?

রাধানাথ কহিল, আর কি—টালার এই বাড়িখানায় আমার যে অংশটুকু আছে, তার ওপরই ওর টাক; এইটে নেবার জন্যই—

কথায় বাধা দিয়া নিভা কহিল, না, তুমি ভুল ভেবেছ, এ বাড়ির ওপর ওর টাক নয়।

—তবে?

—এই বাড়িতে একটি দিন মাত্র ও ঢুকেছিল, কর্তা তখন বেঁচেছিলেন, গাড়ি চড়ে আমীরের মত সেজে কর্তার ঘরে এসেছিল—ওর বাপের জন্যে, ওকে মানুষ করবার জন্যে কর্তা যে খরচপত্র করেছিলেন—ও সেসব শোধ করতে চেক বই পর্যন্ত খুলেছিল, কিন্তু কর্তা তখন হেসে বলেছিলেন, আমার ঋণের টাকা তোলাই থাক তোমার কাছে পাতিরাম। এর পর যদি কখনও তোমার কাছে আমার বা আমার ছেলেদের হাত পাতবার প্রয়োজন আসে, তখন এই ঋণ শোধ দিও—তার আগে নয়।—কর্তার সে কথা পাতিরাম ভোলে নি! তোমার ঐ দুর্দশা নিজের চোখে দেখেও তার চোখ দুটো সার্থক হয় নি—কেন না, কর্তা বেঁচে নেই, তিনি তাঁর ছেলের দুর্দশা দু চোখে দেখতে পেলেন না। তার এখন দুরাশা—

নিভার কণ্ঠস্বর এখানে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, বাকী কথাটা আর বাহির হইল না।

রাধানাথ মোহাবিষ্টের ন্যায় এই সময় কহিয়া উঠিল, দুরাশা—

গলাটা পরিষ্কার করিয়া নিভা কহিল, হ্যাঁ, সে চায় তার বাড়িতে বসে এর

শোধ তুলতে।

রাধানাথ সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল, তার মানে ?

নিভা উত্তর দিল, তার কাছে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে আমি চাইব ভিক্ষা তোমার জন্য।

তীরের বেগে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রাধানাথবাবু কহিল, কি বললে ? ও ! একথা কেমন করে তুমি—ও !

মাথাটা সজোরে চাপিয়া রাধানাথ পুনরায় বসিয়া পড়িল।

নিভা কহিল, কথাটা আমি বানিয়ে বলি নি জেনো। কিন্তু এই তার মতলব, এই জন্যেই সে তোমাকে বেড়াজালে ঘেরবার মতলব করেছে। এরপর আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবে। শেষে হবে বলিদানের ব্যবস্থা। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে—সেটাও সে অনুমান করে নিয়েছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে রাধানাথ কহিল, কালই আমি ইনসলভেন্সি নেব।

নিভা দৃঢ়স্বরে কহিল, না—তা হবে না। সেটা পৌরুষের কথা নয়। তোমাকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে, তুমি যে টালাব অমুক মুখুজ্জের ছেলে একথা মনে রাখতে হবে।

এই সময় বাড়ির ঝি আসিয়া খবর দিল, কিত্তীবাসবাবু এসেছেন দেখা করতে।

স্বামীর মুখে অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত এই অন্তরঙ্গ সুহৃদটির কথাও নিভা শুনিয়াছিল। নামটা শুনিয়াই খপ্ করিয়া কহিল, ভালই হয়েছে। ওর তো অবস্থা এখন ভাল, পাতিরাম পাকড়ের সঙ্গে টক্কর দিতে ওকে নিয়ে মাছের যে কারবার করেছিলে, সে বাবদে ওর কাছে পাওনা টাকাগুলো এই সময় চেয়ে ফেল। যদি নিজে না পার, আমার ওপর ভার দাও, আমি আদায়ের ব্যবস্থা করছি।

রাধানাথ কহিল, কি সর্বনাশ ! আমার দুর্দশা দেখে শেষে কি তুমি লোকের সামনে বেরিয়ে তাগাদা করবে ?

নিভা কহিল, লোকের কাছে গিয়ে গলায় কাপড় দিয়ে ভিক্ষা নেওয়ার চেয়ে লোকের সামনে বেরিয়ে পাওনা টাকা চাওয়া কি দোষের ? তোমার সমস্ত ভার আমার ওপর দিয়েছ, এ কথা যেন ভুলে যেও না।

বাহিরের সেই বিশাল বৈঠকখানা এখনও অতীতের আদর্শটুকু লইয়া পড়িয়া আছে। ঘরজোড়া তক্তপোশের উপর ধূলিমলিন জীর্ণ সতরঞ্চিখানি এখনও বিস্তৃত ; কিন্তু উপরের দুগ্ধফেননিভ জাজিম ও তাকিয়াগুলির চিহ্নও নাই।

কৃত্তিবাস এই ঘরে বসিয়া রাধানাথের প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ তাহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, চক্ষু দুইটি নিষ্প্রভ, মুখখানা বিবর্ণ। রাধানাথ ঘরে ঢুকিয়া কৃত্তিবাসের এই নিষ্প্রভ চেহারা ও কদর্য বেশভূষা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

কৃত্তিবাসও রাধানাথকে দেখিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের সুরে কহিয়া উঠিল, আর দেখছ কি রাধু, যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়ল। তুমি এসেছ অজ্ঞাতবাসে, আর আমি ঘুরছি পথে পথে।

রাধানাথ কহিল, ব্যাপার কি ?

কৃত্তিবাস কহিল,—সে অনেক কথা। তবে মোটামুটি খবরটা এই—মামা দিয়েছে গলা-ধাক্কা, মাসতুতো ভাই শ্রীবাস বসেছে আমার জায়গায়। সেই এখন মামার এস্টেটের অছি, আর আমি হয়েছি এঁটো পাতার সামিল। হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছি, শ্যাল-কুকুরে চাটছে।

বিস্ময়ের সুরে রাধানাথ কহিল, সে কি হে, চাকা একেবারে ঘুরে গেল ? তুমিই তো মামার বিষয়ের অছি ছিলে, শ্রীবাস এসেও তোমার ভাগ যাবে কোথায় ?

কৃত্তিবাস কহিল, গেছে গোল্লায়। কথায় আছে না—

যদি হয় সোনার ভাগাবি
তবু ধরে লোহার কাটাবি !

আমার দশাও তাই। শ্রীবাসকে ধরেছিলুম, সে বললে, পাতিরাম পাকড়েকে ধরো, তার সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েই তুমি সর্বস্ব হারিয়েছ। আমার ওপর তার হুকুম—ত্রিসীমায় এলেই চাবুক-পেটা করে তাড়াতে হবে। নইলে সে চাবুক আমারই পিঠে পড়বে।

শিহরিয়া উঠিয়া রাধানাথ কহিল, বল কি !

কৃত্তিবাস কহিল, মেনকার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ, মামলা, মামার সঙ্গে মতান্তর, এ সমস্তর গোড়া হচ্ছে ঐ পাকড়ে। এমন কি বিয়েটা পর্যন্ত বিগড়ে দিয়েছে। শ্রীবাস শুধু মামার সম্পত্তিটা ছিনিয়ে নেয় নি—আমার হবু কনেটাকে পর্যন্ত হাতিয়েছে।

—তুমি কি এতদিন নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে ?

—আমি ভাবতে পারি নি রাধু, মানুষ এতটা সাংঘাতিক হতে পারে। একটা লোককে জব্দ করবার জন্য এমন করে বেড়াজাল দিয়ে জড়িয়ে ধরে! কিন্তু আমিও

কৃত্তিবাস কোলে, চুপ করে সইব না, এর শোধ নেব—ঠিক পাল্টা জবাব দেব।

—কিন্তু তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি সর্বস্বান্ত হয়েছ, ঐ দেহখানা ছাড়া আর কিছু নেই। কি করবে?

—সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি। এখন তুমি মনে করলে আমাকে রক্ষা করতে পার; আমাকে রক্ষা করা মানে তোমারও পেছনে একটা শক্তিকে খাড়া করা।

জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া রাধানাথ কহিল, কিন্তু আমার অবস্থা যে তোমার চেয়ে খুব ভাল, তা ভেবো না। তবে তুমি হয়তো একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছ, আমার মাথা রাখবার এই পুরনো ভিটেটা আছে। কিন্তু কতদিন থাকবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। চারিদিকে দেনা, কারবার বন্ধ, হাত খালি। কাজেই আমি তোমাকে কি করে রক্ষা করতে পারি?

কৃত্তিবাস কহিল, তোমার অবস্থাও আমি সব জানি। আমি তোমার কাছে টাকা চাইতে আসি নি। কিন্তু এমন একটা পোড়ো টাকার সন্ধান এনেছি—যা থেকে এ দুঃসময়ে তোমারও কিছু উপকার হয়, আর আমিও খাড়া হবার একটি উপায় পাই।

কথাটি রাধানাথকে তৎক্ষণাৎ চমকিত করিয়া দিল। পোড়ো টাকার কথা তাহার কানে বাজিতেই সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের দিকে চাহিল।

কৃত্তিবাস কহিল, আমার এক মুরুব্বী আছে, তুমি তাকে জানো। তার নাম অনুকূল তলাপাত্র।

নামটা শুনিয়াই রাধানাথের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কৃত্তিবাস বলিতে লাগিল, তার কাছে গিয়েছিলুম কিছু টাকার আশায়। লোকটার কথা তোমার বোধহয় মনে আছে?

রাধানাথের মুখখানা সহসা শক্ত হইয়া উঠিল, রুক্ষস্বরে সে কহিল, এক সময় খুবই মনে ছিল, কিন্তু ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলুম। তুমি এই লোকটাকে খাড়া করে আমার আঠারো হাজার টাকা বরবাদ করেছিলে।

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কৃত্তিবাস কহিল, বরবাদ করব কেন? তোমাকে একটা প্রপার্টি কিনে দিয়েছিলুম। তলাপাত্র তোমাকে একটা গুদোম বোঝাই মাইকা আর তার এলাকার সমস্ত মাইন আঠারো হাজার টাকায় বেচেছিল। মজুত মাল আর ফালোয়া মাইনগুলো তুমি তো জলের দরে কিনেছিলে হে, তার পর দশ জন লোকের কথা শুনে তাতে আর হাতই দিলে না, ফেলে রাখলে;

এর জন্য তলাপাত্র দায়ী নয়, আমিও দোষী নই।

রাধানাথ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, দোষী নও তুমি? তলাপাত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তুমি আমাকে রীতিমত ঠকিয়েছিলে! ফেলে রেখেছিলুম কি সাধ করে? স্যাম্পেল বলে যে মাইকা দেখালে-কাচের মত ধপধপ করছে সাদা, কিন্তু গুদোম বোঝাই মালগুলোর অবস্থা দেখেই চক্ষুস্থির! সমস্তই ডিস্‌কলারড্‌। লালচে রং। বাজারে অচল—কোন দামই উঠল না, কাজেই গুদাম বোঝাই হয়ে পড়ে আছে। তুমি আজ আবার ধরেছ তাকে মুরুব্বী। এতদিন কোন্ চুলোয় ছিলেন তিনি, এখন কি বলতে চান?

কৃত্তিবাস কহিল, তিনি তাঁর বেচা জিনিসটা ফের কিনে নিতে চান।

বিস্ময়ে রাধানাথের মুখে বাক্য ফুটিল না। নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কৃত্তিবাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কৃত্তিবাস কহিল, তুমি হয়তো ভাবছ, আমি মিছে কথা বলে তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি বা ঠাট্টা করছি, কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি জেনে এসেছেন, তোমার গুদোমে মজুত মাল ঠিক আছে। তিনি এখন খদ্দের পেয়েছেন ঐ মাল কেনবার। যদি তুমি রাজী থাক, আজই রেজেষ্ট্রী হতে পারে। তিনি যে দামে বেচে-ছিলেন, সেই দামেই কিনে নিতে রাজী আছেন। ইচ্ছা করলেই তুমি হাতে হাতে আঠারো হাজার টাকা পেতে পার।

আনন্দে উত্তেজনায় রাধানাথের দুই চক্ষু যেন জল জল করিয়া উঠিল। আঠারো হাজার টাকা! যাহার হাতে আজ আঠারো টাকাও সম্বল নাই,—সুসময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার সময় যে টাকা খেয়ালের বশে এক কথায় ঢালিয়া দিয়াছিল, টাকাগুলা জলে পড়িয়াছে জানিয়াও গ্রাহ্য করে নাই এবং বর্তমানে যাহা আবর্জনার স্তূপের মতই উপেক্ষিত ভাবে সুদূর হাজারিবাগ অঞ্চলে পড়িয়া একটি বাজে খরচা সূত্রে দেনার সৃষ্টি করিতেছিল, আজই তাহা হইতে আঠারো হাজার টাকা উসুল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাধানাথ কহিল, তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ নেই কৃত্তি, যদি তোমার কথা সত্য হয়, তা হলে বুঝব, তলাপাত্রের পক্ষ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করতে এসেছ। এই আঠারো হাজার—আমার কাছে এখন আঠারো লাখ। তা হলে তলাপাত্রই সব কিনছে?

কৃত্তিবাস কহিল, যেই কিনুক না কেন, তোমার তো টাকা নিয়ে কথা। তলাপাত্র নিজের নামে না কিনে আর কারুর নামেও কিনতে পারে। তা হলে বায়না-পত্র

হবে, না রেজেষ্ট্রী অফিসেই একেবারে—

রাধানাথ ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, কি দরকার বায়না-পত্রের ; সেইখানেই পেমেন্ট হবে ; আজই যখন রেজেস্ট্রী হবে বলছ—

বাড়ির ঝি সত্যবতী ঠিক এই সময় দরজার পাশ হইতে কহিল, বাবু, মা বলে পাঠালেন—আজ দিন ভাল নয়। কথা কিছু পাকা করবেন না ; ওঁকে আজ যেতে বলুন।

কথাটা অপ্রত্যাশিত ভাবে উভয়কেই স্তব্ধ করিয়া দিল। মুখখানা রীতিমত কুঞ্চিত করিয়া কৃত্তিবাস কহিল, ব্যাপার কি হে রাধু! মা আবার কোথা থেকে এলেন, এতকাল তো ছিলেন না!

রাধানাথ কহিল, ছিলেন বরাবরই, তবে আমল পান নি। কিন্তু এখন হালে না পেয়ে তাঁকেই দখল দিয়েছি—বুঝলে?

কৃত্তিবাস ভ্রূভঙ্গী করিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিল, একেই বলে শিক্ষা হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ। তবে কি জানো, শুভকাজে দিনক্ষণ নেই, সেরে ফেলাই ভাল।

রাধানাথ কহিল, বেশ তো না হয় কালই হবে। এক দিনে আর কি এমন ক্ষতি হবে বল! তা হলে তুমি কাল এই সময়েই এস।

ইহার পর আর কথা চলে না। অত্যন্ত অপ্রসন্ন ভাবেই অগত্যা কৃত্তিবাসকে উঠিতে হইল।

রাধানাথও বাড়ির ভিতরে যাইবার জন্য উঠিয়াছে, এমন সময় নিভাকে দ্বার-দেশে দেখিয়া, সে পুনরায় তক্তপোশের উপর বসিয়া পড়িল। দুই চক্ষুর সপ্রশ্নদৃষ্টি তাহার দিকে ফেলিয়া কহিল, ব্যাপার কি? এখানে পর্যন্ত ছুটে এসেছ!

নিভা কহিল, তোমার পিছু পিছুই এসেছিলুম! নইলে অমন করে বাধা দিতে পারতুম? কিন্তু তুমি তো বেশ লোক, সব ভার দিয়ে এসে—তার পর নিজেই ভারী হয়ে বসেছ। আমি বাধা না দিলে আজই তো সব শেষ করে ফেলতে!

রাধানাথ কহিল, তাতে মন্দ কিছু হত না। আবর্জনার মত যে জিনিস পড়ে আছে, তা থেকে যে আজ এতটুকু টাকা উঁকি দেবে—তা কল্পনাও করি নি।

মুখখানা কঠিন করিয়া নিভা কহিল, তোমার ব্যবসা করতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এখনও তোমার বুদ্ধি খোলে নি।

রাধানাথ অবাক হইয়া স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিভা কহিল, ওগুলো আবর্জনা কে তোমাকে বললে? ঘর থেকে আঠারো হাজার টাকা বার করে কেনো নি?

রাধানাথ কহিল, লাভের আশায় কিনেছিলুম, কিন্তু ও থেকে একটি পয়সাও উসুল হয় নি, বরং ওর উপরে আরও পাঁচ-ছ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে। সবাই বলছে—টাকা দিয়ে জঞ্জাল কিনেছি।

নিভা কহিল, সবার বুদ্ধি নিয়েই বরাবর কারবার করেছ, নিজের বুদ্ধি তো কোনদিন চালাও নি! দোকানের লোহালক্কড়গুলোও এক দিন জঞ্জাল মনে করে পাতিরামের আড়তে তুলে দিয়েছিলে। কিন্তু এটুকু তোমার বুদ্ধিতে এল না কেন—যে জঞ্জালগুলো এতকাল হাজারিবাগের জঙ্গলে জমা হয়ে ছিল, খনির খাজনা গুনেছ, লোকজনের মাইনে দিয়েছ—সাসছ বরাবর—আজ সেগুলো কিনতে তোমার বাড়ি বয়ে লোক আসে কেন?

রাধানাথের নিষ্প্রভ দুইটি চক্ষু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল।

নিভা আড়চোখে তাহা লক্ষ্য করিয়া দৃপ্তস্বরে কহিল, যে লোক এক দিন তোমার দোকানের জঞ্জালগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপরে মা-লক্ষ্মীর ভাঁড়ার পেতেছিল, হাজারিবাগের এই পোড়া জঞ্জালটা উদ্ধার করতে, সেই লোকই কৃত্তিবাসকে পাঠিয়েছে। একথা তুমি ধারণা করতে পার?

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া রাধানাথ কহিল, বল কি? এর গোড়ায়ও পাতিরাম! কৃত্তিবাস তার কাছ থেকে—না, এ অসম্ভব!

নিভা কহিল, এক ঘণ্টার ভেতরেই আমি তোমাকে সঠিক খবর দেব। আমার লোক ঐ পাজীটার পিছু নিয়েছে, তার ফিরতে দেরি হবে না। তবে একটা কথা বলে রাখছি—এ জঞ্জালগুলো বেচা হবে না। লাখ টাকা পেলেও না।

রাধানাথ নির্বাক বিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এই বিস্ময়টুকু স্ত্রীর সম্বন্ধে তাহার চিত্তে শ্রদ্ধার একটা গভীর রেখা দাগিয়া দিল, যখন সে শুনিল, কৃত্তিবাস টালা হইতে বরাবর নিকিরিপাড়ায় পাতিরাম পাকড়ের বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ির চাকরকে বলিয়া দিল, ঐ লোকটা এ বাড়ির দেউড়ির সামনে এলে যেন গলা ধাক্কা দিয়ে বিদায় করা হয়।

॥ তেইশ ॥

মহাসমারোহে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শ্রীবাসের বাড়িতেই সকল কার্য সমাধা হইল। শ্রীবাসের আশ্রিতরূপেই কৃত্তিবাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ভবিতব্যের এই রহস্যময় খেলা দেখিল।

রাধাশ্যাম হাতী প্রতিশ্রুতি মত শ্রীবাসকে নিকিড়িপাড়ার সম্পত্তি যৌতুক স্বরূপ দানপত্র করিয়া দিলেন। সপ্তাহের মধ্যে শ্রীবাস পাতিরামের নামে নিকিরি-পাড়ার ইজারাদারি লেখাপড়া করিয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিল। কথাটা অপ্রকাশ রহিল না। শ্বশুর ও মাতুলের তরফ হইতে এ সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন উঠিল, শ্রীবাস তখন সুস্পষ্ট ভাবে জানাইল,—আমার দাদা ও মামা দু জনেরই ঋণ-পরিশোধের জন্য এটা আমি করেছি।

কথাটা তখন প্রকাশ করিয়াই তাহাকে বলিতে হইল যে, কি ভাবে পাতিরাম পাকড়ে একদা এই সম্পত্তির জন্য লক্ষাধিক টাকা ন্যস্ত করিয়াও বঞ্চিত হইয়াছিল। শ্রীবাস দৃঢ়তার সহিত জানাইল, পাতিরামবাবুই আমার সৌভাগ্যের সোপান, তিনিই আমাকে হাতে ধরে লক্ষ্মীর দেউলে ঢুকিয়েছেন। তাঁর ক্ষতিপূরণ করে আমি আজ যে আনন্দ পাচ্ছি তার তুলনা নেই।

কথাটা শুনিয়া কৃত্তিবাসের মুখখানা শুধু কালো হইয়া গেল, তাহা ছাড়া আর সকলেই অতিশয় প্রসন্ন হইলেন।

এদিকে নিকিরিপাড়ার বড় রাস্তার উপর পাশাপাশি যে দুইখানি বাড়ি নির্মিত হইতেছিল, একদিন সকলে দেখিল তাহার নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছে, গৃহপ্রবেশের আয়োজন চলিয়াছে।

চক্রবর্তী মহাশয় সেদিন শীতলা মন্দিরের সম্মুখে চাতালটির উপর বসিয়া গুন গুন স্বরে মায়ের নাম গাহিতেছেন। এমন সময় আস্তে আস্তে পাতিরাম তাহার সম্মুখে আসিয়া নত মস্তকে প্রণাম করিল। নগ্নপদ উন্মুক্ত দেহ পাতিরামকে এভাবে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, পাতিরাম যে! অনেকদিন দেখি নি, কেমন আছ বাবা?

সবিনয়ে পাতিরাম কহিল, যেমন আপনার আশীর্বাদ, ভালই আছি।

—কাজ-কারবার চলছে ভাল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভালই চলেছে। একটা কাজের জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি পাতিরামের মুখের উপর রাখিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, বল বাবা—বল।

দুই হাত যুক্ত করিয়া পাতিরাম কহিল, আপনার বোধ হয় মনে আছে, এক দিন এই পাড়াটার ইজারাদারি কিনে এই মন্দিরের সামনে ইট পাড়তে এসে-ছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বাধা পেয়ে মুখখানা কালো করে ফিরে গিয়েছিলাম?

মুখে বিষাদের চিহ্ন ফুটাইয়া চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, খুব মনে আছে বাবা! আর সেটা মনে হলেই বুকখানা আমার সত্যিই জ্বলে ওঠে। এক রাশি টাকা বরবাদ হয়ে গেল।

পাতিরাম কহিল, কিন্তু আপনাদের আশীর্বাদের জোরে সে বরবাদ হয় নি—নিকিরিপাড়ার ইজারাদারি আমি ফিরে পেয়েছি।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গদ্গদ্ স্বরে চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, বল কি—এ যে বড় সুসংবাদ বাবা! জয় মা তারা ব্রহ্মময়ী! আমার বুকখানা আজ আহ্লাদে জ্বলে উঠছে। তাই বুঝি দখল নেবার জন্ত—

বাধা দিয়া পাতিরাম কহিল, সে বয়স আর সে দুষ্ট বুদ্ধির এলাকা যে আজ পেরিয়ে এসেছি চক্রবর্তী মশাই! দখল পেয়েছি কাগজেপত্রে, তার বেশী আর এগুচ্ছি না। আচ্ছা চক্রবর্তী মশাই, রাস্তার ধারে দুখানা বাড়ি উঠেছে বোধ হয় দেখেছেন—

চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, সদর রাস্তার ওপর হালফ্যাশানের দুখানা বাড়ি—কে না দেখেছে বল? শুনেছি, তুমিই তো করাচ্ছিলে বাবা!

হাত দুখানি যুক্ত করিয়া পাতিরাম এবার বিনীতভাবে কহিল, একটা আমার প্রার্থনা আছে, সেটি জানাতেই এসেছি। গৃহপ্রবেশের একটি দিন দেখে দিতে হবে। আর এর জন্ত নেম-কর্ম যা কিছু করবার সে সমস্তই আপনাকে করে-কর্মে নিতে হবে।

উল্লাসের স্বরে চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, এ তো আমার কর্তব্য কর্ম বাবা! তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ঘর বাড়ি কর, ভোগ কর, আমি উপলক্ষ হয়ে কাজ কর্ম করি—এর চেয়ে বড় আনন্দ আমার তো আর কিছুতেই নেই। আমি দিন দেখে দিচ্ছি। দিন দেখিবার পর পাতিরাম আর এক প্রার্থনা জানাইল, গৃহ-প্রবেশের দিন পাতিরাম যেমন পুরাতন বাড়ি হইতে শোভাযাত্রা করিয়া যথারীতি নূতন বাড়িতে যাইবে, চক্রবর্তী মহাশয়কেও তেমনই সপরিবার সেই সঙ্গে পার্শ্বের বাড়িখানিতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশ করিতে হইবে! ঐ বাড়িখানিতে চক্রবর্তী মহাশয়ের নামেই গৃহপ্রবেশের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইবে।—পাতিরামের এই প্রার্থনাও চক্রবর্তী মহাশয় স্বীকার করিয়া লইলেন।

খুব ঘটা করিয়াই গৃহপ্রবেশের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। শাস্ত্রানুমোদিত বিধানে শোভাযাত্রা করিয়া পাতিরামের একান্ত আগ্রহে প্রথমেই সপরিবারে চক্রবর্তী

মহাশয় নূতন বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। তাহার পরেই পাতিরামের শোভাযাত্রা। পাতিরামের মাতার আমন্ত্রণে মনসারামের কন্যা পার্বতী এবং পাড়ার কতিপয় বধূ ও বালক-বালিকা এপক্ষের শোভাযাত্রার অঙ্গ পুষ্ট করিল। গৃহপ্রবেশের পর ভূরি ভোজের বিপুল আয়োজন সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

অপরাহ্নের দিকে পাতিরামকে আশীর্বাদ করিয়া চক্রবর্তী মহাশয় কহিলেন, বাবা, আমরা এবার মন্দিরে যাই—

পাতিরাম বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, সে কি! নিজের মন্দিরেই তো আপনি এসেছেন, আবার কোন্ মন্দিরে যাবেন? গৃহপ্রবেশ করে আবার বেরুতে আছে নাকি? শাস্ত্রের এ খবরটুকু বুঝি আমি রাখি না মনে করেন? যান্-যান্, মা-ঠাকরুনকে বলুন, ঘর-দোড় সব বুঝে নিতে, এখন থেকে এইখানেই থাকতে হবে, এটাই হল আপনাদের ভিটে।

নির্বাক বিস্ময়ে চক্রবর্তী মহাশয় পাতিরামের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন, এই অদ্ভুত মানুষটির রহস্যময় কথাগুলি তাঁহার কানে যেন হেঁয়ালির মত ধ্বনিত হইতেছিল।

পাতিরাম তাড়াতাড়ি লম্বা লেফাফায় ভরা একখানা দলিল চক্রবর্তী মহাশয়ের পদতলে রাখিয়া কহিল, বিশ্বাস না হয় এটা পড়ে দেখুন।

কম্পিত হস্তে লেফাফাখানি খুলিয়া দামী স্ট্যাম্প-কাগজে রেজিস্ট্রী অফিসের মোহরযুক্ত দলিলখানি পড়িতে পড়িতে উদ্দাম অশ্রুর আবর্তে চক্রবর্তী মহাশয়ের গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া গেল। বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠে তিনি চীৎকার তুলিলেন, ওগো গিন্নী, শোনো শোনো! পাতিরাম এই বাড়িখানা আমাদের একেবারে দিয়েছে —দান করেছে!

ভিতর হইতে বামাকণ্ঠের স্বর ভাসিয়া উঠিল, বেঁচে থাক বাবা, জয় হোক তোমার।

ঠিক এই সময় ধীরে ধীরে এক তরুণী সেই স্থানে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে পাতিরামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, মাকে এক দিন যেমন ঘটা করে কাপড় পরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি ঘটা করে আজ গৃহপ্রবেশ করলেন। গৃহ আপনার সার্থক হল।

এক অপূর্ব অনুভূতিতে শিহরিয়া উঠিয়া পাতিরাম মেয়েটির প্রতিভাদৃপ্ত মুখ-খানির দিকে চাহিল মাত্র, মুখে তাহার বাণী ফুটিল না।

পিছন হইতে পাতিরামের মা দ্রৌপদী অগ্রসর হইয়া মেয়েটির হাতখানি খপ

করিয়া চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে টানিয়া লইয়া গেল, তাহার পর তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিল, এই আমার ঘরের লক্ষ্মী বাবা, পাতিরামের ভাগ্য ভাল, মা আমার যা দিয়েছেন, এখন তুমি আশীর্বাদ কর বাবা।

দুই হাত তুলিয়া চক্রবর্তী মহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, বা! বা! এ যে লক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমা! আশীর্বাদ করি, সর্বসুখী হও, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

পার্বতীর হাত ধরিয়া দ্রৌপদী চক্রবর্তী মহাশয়ের পদতলে মস্তক নত করিয়া দিল।

॥ চব্বিশ ॥

পাতিরামের সংসারে আসিয়াই পার্বতী তাহার অদ্ভুত প্রকৃতি স্বামীর অতীত জীবনের সকল কাহিনীই একটি একটি করিয়া জানিয়া লইল; এমন কি, পাতি-রামের সেই খেরো-বাঁধানো খাতাখানি পর্যন্ত সে আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিল। স্বামীর দুর্জয় জিদ যেমন তাহার মনে আনন্দ দিল, সেই সঙ্গে রাধানাথের প্রতি অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার প্রাচুর্য তাহাকে মর্মাহত করিয়া তুলিল।

কিন্তু বুদ্ধিমতী পার্বতী প্রতিবাদের পন্থাটিও ভাল ভাবেই জানিত। এক দিন সে আবদারের সুরে স্বামীকে কহিল, আমার একটা ব্রত আছে, তার যে উদ্‌যাপন দরকার।

হাসিমুখে পাতিরাম কহিল, ফর্দটা দিতে পার, কাজ আটকাবে না।

পার্বতীর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটিল, কহিল, আটকাবে না জানি, কিন্তু ব্রতটা খুব সাধারণ নয়।

পাতিরাম কহিল, সেটা আমি আগেই বুঝেছি। পাতিরামের পত্নী যে একটা যেমন তেমন ব্রত করবে না, এটাও আমার জানা আছে।

পার্বতী কহিল, তবে ফর্দটা বলি শোন। যেমন ঘটা করে মাকে শীতের কাপড় দিয়েছিলে, নতুন রাস্তা দিয়ে যেমন গৃহপ্রবেশ করেছিলে, তেমনই জাঁকজমকে একটা পুরনো ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

পাতিরামের চক্ষু দুইটি এক নিমিষে যেন জ্বলিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টি হইতেই পার্বতী বুঝিতে পারিল যে কথাটা আর খুলিয়া বলিতে হইবে না, কথা পাড়িতেই স্বামী তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

পাতিরাম কহিল, আমি জানি, আমার বাড়িতে এসেই তুমি আমার সম্বন্ধে সমস্তই জেনেছ ; কিছুই আর চাপা নেই।

পার্বতী কহিল, আমি তো তোমার বাড়িতে কারবার করতে ঢুকি নি ; তোমার ঘর-সংসার সামলাতেই এসেছি। কাজেই তোমার সংসারের সঙ্গে তোমাকে পর্যন্ত আমাকে ভাল করে পড়ে নিতে হয়েছে। স্বামীর মন যদি না পড়া যায়, স্বামীকে নিয়ে কি করে ঘর করা চলে ? অনেক ভেবে-চিন্তেই ব্রতের কথা পেড়েছি।

পাতিরাম কহিল, যখন সব জেনেছ, তখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, এ ব্রত উদ্‌যাপন করা কত শক্ত! রাধানাথ মুখুজ্জেকে জব্দ করতে আমি হয়রান হয়ে গেছি, কিন্তু তবু বাগে আনতে পারি নি। হয়তো সে এতদিনে ঐ কৃত্তি কোলের মত আমার কাছে এসে নেতিয়ে পড়ত, কিন্তু পড়ে নি, তাকে পড়তে দেয় নি তার ঐ নতুন মন্ত্রী। তবে আমারও মন্ত্র হচ্ছে—ওকে পেড়ে ফেলবই, শেষের যুদ্ধই এখন চলেছে।

পার্বতী কহিল, তোমার খাতায় সে সব তো লিখেই রেখেছ! রাধানাথবাবুকে চালাচ্ছেন এখন তার স্ত্রী নিভা দেবী। তোমার যত কিছু রাগ এখন ঐ মেয়েটির ওপরে। কিন্তু যে রাস্তা ধরে তুমি চলেছ, তাতে কিছু করতে পারবে না।

উত্তেজিত কণ্ঠে পাতিরাম কহিল, কিন্তু না পারলেও ছাড়ব না। এবার রাধানাথ মুখুজ্জেকে চারিদিক দিয়ে বেঁধে তার মৃত্যুবাণ হাতে নিয়েছি। রাধুকে জেলে পুরব ; প্যায়দা নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে থালা-ঘটিবাটি পর্যন্ত নিলেমে চড়াব।

পার্বতী কহিল, তবুও তার স্ত্রীকে দাবাতে পারবে না। স্বয়ং ভগবতী তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি কিছুতেই নীচু হবেন না জেনো। তা ছাড়া মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি এখন ওদের দিকে পড়েছে, এখন তোমার সব চেষ্টাই পণ্ড হবে।

—মা-লক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়ুক, পার্বতীর দৃষ্টি ওদের দিকে পড়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি।

—এ দৃষ্টির কোন দাম নেই। ওদের ওপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি না পড়লে ওরা হাজারি বাগের জঞ্জালগুলো আঁকড়ে পড়ে থাকত না, এত দিন তোমার খপ্পরে এসে পড়ত। এখন আমার কথা হচ্ছে এই, এবার রাস্তা পাল্টাতে হবে ; জোরজবরদস্তি ছেড়ে সোজা রাস্তা ধরে চল, তা হলেও দু কুড়ি সাতের খেলা বজায় থাকবে।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্বতীর দিকে চাহিয়া পাতিরাম কহিল, তুমি কি করতে বল?

পার্বতী কহিল, ঋণ পরিশোধ করতে। মার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সব ঠি

করে রেখেছি, তাতে তোমারই মুখোজ্জ্বল হবে আর সাতকড়ি মুখুজ্জের ঋণ-পরিশোধের সঙ্গে তার বংশটাও রক্ষা পাবে।

পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে পাতিরামের হস্তনিক্ষিপ্ত খরতর শরগুলির সাংঘাতিক আঘাতে রাধানাথ যখন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে এবং নিভা শরাহত স্বামীর পরিচর্যার সহিত প্রতিপক্ষের চরম অভিযান ব্যর্থ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, সেই সময় অর্ধাবগুণ্ঠনবতী বধূর সহিত এক বর্ষীয়সী মহিলা সরাসরি রাধানাথের বাড়ির দ্বিতলে দরদালানে আসিয়া ডাকিল, কোথায় গো মা-লক্ষ্মী, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে।

দরদালানটির পার্শ্বেই রাধানাথের শয়ন-ঘর। অসুস্থ রাধানাথ খাটের উপর স্থূল শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল, নিভা একধারে বসিয়া স্বামীর সহিত কি একটা কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। স্বর শুনিয়াই ছুটিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, সাদা থানকাপড়-পরা এক বৃদ্ধা ও তাহার পশ্চাতে এক তরুণী দাঁড়াইয়া আছে। যদিও ইহাদের সাজগোজের বিশেষ প্রাচুর্য নাই, কিন্তু উভয়েরই দেহে মুখে যেন লক্ষ্মীশ্রী ঝলমল করিতেছে। সেই সামান্য বসনভূষণেই বধূটির স্বাস্থ্যপুষ্ট রূপটি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

নিভাকে দেখিয়াই বৃদ্ধা কহিল, বুঝেছি, তুমিই মা-ঠাকরুন, এ বাড়ির মা লক্ষ্মী। বৌমা গড় কর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই নিভার দুই পায়ে মাথা নত করিয়া দিল ও অঞ্চল সংযোগে পদধূলি লইয়া শ্রদ্ধার সহিত মাথায় ঠেকাইল।

নিভা তাড়াতাড়ি একখানি শতরঞ্চি বিছাইয়া দিয়া কহিল, বসুন।

বৃদ্ধা কহিল, সে কি হয় মা! তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমরা বসব?

বধূ কহিল, আপনিই ওখানে বসুন, আমরা মেঝেতে বসছি, দিব্যি পরিষ্কার মেঝে—

নিভা কহিল, তা কি হয়! গৃহস্থের বাড়িতে এসে মাটিতে বসতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। আপনারা বসুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে না হয় বসছি।

সঙ্গে সঙ্গেই সে ক্ষিপ্রকৌশলে আগন্তুকদ্বয়কে শতরঞ্চির উপর বসাইয়া নিজেও তাহাদের সহিত বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে আসছেন আপনারা?

কথাটার উত্তর দিল তরুণী বধূটি। ঈষৎ হাসিয়া কহিল, আসছি আমরা

নিকিরিপাড়া থেকে। অনেকদিন থেকে সাধ, বামুনবাড়িতে প্রসাদ পাব, তাই মাকে নিয়ে এসেছি। উনি আমার শাশুড়ী হন।

নিকিরিপাড়ার নাম শুনিয়াই নিভার মনে জোরে একটা দোলা লাগিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকা নারী দুইটির মুখের দিকে চাহিয়া সে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, নিকিরিপাড়া থেকে আসছেন? তা হলে পাতিরাম পাকড়ের—

বৃদ্ধা কহিল, পাতিরাম আমার ছেলে, আর এই আমার বউ। ভারি লক্ষ্মী বউমা, গুণের সীমে নেই। দেবতা-বামুন বলতে অজ্ঞান। আর নেকাপড়ায় তোমাদের ঘরের মেয়েদের মতই মা!

বধূ তাড়াতাড়ি কহিল, মার বয়স হয়েছে কিনা, তাই সব কথাই বাড়িয়ে বলেন। আমার কোন দোষত্রুটি ওঁর চোখে পড়ে না, শুধু গুণই দেখেন। আসলে কিন্তু আমার কোন গুণ নেই দিদি!

স্তব্ধ বিস্ময়ে নিভা শাশুড়ী-বধূর কথা শুনিতেছিল। বধূর কথা শেষ হইলেও নিভার মুখে কথা ফুটিল না। তাহাদের পরম শত্রুর মা ও স্ত্রী যে তাহাদের বাড়িতে আসিয়া তাহাদের সম্মুখে বসিয়া এমন স্বচ্ছন্দভাবে কথা কহিতে পারে—তাহার অন্তর যেন তাহাতে সায় দিতে চাহিতেছিল না! সত্যই কি ইহারা পাতিরামের পরিজন, অথবা ইহার মধ্যেও পাতিরামের কৌশলচালিত কোন চক্রান্তের অভিনয় চলিয়াছে!

কিন্তু বৃদ্ধার পরবর্তী কথা তাহার এই সংশয়টুকুর মূলোচ্ছেদ করিয়া দিল। বধূর কথার সূত্রটি ধরিয়া নিভার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধা কহিল, বউমার আমার স্বভাবটিই এমনি মা, নিজের সুখ্যেতে কান দিতে চান না। কিন্তু তুমিই বল তো মা, সোয়ামীর দোষ যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, ভুল-চুক ভেঙ্গে দেয়, তার গুণ গাইব না? এই যে আমার ছেলে পতা, এ বাড়ির নুন খেয়ে মানুষ, বড় মানুষ হয়ে সে তো সবই ভুলে গিয়েছিল—কত শত্রুতাই যে সেধেছিল তোমাদের সাথে গো, মা হয়ে আমি কি তাকে বাগে আনতে পেরেছিলুম? কিন্তু বৌমা আমার সংসারে এসেই এই ভুল ভেঙ্গে দেবার জন্যে তোমার কাছে ছুটে এসেছে মা; শুনে অবাক হবে তুমি, আমার ছেলেকেও রেহাই দেয় নি—সেও এসেছে, বাইরের ঘরে বসে আছে।

পার্বতী কহিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দিদি; আমার স্বামীর কাছেই শুনেছি, আপনার শ্বশুর বেঁচে থাকতে এক দিন তিনি প্রচুর দম্ভ নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু আপনার শ্বশুর তাঁকে যে আক্কেল দেন তাতে মাথা নীচু করে

ফিরে যান। অতীতের সে স্মৃতিটুকু মনে রেখেই তিনি এ বাড়িতে মাথা গলিয়েছেন। আমার স্বামী আর যাই হোক, তিনি মানুষ চেনেন, মায়ের কি মর্যাদা তা বোঝেন। আপনাদের সঙ্গে আর তিনি বিবাদে লিপ্ত হবেন না।

নিভা তখনই তাহার বালকপুত্র নিতাইকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, নীচের বৈঠক-খানায় তোমার এক কাকাবাবু এসেছেন, তাঁকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে এস, ঐ ঘরে তিনি বসবেন।

রাধানাথ বিছানার সহিত মিশিয়া নির্জীবের মত পড়িয়াছিল। মানসিক ব্যাধি সাংঘাতিক হইয়া তাহার অনিন্দ্যসুন্দর দেহখানিকে একেবারে বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে।

পাতিরাম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই গাঢ়স্বরে কহিল, প্রণাম রাধুবাবু! কিন্তু শয্যাশায়ী রাধানাথের শীর্ণ মূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, এ কি, এমন চেহারা হয়েছে!

রাধানাথ শয্যাসান্নিধ্যে রক্ষিত কেদারাখানির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, বসো পাতিরাম। আমি সব শুনেছি। আমার কাছে আজ এটা কল্পনাতীত ব্যাপার যে—তোমরা আমার বাড়িতে প্রসাদ পেতে এসেছ।

পাতিরাম কহিল, বা, এটা তো আমাদের জন্মগত অধিকার! বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় কত বারই পাত পেড়ে প্রসাদ পেয়েছি। মাঝে সব তলিয়ে গিয়েছিল। তাই আবার কেঁচে গণ্ডূষ শুরু করব বলে এসেছি।

রাধানাথ কহিল, আমি শুনেই যাচ্ছি। আর, এমন একটা আনন্দও পাচ্ছি, যেটা সত্যই কল্পনাতীত।

পাতিরাম কহিল, প্রসাদ পাবার আগে আমার কিন্তু একটা অনুরোধ আছে রাধুবাবু।

নিষ্প্রভ দুইটি চক্ষু পাতিরামের দিকে ফেলিয়া রাধানাথ কহিল, বল।

পাতিরাম কহিল, তোমার অফিস বন্ধ হবার পর একখানি সরকারী চিঠি আমার হাতে আসে। হাজারিবাগের যে মাইকা-মাইন তুমি কিনেছিলে, তার মাইকাগুলো লাল্‌চে রঙের বলে বাজারে চলে নি। তুমি ভেবেছিলে টাকাগুলো জলে পড়েছে। তার পর সেই মাইকার স্যাম্পল বোধ হয় কোন একটা সরকারী কনসার্নে পাঠিয়েছিলে?

রাধানাথ কহিল, হ্যাঁ, পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু কোন উত্তর আসে নি।

পাতিরাম কহিল, উত্তর এসেছিল, কিন্তু তুমি পাও নি! সে চিঠি যেমন করেই

হোক আমার হাতে এসে পড়ে। সে চিঠির মর্মটি কি শুনবে? ফার্স্ট ক্লাস সাদা মাইকার এখন যে দর, তার অন্তত ত্রিশ গুণ বেশী দরে এই বিটকেল রঙের মাইকা বিকুচ্ছে, কেননা, গুলি-গোলার কাজে এই মাইকার চাহিদা খুব বেশী। এই জন্য কুণ্ডিকে হাত করে আমি তোমার মাইকা-মাইন ও মজুত মাইকা সব কিনে নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পারি নি। সে যাই হোক, আমার জন্য হার্ডওয়ারী বিজনেসে তুমি সর্বস্বান্ত হয়েছ। এখন এই মাইকা বিজনেসে তুমি আবার লক্ষ্মীমন্ত হও, এই আমার অন্তরের বাসনা। তাই এই হদিশটির সঙ্গে মা-লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের চাবিটি আমি তোমাকে আজ বাড়ি বয়ে দিতে এসেছি।

রাধানাথ স্তব্ধভাবে পাতিরামের কথাগুলি শুনিল। যে লোক তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে, যাহার চক্রান্তে চারিদিক হইতে যাবতীয় পাওনাদাররা ভয়াবহ মূর্তি ধরিয়া তাহাকে বিভীষিকা দেখাইতেছে, কিছুক্ষণ পূর্বেও যে সাংঘাতিক মানুষটিকে সে তাহার এই চরম দুর্গতির একমাত্র হেতু সাব্যস্ত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে, সেই লোকই আজ তাহার বাড়িতে আসিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া তাহার নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিতেছে। ভাবের আবর্ত উঠিয়া পলকে তাহার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া দিল। অভিভূতের মত রাধানাথ কহিল, যখনই শুনলুম যে, তুমি সপরিবারে এ বাড়িতে এসেছ প্রসাদ পেতে, তখনই ভেবেছিলুম এমন একটা কাণ্ড কিছু বাধাবে, যাতে বাড়ি-সুদ্ধ সকলেই চমকে যাবে। এ ব্যাপারে তুমি যে ছেলেবেলা থেকে ওস্তাদ, তা তো জানি।

পাতিরাম কহিল, ঝগড়া অনেকের সঙ্গে করেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও খুব চলেছে, কিন্তু ডুবতে ডুবতে সর্বস্বান্ত হতে বসেও জানিয়ে দিয়েছ যে সাতকড়ি মুখুজ্জের রক্ত তোমার দেহে বইছে। তুমি ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু মচকাবে না।

রাধানাথ কহিল, এর জন্য আমি আমার স্ত্রীর কাছে ঋণী। তোমার শেষ-চাল তাঁরই বুদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পাতিরাম শ্রদ্ধাভরে করযুগল যুক্ত করিয়া ললাটে ঠেকাইল ও সেই সঙ্গে আবেগের সুরে কহিল, আমি তা জানি। এজন্য তাঁর চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। সবাই বলে, আমি খুব ইনটেলিজেন্ট, কিন্তু আমি বলছি, আমার চেয়েও তিনি অনেক বেশী ইনটেলিজেন্ট।

শেষ